বিভাজিত বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারতে জাতি চেতনার বিবর্তন: নমঃশূদ্র জাতির একটি আলোচনা (১৯৪৭-২০২১)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস

ইতিহাস বিভাগ

রেজিস্ট্রেশন নং AOOHI0200316

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রূপ কুমার বর্মন

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০০৩২

২০২৩

Certified that the Thesis entitled

"বিভাজিত বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারতে জাতি চেতনার বিবর্তন:নমঃশূদ্র জাতির একটি আলোচনা (১৯৪৭-২০২১)"

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor (Dr.) Rup Kumar Barman and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor:

Dr. Rup Kumar Barman
Professor
Department of History
Jadavpur University

Dated:

Candidate:

(Krishnendu Biswas)

Date:

মুখবন্ধ:

বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক ইতিহাসের ধারায় নবতম শৈলী হিসেবে নিম্নবর্গ সম্পর্কিত ইতিহাসচর্চা (Subaltern Studies) সংযোজনের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রান্তিক অংশের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রান্তিকতার ইতিহাসচর্চার এই অভিঘাতে আধুনিক ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছে অনেক নতুন বিষয় উঠে এসেছে। এই সকল বিষয়ের মধ্যে জাতি ও বর্ণ সম্পর্কিত আলোচনা অন্যতম আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছে। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভটি এই শাখার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়।

'বিভাজিত বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারতে জাতি চেতনার বিবর্তন: নমঃশূদ্র জাতির একটি আলোচনা (১৯৪৭-২০২১)' শিরোনামের এই গবেষণা পত্রে আলোচনার সময়সীমা ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাজনের পরবর্তী সময় থেকে ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন পর্ব পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সময় পর্বে নমঃশূদ্র জাতি চেতনার সঙ্গে তাঁদের সামাজিক অবস্থান (Social Status) বা পরিচিতি (Identity) এর বিবর্তনের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

কোন জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান বা পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে তার পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি 'সামাজিক চেতনা' বিষয়টি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এই চেতনার উন্মেষ ও তাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কিত উদ্বেগ ভারতের বিভিন্ন অংশে স্বতন্ত্র জাতি আন্দোলন বা সামাজিক উত্থানের সূত্রপাত ঘটিয়ে ছিল। এই তত্ত্বকে উপজীব্য করে ভারতীয় জাতি সমূহের সামাজিক উত্থানকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কোন জাতির সচেতনার সঙ্গে তাদের সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের গভীর সম্পর্ক

বিদ্যমান। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভটিতে নমঃশূদ্র জাতি চেতনার বিবর্তনের সঙ্গে তাঁদের সামাজিক অবস্থানের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক পর্বে বঙ্গপ্রদেশ (Bengal Presidency) এর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের বিভিন্ন জেলা নমঃশূদ্র জাতির মূল আবাসভূমি ছিল। ১৯৪৭ এর দেশভাগের পর এই অংশটি পূর্ব পাকিস্থানে থেকে যাওয়ায় তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় অভিবাসিত হতে শুরু করে ছিলেন। ফলত, ঐ সকল অভিবাসিত অঞ্চল গুলিতে তাঁদের সামাজিক অবস্থান পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে ছিল। এই সকল অঞ্চলে বসবাসকারী নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান বা পরিচিতি নির্মাণ করার ক্ষেত্রে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি তাঁদের পূর্ববর্তী জাতি চেতনা উত্থানের ইতিহাস এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। ১৯৪৭ পরবর্তী পর্বে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর এই জাতি চেতনা এবং তাঁদের সামাজিক পরিচিতি নির্মাণের পারস্পরিক কার্য-কারণ সম্পর্ক তুলে ধরার জন্য, তাঁদের তিনটি আবাসভূমি নির্বাচন করা হয়েছে।

এই আবাসভূমি হিসেবে বিভাজিত বাংলার পশ্চিম অংশ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব অংশ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ। এছাড়াও উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যদ্বয়কে আলোচ্য গবেষণার তুলনামূলক ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এই সকল অঞ্চলের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অবস্থানকারি নমঃশূদ্র জাতির পরিচিতি বিবর্তনের ইতিহাসকে, এই গবেষণা সন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে নমঃশূদ্র জাতিকে উপজীব্য করে বিভিন্ন গবেষণা সংগঠিত হলেও জাতি চেতনার সঙ্গে তাঁদের পরিচিতি নির্মাণে, ক্ষেত্র ভেদের তুলনামূলক আলোচনা পাওয়া যায় না। সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত বিষয়টি জাতিচর্চা তথা ভারতীয় ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে।

গবেষণা সন্দর্ভটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট উপাধি অর্জনের জন্য প্রদত্ত হলো। এই গবেষণা পত্রটি রূপায়নের ক্ষেত্রে সর্বস্তরের সহায়তা প্রদান এবং ধৈর্য সহকারে ঐতিহাসিক মননশীলতার বিকাশ ঘটানোয় সহায়তা দানের জন্য আমার গবেষণায় তত্ত্বাবধায়ক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক, জাতিচর্চা ইতিহাসের বিদগ্ধ পণ্ডিত, ডক্টর রূপ কুমার বর্মণ মহাশয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই। তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যতীত গবেষণা পত্রটির পূর্ণতা পাওয়া অসম্ভব ছিল।

এই গবেষণা কার্য সম্পূর্ণ করার প্রয়োজনে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, অভিলেখাগার এবং প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা পেয়েছি। যথা- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগীয় এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণাগার অধিদপ্তর, রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিসদ, Centre for Studies in Social Sciences Library, যদুনাথ সরকার গ্রন্থাগার, দুর্গানগর আম্বেদকর মিশন, ঠাকুর নগর প্রকাশনী এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় মহাফেজখানা ও জাতীয় গ্রন্থাগার। এই সকল গ্রন্থাগার এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণা পরিসরে সহায়তা ও অনুপ্রেরনা প্রদানের জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ড. নুপুর দাশগুপ্ত, ড. সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়, ড. অমিত ভট্টাচার্য, ড. মহুয়া সরকার, ড. মেরুনা মুর্মু, ড. কৌশিক রায়, ড. চন্দ্রানী ব্যানার্জী (মুখার্জী), শ্রী সমীর দাস মহাশয় এবং এর পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগজীবন রাম পদে সন্মানিত অধ্যাপক আনিল সরকারকে আমার প্রনাম জানাই। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই ড. যূথিকা বর্মা, হরিনারায়ণ পুরের নীরাপদ বিশ্বাস, ঠাকুর নগরের নির্মল বিশ্বাস, উজির পুরের তপন মণ্ডল, শরদেন্দু বিশ্বাস, বনানী রায়, পূর্ণিমা মাইতি, জয়শ্রী চৌধুরী, পার্থ প্রতিম বসু, সজল নস্কর এবং প্রতিমা মণ্ডলকে।

গবেষণাকার্য চলাকালীন বিভিন্ন সহায়তা পেয়েছি অঙ্কন রায়, ড. কৃষ্ণ কুমার সরকার, প্রসেনজিৎ নস্কর, কিশোর রায়সরকার, বিমল বর্মণ, ড. দীপশঙ্কর নাইয়া, ড. পুরবী বর্মণ, আনিসুল হক, মিল্টন বিশ্বাস, সত্যজিৎ মণ্ডল, ড. পৌলমী রায়, ইন্দিরা ব্যানার্জী, ড. মিঠুন মজুমদার, ড. শিল্পা মণ্ডল, ড. সোমা নস্কর, সঙ্ঘমিত্রা দাস, তন্ময় রায়, সঞ্জু সরকার, সুজয় দাস, অনিল বিশ্বাস, অপূর্ব বিশ্বাস, অরবিন্দ বিশ্বাস, সরফরাজ আজম, ড. পূজা ব্যানার্জী, ড. প্রিয়ঙ্করা চক্রবর্তী, হীরালাল মাহাতো, শেখর মহাপাত্র, নন্দদুলাল মণ্ডল, অমৃতা কর্মকার, সইফুদ্দিন খালেদ চৌধুরী, শুভঙ্কর দে, দেবলীনা বিশ্বাস, অলোক কোরা, ঋত্বিক বাগচি, সুমিত ঘোষ, মৃন্ময় ভারতী, সৌম্যজিত মুখার্জী, সাহেব হেম্ব্রম, সনাতন সোরেন, সায়নি রায়, দেবব্রত রায়, কিষান খাঁ, রাকিব, অরেঞ্জ মহলদার, মৃন্ময় সরকার, পিণ্টু সিংহ মহাপাত্র, তন্ময় মণ্ডল, বিনয় বিশ্বাস, মানস মণ্ডল, অরিজিৎ বিশ্বাস, হীরা বিশ্বাস, সেঁজুতি মজুমদার। এদের সকলকে এবং আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সহপাঠী তথা সকল শুভাকাঙ্ক্ষীকে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

গবেষণা প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা দানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ফেলোশিপ (গবেষণা) (West Bengal State Fellowship) প্রদানকারি কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই আর্থিক সহায়তা আমার গবেষণা প্রকল্প রূপায়নে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

পরিশেষে প্রণাম জানাই আমার পিতা কিশোরী মোহন বিশ্বাস ও মাতা সোমা বিশ্বাসকে। সকল পরিস্থিতিতে আমার পাশে থাকার জন্য তাঁদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই বোন দেবশ্রী বিশ্বাস এবং ভাই শুভ্রজ্যোতি বিশ্বাসকে যারা নানাভাবে আমাকে সহায়তা প্রদান করেছেন।

গবেষণা পত্রটির বানান সংশোধনের ক্ষেত্রে পবিত্র সরকারের ‘ব্যাবহারিক বাংলা বানান-অভিধান’ অনুসরণ করা হয়েছে। তথাপি বানান এবং অন্যান্য ভুল ত্রুটির ক্ষেত্রে, তার দায়ভার সর্বতোভাবে আমার।

ধন্যবাদান্তে

কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস,
ইতিহাস বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
কলকাতা- ৭০০০৩২।

সংকেতাবলি (Abbreviations)

ABSCF: All Bengal Scheduled Caste Federation

ADRF: Asia Dalit Rights Forum

AGP: Asom Gana Parishad

AIADMK: All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam

AIFB: All India Forward Block

AIIO: All India Imam Organization

AIMIM: All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen

AIML: All-India Muslim League

AISCF: All India Scheduled Castes Federation

B. CONG: Bengal Congress

BJP: Bharatiya Janata Party

BLA: Bengal Legislative Assembly

BSCP: Bengal Scheduled Caste Party

BSP: Bahujan Samaj Party

CPI: Communist Party of India

CPI(M): Communist Party of India (Marxist)

DCR: The Durban Conference against Racism

DK: Dravida Kazhagam

ICDHR: International Conference on Dalit Human Rights

INC: Indian National Congress

IND: Independent

JP: Janata Party

JP(I): Justice Party (India)

KMPP: Kisan Mazdoor Praja Party

KPP: Krishak Praja Party

MM: Matua Mahasangha

NPP: National People's Party

RSP: Revolutionary Socialist Party (India)

RSS: Rashtriya Swayamsevak Sangh

SBP: Sanjukta Biplobi Parisaha Party (সংযুক্ত বিপ্লবী পরিসহদল)

SC: Scheduled Caste

ST: Scheduled Tribe

UF: United Front (India)

VDI: Voice of Dalit International

WCAR: World Conference Against Racism

সরণি সূচি

		পৃষ্ঠা নং
সরণি: ২.৪.	বাংলা বিভাজনের পূর্বে বিভিন্ন জালায় নমঃশূদ্র জনসংখ্যা	১১০
সরণি: ৩.২.	২০০১ এবং ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সংখ্যা	১৩৫
সরণি: ৩.২.২.	১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা নির্বাচনে তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব	১৪১
সরণি: ৩.২.৩.	১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা নির্বাচনে তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব	১৪৮
সরণি: ৩.২.৪.	১৯৭৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা নির্বাচনে তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব	১৫৫
সরণি: ৩.২.৫.	২০১১ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা নির্বাচনে তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব	১৬৫
সরণি: ৪.১.	১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বের পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্থান থেকে আসাম ও ত্রিপুরায় আসা উদ্বাস্তুদের পরিসংখ্যান	১৮৪
সরণি: ৪.২.২.৩.	১৯৫১ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত আসাম বিধান সভায় তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব	১৯৯
সরণি: ৪.২.২.৩.	১৯৭৮ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আসাম বিধান সভায় তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব	২০২
সরণি: ৪.২.২.৩.	২০০১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত আসাম বিধান সভায় তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব	২০৯
সরণি: ৪.২.৩.	১৯৪১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরার জনসংখ্যা পরিবর্তনের পরিসংখ্যান	২১৫

পরিভাষিক শব্দাবলী (Glossary)

অন্ত্যজ (Low-Born): ভারতীয় সমাজের চতুর্থতম বর্ণের অন্তর্গত মানুষকে সামাজিক সম্মানের নিম্নতম অবস্থানে রাখা হয়। তাদেরকে অস্পৃশ্য, অধম সংকর, অসৎ শূদ্র প্রভৃতি নামে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে।

আদমশুমারি: জনগণনা বা লোকগণনা।

কৌম গোষ্ঠী (Sub-Caste): বিভিন্ন জাতির অন্তঃবিভাজন।

জাতি (Caste): একই ধরনের বংশ পরম্পরা ও জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত জনসমষ্টি।

জাতি রাজনীতি (Caste Politics): জাতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক কর্মকান্ড।

জাতীয় রাজনীতি (National Politics): কোন একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের অন্তর্বর্তী রাজনৈতিক কর্মকান্ড।

তপশিলি জাতি: ১৯৫০ সালের সাংবিধানিক আদেশ (The Constitution (Scheduled Castes) Order, 19501 C.O.19) অনুযায়ী ভারতীয় সংবিধানের প্রথম তফসিল বা সরণিতে সামাজিক ভাবে অবদমিত জাতি সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তাঁদের জন্য সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষা, সরকারি চাকরি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তফসিল অন্তর্ভুক্ত জাতি সমূহর জন্য জন সংখ্যার সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

তফসিল (Schedule): তফসিলের অর্থ হল তালিকা। ভারতের সংবিধানে ১২ টি তফসিল রয়েছে।

নমঃশূদ্র: ভারতীয় সংবিধানের তফসিল বা সরণি অন্তর্ভুক্ত একটি জাতি।

নির্বাচনী আলোচ্যসূচি (Agenda): নির্বাচনের সময় প্রকাশিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিপাদ্য কার্যাবলীর তালিকা।

পৌন্ড্র:	ভারতীয় সংবিধানের তফসিল বা সরণি অন্তর্ভুক্ত একটি জাতি।
বাগদি:	ভারতীয় সংবিধানের তফসিল বা সরণি অন্তর্ভুক্ত একটি জাতি।
মতুয়া:	একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। যারা অধিকাংশ মানুষ মূলত নমঃশূদ্র জাতির অন্তর্ভুক্ত।
মতুয়া মহাসংঘ:	১৮৬০ এর দশকে অবিভক্ত বঙ্গদেশে সংগঠিত একটি ধর্মীয় সংস্কারমূলক সংগঠন। বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এই সংগঠনটি ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গেও যুক্ত।
মালো:	ভারতীয় সংবিধানের তফসিল বা সরণি অন্তর্ভুক্ত একটি জাতি।
রাজবংশী:	ভারতীয় সংবিধানের তফসিল বা সরণি অন্তর্ভুক্ত একটি জাতি।
সংরক্ষণ (Affirmative Action's):	সমাজের পশ্চাৎপদ অংশের ঊর্ধ্বমুখী সামাজিক গমনের জন্য রাষ্ট্রের সহায়তা প্রদানে সাংবিধানিক আইন।

সূচিপত্র (Index)

পৃষ্ঠা নং

মুখবন্ধ i-v

সংকেতাবলি (Abbreviations) vi-vii

সরণি সূচি viii

পরিভাষিক শব্দাবলী (Glossary) ix-x

ভূমিকা ১-৩০

প্রথম অধ্যায়: জাতি পরিচিতি নির্মাণ: বাংলার নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী ৩১-৭১

১.১ ভূমিকা ৩১

১.২. বর্ণ ও জাতি পরিচিতি নির্মাণের ইতিহাস ৩৯

১.৩. বঙ্গদেশে বর্ণ ও জাতি ভিত্তিক পরিচিতির প্রসার ৪৬

১.৪. নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতি নির্মাণ ৫১

১.৪.২. প্রাচীন গ্রন্থে নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতি সম্পর্কিত ধারণা ৫১

১.৪.৩. নমঃশূদ্র জাতির উৎপত্তিতে ব্রাহ্মণত্ব সম্পর্কিত তত্ত্ব ৫৫

১.৪.৪. বাংলার আদি নিবাসী হিসেবে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর পরিচিতি সম্পর্কিত মতবাদ ৫৭

১.৪.৫. নর তাত্ত্বিক বা শরীরবৃত্তিয় বিশিষ্টের ভিত্তিতে নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতি তত্ত্ব ৬১

১.৪.৬. ঔপনিবেশিক গবেষক ও প্রশাসক বর্ণিত উপাদানে নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতি ৬৩

১.৫. সিদ্ধান্ত এবং প্রশ্ন উত্থাপন ৬৬

টীকা ও সূত্র নির্দেশ ৬৯

দ্বিতীয় অধ্যায়: জাতি চেতনা ও জাতি রাজনীতির উত্থানে বাংলার নমঃশূদ্র ৭২- ১২৬

২.১ ভূমিকা ৭২

২.২ ভারতে জাতি চেতনা থেকে জাতি আন্দোলন ও জাতি রাজনীতির উত্থান ৭৮

২.৩ বঙ্গপ্রদেশে জাতি চেতনা ও জাতি রাজনীতিতে নমঃশূদ্র ৮৫

২.৩.২ প্রথম পর্ব: হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা ও আন্দোলনের উন্মেষ (১৮১২-১৯৩৭) ৮৬
২.৩.৩ ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত নমঃশূদ্র জাতি রাজনীতির গতি প্রকৃতি। ৯৯
২.৪ বাংলা বিভাজন (১৯৪৭) ও নমঃশূদ্র জাতি ১০২
২.৫ সিদ্ধান্ত এবং প্রশ্ন উত্থাপন ১২০
টীকা ও সূত্র নির্দেশ ১২৩

তৃতীয় অধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পেক্ষাপটে নমঃশূদ্র ও মতুয়া পরিচিতি দ্বন্দ্ব ও জাতি চেতনার বিবর্তন। (১৯৪৭-২০২১) **১২৭-১৮০**
৩.১ ভূমিকা: ১২৭
৩.২ পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে তপশিলি জাতি, নমঃশূদ্র জাতি ও মতুয়া সম্প্রদায়ের জাতি চেতনার স্বরূপ (১৯৪৭-২০২১) ১৩৫
৩.২.২ ১৯৫২ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস শাসন পর্বে নমঃশূদ্র জাতি চেতনার রূপান্তর ১৪০
৩.২.৩ ১৯৬৭-১৯৭৬ যুক্তফ্রন্টের আমলে জাতি রাজনীতিতে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা ১৪৭
৩.২.৪ ১৯৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত বামপন্থী রাজনীতিতে জাতি চেতনা ও নমঃশূদ্র জাতি ১৫৪
৩.২.৫ ২০১১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত নমঃশূদ্র জাতি চেতনার ধারা ১৬৪
৩.৩ সিদ্ধান্ত এবং প্রশ্ন উত্থাপন ১৭২
টীকা ও সূত্রনির্দেশ ১৭৭

চতুর্থ অধ্যায়: উত্তর-পূর্ব ভারতে ভূমিপুত্র ও বহিরাগত দ্বন্দ্বে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা। (১৯৪৭-২০২১) **১৮১-২২৩**
৪.১ ভূমিকা ১৮১
৪.২ উত্তর-পূর্ব ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের প্রেক্ষাপটে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা ১৮৮
৪.২.২ আসাম রাজ্যে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা ১৮৮

৪.২.২.২ আসাম অভিবাসন, ভাষা সংস্কৃতি ও স্বশাসিত অঞ্চল (Autonomous Territory) গঠনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ১৯২
৪.২.২.৩ স্বাধীনতা পরবর্তী আসামে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নমঃশূদ্র জাতি চেতনার বিবর্তন ১৯৬
৪.২.৩. ত্রিপুরা রাজ্যে তপশিলি তথা নমঃশূদ্র জাতি চেতনা ২১২
৪.৩. সিদ্ধান্ত, উপসংহার এবং প্রশ্ন উত্থাপন ২১৬
টীকা ও সূত্র নির্দেশ ২২০

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশে তপশিলি জাতি থেকে হিন্দু সংখ্যালঘুতে বিবর্তন: নমঃশূদ্র জাতির একটি আলোচনা (১৯৪৭- ২০২১) ২২৪-২৫৫
৫.১ ভূমিকা: ২২৪
৫.২ বিভাজিত বাংলার (১৯৪৭) পূর্ব অংশে হিন্দু সংখ্যালঘু ও নমঃশূদ্র জাতি চেতনার বিবর্তন (১৯৪৭-২০২১) ২২৯
৫.২.২ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন আমলে পূর্ববঙ্গের হিন্দু তথা নমঃশূদ্র জাতি চেতনার বিবর্তন (১৯৪৭-১৯৭১) ২৩১
৫.২.২.২ ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সাল পর্বে পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র জাতি চেতনার বিবর্তন (১৯৪৭-১৯৫০) ২৩২
৫.২.২.৩ ১৯৫১ সাল ১৯৭১ সাল পর্বে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর বিবর্তন (১৯৫১ ১৯৭১) ২৩৮
৫.২.৩ মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিসেবে তপশিলি তথা নমঃশূদ্র জাতির চেতনার বিবর্তন (১৯৭১- ২০২১) ২৪২
৫.৩ সিদ্ধান্ত উপসংহার এবং প্রশ্ন উত্থাপন ২৪৯
টীকা ও সূত্র নির্দেশ ২৫৩

উপসংহার ২৫৬-২৬০

সংযোজনী ২৬১-২৭০

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি ২৭১-২৮৩

ভূমিকা:

জাতি বা বর্ণ ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজের প্রাচীনতম ধারা। ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে মূলত প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা ও তৎপরতায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী এই সকল জাতি গোষ্ঠী সম্পর্কে ইতিহাস লেখা শুরু হয়ে ছিল। অতঃপর বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক ইতিহাসের ধারায় (School of Historiography) নবতম শৈলী হিসেবে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চা[১] সংযোজনের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রান্তিক অংশের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রান্তিকতার ইতিহাসচর্চার অভিঘাতে আধুনিক ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছে, অন্যান্য অনেক বিষয়ের পাশাপাশি, জাতি ও বর্ণ সম্পর্কিত আলোচনা অন্যতম আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠে এসেছে। এই প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মিলন ক্ষেত্র ভারতের সকল প্রান্তের জাতিচর্চা উঠে আসতে দেখা যাচ্ছে। এই চর্চা ভারতীয় ইতিহাসে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে।

ঔপনিবেশিক পর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক ন্যায়বিচার (Social Justice) এর ধারণার প্রভাবে উদ্দীপিত হয়ে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সামাজিক তথা জাতি ও বর্ণ চেতনার প্রকাশ হতে দেখা যায়। ফলস্বরূপ, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জাতি আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ হতে শুরু করে। এই প্রেক্ষিতে জাতি ও বর্ণ চর্চা নতুন আঙ্গিকে পর্যালোচনা ও গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি বিষয় গুলোকে পুনর্নিরীক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় সংযোজিত করে এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করে, পুনর্লিখিত হয়ে চলেছে।

ইতিমধ্যেই ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিহাসে বিষয়টির সুনির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বাংলা (Bengal Province) এর জাতি আন্দোলন সাম্প্রতিক কালের সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণায় অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। অবিভক্ত বাংলায় অনুসূচিত (Schedule) জাতি তালিকার অন্তর্ভুক্ত রাজবংশী, পৌন্ড্রক্ষত্রিয়, বাগদি, হাড়ি, মালো, নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জাতি আন্দোলন ভারতীয় ইতিহাসের পাতায় সমুজ্জ্বল।

এই সকল আন্দোলনের মধ্যে নমঃশূদ্র জাতি আন্দোলন স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে। নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষ মূলতঃ অবিভক্ত বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ বা বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা, ঢাকা ও বরিশাল বিভাগ (তৎকালীন ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, যশোর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলা) এর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বসবাস করতেন।[২] ১৯৩১ সালের জনগণনা অনুসারে বঙ্গপ্রদেশ (Bengal Province)-এ নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ২০,৯৪,৯৫৭ জন।[৩]

ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, নমঃশূদ্র জাতিটির এক সুদীর্ঘ সংগ্রামের ঐতিহ্য আছে। বাখরগঞ্জ এবং ফরিদপুর অঞ্চলে ১৮৭০ এর দশকে সামাজিক অসন্মানের বিরুদ্ধে নমঃশূদ্র জাতির বিক্ষোভ (Agitation) প্রদর্শন।[৪] পরবর্তীতে জাতির অসম্মান সূচক ‘চণ্ডাল’ নামের পরিবর্তন করে ‘নমঃশূদ্র’ নাম গ্রহনের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম (১৯১১) প্রভৃতি ঘটনার কথা বলা যায়।[৫] এই সকল দীর্ঘ সংগ্রাম তাদের ঐক্যবদ্ধতা এবং সু-সাংগঠনিক ভিত্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত করে।

এই ঐক্যবদ্ধতার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের মধ্যে দিয়ে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী নিজেদের জাতি চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়ে ছিল। এই সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় হরিচাঁদ ঠাকুর এবং পরবর্তীতে গুরুচাঁদ ঠাকুর নমঃশূদ্র জাতির নেতৃত্বের এক অসামান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। জাতি চেতনার শক্তিকে অবলম্বন করে, নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) এর বিভিন্ন জেলায় নিজেদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থানকে স্থিতিশীল যায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়ে ছিল। এই বিষয়টি তাদের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানকে ঊর্ধ্বগতি দান করে ছিল।

ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর, তাদের দীর্ঘ সংগ্রাম ও সংস্কারের মাধ্যমে গড়ে তোলা জাতি চেতনা ও সামাজিক অবস্থানের উপর সংকট ঘনীভূত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীতে বঙ্গপ্রদেশটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে বিভাজিত হয়ে পড়ে। যার মধ্য দিয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধতার উপর রাষ্ট্রীয় অভিঘাত নেমে আসে। বাংলা বিভাজনের ফলে, অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি নমঃশূদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলটি পূর্ব-পাকিস্তানের অংশে রয়ে যায়।

এই পরিস্থিতিতে ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তানের অংশে থেকে যাওয়া নমঃশূদ্র জাতি উভয় সংকট পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হয়। একদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত জাতিটি রাতারাতি নবগঠিত ইসলামিক রাষ্ট্রের অংশ হয়ে ওঠে। সে ক্ষেত্রে, তাদের পূর্ববর্তী জাতীয়তাবাদী পরিচিতি সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। অপরদিকে পিতৃভূমি ত্যাগ করে, ভারতে প্রবেশ করলে, তাঁরা হয়ে পড়েন বাস্তুচ্যুত শরণার্থী। এমতাবস্থায় নমঃশূদ্র জাতিটি বহুধা বিভক্ত হয়ে তাদের, ঐক্যবদ্ধ চরিত্র হারিয়ে ফেলতে থাকে। বাংলা ভাগ (১৯৪৭) এর ফলে উদ্ভূত এই নতুন পরিস্থিতি নমঃশূদ্র জাতিকে নতুন জীবন সংগ্রামের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

নব উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়া অনেক পরিবারের মত নমঃশূদ্র জাতির মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকেন। নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্যগুলিতে এই শরণার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলস্বরূপ, ওই সকল অঞ্চলে গড়ে উঠতে থাকে নতুন নতুন জনবসতি, কলোনি ও ক্যাম্প।

পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে সবথেকে বেশি সংখ্যক বাংলা ভাষী পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে ছিলেন। তাদের মধ্যে নমঃশূদ্র জাতি ছিল অন্যতম। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের আগমনের ফলে হওয়া জন বিস্ফোরণে স্থানীয় বাসিন্দা এবং নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে এক অভূতপূর্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব ঘটায়। এমত পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট পুনর্বাসন পরিকল্পনার অভাবে, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই উদ্বাস্তু আন্দোলনে নমঃশূদ্র জাতি ছিল এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। দীর্ঘ আন্দোলনের পর ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প শুরু করে ছিল।[৬]এই পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যান্য উদ্বাস্তুর পরিবারের পাশাপাশি নমঃশূদ্র জাতির মানুষজন আসাম, ত্রিপুরা, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, উত্তরাখণ্ড, বিহার, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে পুনর্বাসিত হয়ে ছিলেন।[৭]

স্বাধীন ভারতের নির্বাচনী রাজনীতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি এবং বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী নমঃশূদ্র মানুষের সংখ্যা ৩৮ লাখেরও বেশি।[৮] ১৯৪৭ এর পর বাস্তুচ্যুত হয়ে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সহ একটি বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গে

পুনর্বাসিত হয়ে পড়েন। এই ঘটনা প্রবাহে, বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা তথা জাতি রাজনীতির ভরকেন্দ্র পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হতে দেখা যায়। এই ঘটনা পরম্পরায় নমঃশূদ্র জাতি ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় রাজনীতিতে অংশীদার হয়ে উঠে এসেছে। জাতীয় রাজনীতিতে নমঃশূদ্র জাতির এই সম্পৃক্ততা, তাদের সামাজিক অবস্থানের ক্রমবিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে। এই বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক গবেষক তথা ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য অধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতীয় ভুখণ্ডে বসবাসকারি নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস আলোচনায় আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য দুইটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। অসমে এই জনগোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ এবং ত্রিপুরায় ২ লাখের বেশি।[৯] এছাড়া মেঘালয়, মনিপুর প্রভৃতি রাজ্যে বসবাসকারী নমঃশূদ্র জাতির মানুষ, ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে অবস্থান করে আছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী সময় বাঙালি অনুপ্রবেশ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আসামে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত আসাম ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে উত্তাল গণআন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে। ১৯৮৫ সালে আসাম অ্যাকর্ড[১০] (Assam Accord 1985) স্বাক্ষর হওয়ার পর এই সমস্যার সাময়িক প্রশমন হলেও, এখনো তার সর্বাত্মক সমাধান সম্ভব হয়নি। এছাড়া ত্রিপুরা, মেঘালয়, মনিপুর প্রভৃতি রাজ্যে বাঙালি বসতির অংশ হিসেবে নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

অপরদিকে, দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয় ও রাজনীতিক কাঠামোয় সংকটাপন্ন হয়ে পড়তে থাকে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক পরিমণ্ডলে পূর্ব পাকিস্তানের নমঃশূদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি বাস্তুচ্যুতি জনিত অভিবাসনের প্রভাবে ধীরে ধীরে জনবিন্যাসগত পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এই

পরিস্থিতিতে হিন্দু তথা নমঃশূদ্ররা দলে দলে অভিবাসিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত অভিমুখে আসতে থাকে অথবা অনেকেই ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলিম সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন থেকে বাঁচার বিকল্প পথ গ্রহণ করেন। অতঃপর খুবই স্বল্প সংখ্যক নমঃশূদ্র জাতির মানুষই পূর্বপুরুষের বাসস্থান আঁকড়ে ধরে, বঙ্গের পূর্ব অংশে অর্থাৎ নবগঠিত পূর্ব পাকিস্থান (বর্তমান বাংলাদেশ) এ থেকে যান। ফলস্বরূপ সেখানে ঐক্যবদ্ধ নমঃশূদ্র জাতি আন্দোলনে ভাটা পড়তে শুরু করে। একদা নমঃশূদ্র জাতির চেতনা উত্থানের ভিত্তিভূমিতেই তাদের জাতি রাজনীতি অবলুপ্ত হতে শুরু করে। এই বিষয়টি গবেষণা মূলক আলোচনার বাইরে রয়ে গেছে। এছাড়া ভারতের বাইরে নেপাল, মরিশাস এবং অন্যান্য দেশে বসবাসকারী নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী একটি অনালোচিত অধ্যায় হিসেবে রয়ে গেছে।

বর্তমানে এই জনগোষ্ঠীর অর্ধকোটির বেশি মানুষজন ভারত, বাংলাদেশ ও বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন। ইতিপূর্বে বাংলার জাতিচর্চার ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে দেশভাগ পূর্ববর্তী নমঃশূদ্র জাতির প্রসঙ্গ উঠে আসতে দেখা যায়। কিন্তু বাংলা বিভাজন পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচিতি পুনর্গঠনে জাতি চেতনা এবং সামাজিক অবস্থানের স্বতন্ত্র ইতিহাস গবেষণা মূলক পর্যালোচনার বাইরে রয়ে গেছে। এই অনালোচিত বিষয়টিকে উপজীব্য করে আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি:

'বিভাজিত বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারতে জাতি চেতনার বিবর্তন: নমঃশূদ্র জাতির একটি আলোচনা (১৯৪৭-২০২১)' শিরোনামের গবেষণা পত্রটি আলোচনার ক্ষেত্রে ১৯৪৭ এর দেশ

বিভাজনের পরবর্তী সময় থেকে ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত নির্ধারিত সময় পর্বকে নেওয়া হয়েছে। এই পর্বে জাতি চেতনার উত্থানের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পরিসরে জাতি রাজনীতির সূচনা এবং তার সঙ্গে সামাজিক অবস্থানের বিষয়টিকে কার্য-কারণের সম্পর্কের ভিত্তিকে উপজীব্য করে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪৭ থেকে ২০২১ সালের মধ্যবর্তী পর্বে তিনটি পৃথক স্থানের ভিন্ন ভিন্ন পরিমণ্ডলে নমঃশূদ্র জাতি চেতনার বিবর্তনকে তুলে ধরে আলোচনাটি ক্রমশ অগ্রসর হয়েছে।

এক্ষেত্রে এই তিনটি স্থান হল বিভাজিত বাংলা বা ঔপনিবেশিক বঙ্গপ্রদেশের বিভাজিত দুইটি অংশ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ এবং বর্তমান বাংলাদেশ। এই দুইটি ক্ষেত্রও ছাড়া তৃতীয় স্থান হিসেবে উত্তর-পূর্ব ভারতের আসম ও ত্রিপুরা রাজ্যে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা এবং পরিচিতির বিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে। কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর পরিচিতি জাতি চেতনার বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতির আলোচনা বিবর্তিত হয়েছে, ঔপনিবেশিক পর্বে নির্মিত তপশিলি পরিচিতির নিরিখে। অর্থাৎ স্বাধীনতা (১৯৪৭) পরবর্তী সময় থেকে ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত কালপর্বে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যে নমঃশূদ্র জাতির পরিচিতি নির্মাণ হওয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য বা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের এই ভিন্নতা নির্ণয় করাই হলো বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটির আলোচনার পরিধি।

পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকন:

জাতি বা বর্ণ চর্চার ইতিহাস বর্তমান ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসে প্রাসঙ্গিক ও বহুচর্চিত একটি বিষয়। ঔপনিবেশিক ভারতে শাসনতন্ত্রকে সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ থেকে

ভারতের সমাজ-সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য বিদেশি আমলাতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের অনুসন্ধান ও গবেষণামূলক প্রয়াস শুরু হয়। যার ফলস্বরূপ ১৭৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি স্যার উইলিয়াম জোনসের তত্ত্বাবধানে ব্রিটিশ ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১] এই সংস্থাটি স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি তথা জাতি চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা শুরু হয়।

এর পাশাপাশি প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও গবেষণামূলক লেখায় ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি জাতি বা বর্ণ বৈষম্যের বিষয়টিও উঠে আসে। ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন,[১২] উইলিয়াম উইলসন হান্টার,[১৩] হাবার্ট হোপ রিসলে,[১৪] জেমস ওয়াইজ[১৫] এছাড়া, ১৮৭২ সাল থেকে বিভিন্ন আদমশুমারি[১৬] প্রভৃতি প্রতিবেদন গুলিতে বাংলার নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য সামাজিক ভাবে নিষ্পেষিত জাতির ইতিহাস উঠে আসতে শুরু করে।

উক্ত লেখনিগুলি মূলত ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের শাসনতান্ত্রিক সুবিধার্থে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদন গুলির মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের জাতি ও বর্ণগত বৈষম্যের বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসতে থাকে। এর পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং সামাজিক ন্যায়ের ধারণা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নিষ্পেষিত মানুষের মধ্যে আত্মচেতনার স্পর্ধার সঞ্চার ঘটায়। এই চেতনার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জাতি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

এই সময় থেকে ঔপনিবেশিক গবেষকের পাশাপাশি ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসে বর্ণ ও জাতি সম্পর্কিত আলোচনা গুরুত্ব পেতে থাকে। এর প্রাথমিক সূত্রপাত দেখতে

পাওয়া যায়, ১৮৯০ এর দশকে যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের *'Hindu Caste and Sects*[১৭] গ্রন্থে। তিনি ভারতের বর্ণ ব্যবস্থা তথা জাতি ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৯৩১ সালে প্রকাশিত নৃপেন্দ্র কুমার দত্তের '*Origin and Growth of Caste in India*[১৮] গ্রন্থে ঋক বৈদিক যুগ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত জাতি বর্ণ ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে[১৯] বাংলার পাটনি, রাজবংশী, নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য জাতির সম্মানজনক জাতি পরিচিতি নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ ইতিপূর্বেই মি: দত্তের আলোচনায় সংস্কৃতায়ন সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত হতে দেখা যায়। সামাজিক ঊর্ধ্ব গতিময়তার একটি আলোচনা নির্মল কুমার বসুর 'হিন্দু সমাজের গড়ন'(১৯৪৯)[২০]বইটিতেও পরিলক্ষিত হয়।

পরবর্তীতে, শ্রীধর ভেঙ্কটেশ কেটকার,[২১] জি.এস. ঘুরে,[২২] এম.এন. শ্রীনিবাস,[২৩] এ.আর. দেশাই,[২৪] ইরাবতী কার্ভে[২৫] প্রভৃতি গবেষকের হাত ধরে জাতি ও বর্ণ চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার স্বীকৃতি পাওয়া শুরু করে। এই ভাবে জাতি চর্চার পরিধি পরিব্যাপ্ত হতে থাকে।

এর পাশাপাশি স্বাধীনতা পরবর্তী জাতি চর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্ব উঠে আসতে দেখা যায়। যেমন- ১৯৫২ সালে এম.এন. শ্রীনিবাস দক্ষিণ ভারতের কুর্গ জাতির উপর গবেষণা কার্য সংগঠিত করেন। কুর্গ জাতির সামাজিক অবস্থানের ঊর্ধ্বগতিময়তার উপর ভিত্তি করে, তিনি যে সংস্কৃতায়ন (Sanskritization)[২৬] তত্ত্ব প্রদান করেন, তা ভারতীয় বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনকে দেখার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

ক্রিস্টোফ জেফ্রিলো তাঁর '*Religion, Caste And Politics In India*'[২৭]বইটিতে হিন্দু ধর্মের সামাজিক বৈষম্য থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিকল্প ধর্মীয় দর্শনের আশ্রয় নেওয়ার তত্ত্ব দিয়েছেন।

লুই ডুমো, তাঁর '*Homo Hieirachicus*, 1966'[২৮] গ্রন্থে সামাজিক অগ্রগণ্যতায় নির্ভেজাল বা খাঁটি জাতির তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। পরবর্তী বিভিন্ন সময়ের লেখায় পেশাগত বিভাজন, জাতি বা শ্রেণীর গতিময়তা, সামাজিক গতিময়তা প্রভৃতি তত্ত্ব উঠে আসে। এই তত্ত্ব সমূহ ভারতীয় বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থার বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরেছে।

১৯৮০-এর দশকে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা[২৯] (Subaltern Studies) এর উত্থান সমাজের প্রান্তিক অংশের ইতিহাস লেখায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।বিষয়টি জাতি বা বর্ণ চর্চার ইতিহাস লেখার প্রক্রিয়ায় এক নতুন উদ্যম নিয়ে এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণ ও জাতি চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের '*Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namusudras of Bengal 1872-1947*',[৩০] এবং *'Caste, Culture and Hegemony: Social Domination in Colonial Bengal'*,[৩১] প্রভৃতি গবেষণামূলক গ্রন্থ। তিনি ঔপনিবেশিক পর্বের নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থসমূহে স্বাধীনতা তথা দেশভাগ পরবর্তী নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ইতিহাসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।

বাংলার জাতি আন্দোলন চর্চায় রাজবংশী আন্দোলন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। স্বরাজ বসু তাঁর *'Dynamics of a Caste Movement: The Rajbanshis if North Bengal,*

1910-1947[৩২]গ্রন্থে ঔপনিবেশিক পর্বের রাজবংশী আন্দোলন তুলে ধরেছেন। যুথিকা বর্মা, তাঁর *'জাতি-রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি: উপেন্দ্রনাথ বর্মন (১৮৯৮- ১৯৮৮) ও তাঁর সমকালীন উত্তরবঙ্গ*[৩৩] গ্রন্থে রাজবংশী জাতির জাতীয় রাজনীতিতে উন্নীতকরণের কারিগর উপেন্দ্রনাথ বর্মনের ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনায় রূপ কুমার বর্মণের, *'Partition of India and Its Impact on Scheduled Castes of Bengal'*[৩৪] বইটিতে তিনি, ভারত ভাগের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের তপশীলি জাতিদের উপর কি প্রভাব পড়েছিল, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। *Right-Left-Right' and Caste Politics: The Scheduled Castes in West Bengal Assembly Elections (from 1920 to 2016)*,[৩৫]বইটিতে তিনি স্বাধীনতা পরবর্তীকালে, সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি প্রাঞ্জল চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর, *জাতি- 'রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান,'*[৩৬] বইটিতে সমাজের মননের ভিতরে লুকিয়ে থাকা বর্ণবৈষম্যের বীজ ও পশ্চিমবঙ্গের জাত রাজনীতিতে দল দাস তৈরির প্রক্রিয়াকে তুলে ধরেছেন। *'Caste, Politics, Casteism and Dalit Discourse: The Scheduled Castes Of West Bengal*[৩৭] বইটিতে পশ্চিমবঙ্গের সকল তপশিলি জাতির আত্মপরিচিতি এবং রাজনীতির উত্থান তুলে ধরেছেন। *'Migration, State Policies and Citizenship: A Historical study on India', Bangladesh and Bhutan*[৩৮] গ্রন্থে উদ্বাস্তু সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ জাত পাত জাতি রাজনীতি ও তপশিলি সমাজ,[৩৯] প্রভৃতি গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের সকল তপশিলি জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান তুলে ধরেছেন।

তাঁর বইগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের সকল তপশিলি জাতির আলোচনা থাকলেও, স্বতন্ত্র নমঃশূদ্র জাতির সামগ্রিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়নি।

এছাড়া তাঁর 'পরিবর্ত অনুসন্ধান: রাষ্ট্র নাগরিকত্ব বাস্তুচ্যুতি ও ইতিহাসচর্চা,[৪০] বইটিতে স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জাতি বৈষম্য এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করেছেন। মালো জাতির ইতিহাস চর্চায় রূপ কুমার বর্মণ তাঁর *'Caste, Class and Culture: The Malos, Adwaita Malla Barman and History of India and Bangladesh*[৪১] গ্রন্থে মালো জাতির চেতনার উত্থান এবং সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করেছেন। এর পাশাপাশি অদ্বৈত মল্লবর্মণের লেখায় মালো জাতির সামাজিক বিবরণ উঠে এসেছে।

বাংলার পৌন্ড্র জাতির ইতিহাস চর্চায় কৃষ্ণ কুমার সরকার তাঁর, *জাতি আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ: বাংলার পৌন্ড্র জাতির একটি বিশ্লেষণ (১৯১১-২০১১)*[৪২] গবেষণা পত্রে পৌন্ড্র জাতির ১০০ বছরের ইতিহাসে, জাতির চেতনা থেকে রাজনৈতিক চেতনা উত্তরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। মিলন রায় তাঁর *'বাংলার বাগদি জাতি: জীবনধারা সংগ্রাম ও বিবর্তন*[৪৩] গবেষণা পত্রটিতে বাগদি জাতির সামাজিক ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তী প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রে মনোশান্ত বিশ্বাস তাঁর, *'বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি';*[৪৪] বইটির ভূমিকায় ভারতীয় দলিত আন্দোলনের ইতিহাস চর্চার ধারাগুলিকে আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে মতুয়া ধর্মের তাত্ত্বিক আদর্শবাদ, সমাজ সংস্কার আন্দোলন, শিক্ষা বিস্তার আন্দোলন, ১৮৭২ থেকে ১৯৪৭ সাল এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৯০ সাল এই দুইটি পর্বে ভাগকরে মতুয়া রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং পরিশিষ্টে মতুয়া

মহাসঙ্ঘের পুনরুত্থান ও পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় রাজনীতির নতুন সমীকরণ বিশ্লেষণ করে বইটি সমাপ্ত করেছেন। এই বইটিতে মতুয়া ধর্মের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতির উপরেই বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, সামগ্রিক নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাসে নয়।

Rohidas Mondal তাঁর *'Dynamics of Caste, Religion, Culture and Politics 1872- 1971'* [৪৫] গ্রন্থে স্বাধীনতা-পূর্ব নমঃশূদ্র জাতির বর্ণ বৈষম্য আন্দোলন, তাদের ধর্মীয় আচার আচরণ এবং ১৯৭১ পর্যন্ত বঙ্গ রাজনীতিতে নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। বইটি লেখার ক্ষেত্রে নমঃশূদ্র জাতি চেতনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এছাড়া ২০২১ পর্যন্তও আলোচিত হয়নি। কানু হালদার তাঁর *'স্বাধীনতা উত্তর পর্বে বঙ্গীয় সমাজে মতুয়াদের রাজনৈতিক জাগরন এবং উত্তরণ* (১৯৪৭ থেকে ২০১১ এর দশক)'[৪৬] গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে মতুয়া মহাসংঘ তথা মতুয়া ধর্মের অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। বইটিতে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা তথা জাতি রাজনীতির ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাওয়া যায় না।

দ্বৈপায়ন সেন তাঁর, '*The decline of the Caste question: the marginalization of Dalit politics in Bengal*'[৪৭]বইটিতে যোগেন মন্ডলের নেতৃত্বে দেশ ভাগ সময় কালীন নমঃশূদ্র রাজনীতির বিভিন্ন দিক এবং ১৯৪৭ এর বাংলা ভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু আন্দোলনকে তুলে ধরেছেন। বইটিতে যোগেন মন্ডলের রাজনীতি কেন্দ্রিক আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে দেশভাগ পরবর্তী নমঃশূদ্রদের সার্বিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়নি।

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও দেশভাগ পরবর্তী বিভিন্ন উদ্বাস্তু চর্চায় নমঃশূদ্র জাতির বিবরণ পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে শ্রী হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা '*উদ্বাস্তু*[৪৮] বইটি ১৯৭০ সালে সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৭ এর

দেশভাগ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের মুখ্য সচিব ও মহাধ্যক্ষ থাকাকালীন অভিজ্ঞতার একটি প্রাঞ্জল বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে দেশভাগ পরবর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক চিত্র, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, সরকারী নীতি ও উদ্বাস্তুদের জীবন। বইটিতে দেশভাগকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক ইতিহাস পাওয়া গেলেও নির্দিষ্টভাবে নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস লেখা হয়নি।

Kanti B. Pakrashi এর লেখা '*A sociological study of Refugees of West Bengal*, (1971),[৪৯] বইটিতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্বপাকিস্থান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের উপর করা সংখ্যাতাত্ত্বিক সমীক্ষার প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শৈবাল কুমার গুপ্তের প্রবন্ধ *'Dandakaranya: A Survey of Rehabilitation, The Ecomomic Weekly, (১৯৬৫)*[৫০]দণ্ডকারণ্যের পুনর্বাসন ক্যাম্পের প্রশাসনিক অব্যবস্থার কথা তুলে ধরেছেন।

প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর লেখা প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত '*প্রান্তিক মানব পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের কথা* (১৯৯৭)'[৫১] বইটিতে স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা, বিভিন্ন উদ্বাস্তু আন্দোলনকারী সংগঠন ও বিভিন্ন উদ্বাস্তু ক্যাম্পের বিবরণ প্রসঙ্গে নমঃশূদ্র উদ্বাস্তু মানুষের কথা উঠে এসেছে। বইটিতে আলাদা করে নমঃশূদ্র জাতি নিয়ে আলোচনা হয়নি। অনিল সিংহের লেখা '*পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু উপনিবেশ* (১৯৯৫)'[৫২] বইটিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জবরদখল কলোনি, উদ্বাস্তু রাজনীতি প্রভৃতি আলোচনা করেছেন। বইটিতে আলাদা করে নমঃশূদ্রদের ইতিহাস পাওয়া যায় না।

জয়া চ্যাটার্জী তাঁর, *'Bengal Divided Hindu Communalism and Partition 1932-1947*[৫৩] এবং '*The Spoils of Partition Bengal and India, 1947-1967*[৫৪]বই দুটিতে দেশভাগ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কংগ্রেস রাজনীতি এবং উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাসকে আলাদা করে দেখানো হয়নি।

বাবুল কুমার পাল তাঁর, *'বরিশাল থেকে দণ্ডকারণ্য: পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ইতিহাস',*[৫৫]বইটিতে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু নমঃশূদ্রদের পুনর্বাসন, বাংলা রাজনীতিতে দলিত নমঃশূদ্র জাতির ভূমিকা বিশেষ করে যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের ভূমিকা এছাড়া বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে নমঃশূদ্র জাতির জড়িয়ে পড়া, দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন, মরিচঝাঁপির ঘটনা তুলে ধরেছেন। বইটিতে নমঃশূদ্র জাতির সার্বিক উদ্বাস্তু আন্দোলনের চিত্র পাওয়া যায় না।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুসূয়া বসু রায়চৌধুরীর '*In Search of Space The Scheduled Caste Movement in West Bengal after Partition',*[৫৬] প্রতিবেদনটিতে ভারতভাগ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের অনুসূচিত জাতি গুলির উদ্বাস্তু রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন। লেখাটিতে উদ্বাস্তু রাজনীতির এক খন্ড চিত্র উঠে এসেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক গবেষকদের আলোচনায় উত্তর পূর্ব ভারতের আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বাঙালি জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নমঃশূদ্র জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ হল- শিপ্রা সেনের '*Tribes and Castes of Assam*[৫৭] কে. সিং সম্পাদিত '*People of India*[৫৮] সংকলনের 'আসাম', অংশ-২। বিমল কুমার হাজারিকা সম্পাদিত Core Problems of Scheduled Castes of Assam।[৫৯] জী. সি. শর্মা ঠাকুরের *'Socio-Economic Development of the Schedule Castes of Assam',*[৬০] প্রভৃতি গ্রন্থে আসামের বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতির মধ্যে নমঃশূদ্র জাতির বসবাস অঞ্চল এবং সামান্য ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

রূপ কুমার বর্মণ, তাঁর '*Contested Regionalism',*[৬১] গ্রন্থে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং কোচবিহারের বিচ্ছিন্নতাবাদি জাতি রাজনীতির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। জয়িতা শর্মার *'Empire's Garden Assam and the Making of India'*,[৬২] বিবেক চাডার *'Low Intensity Conflicts in India An Analysis',*[৬৩] সমীর কুমার দাসের *'Conflict and*

Peace in India's Northeast: The Role of Civil Society',[৬৪] ইয়াসমিন সাইকিয়ার '*Assam and India: Fragmented Memories, Cultural Identity and The Tai-Ahom Struggle*',[৬৫] প্রভৃতি গ্রন্থে আসাম তথা উত্তর পূর্ব ভারতের ভাষা সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্বের উৎস আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া নম্রতা গোস্বামীর '*Bangladeshi Illegal Migration into Assam: Issues and Concerns from the Field*',[৬৬] সুবীর করের, বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস,[৬৭] প্রসূন বর্মনের, 'অসম আন্দোলন ১৯৭৯-১৯৮৫',[৬৮] প্রফুল্ল কুমার মহন্তর '*The Tussle Between the Citizens and Foreigners*',[৬৯] প্রভৃতি গ্রন্থে আসামের 'বাঙাল খেদা' আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এবং উদ্বাস্তুদের কথা উঠে আসতে দেখা গেছে।

ত্রিপুরার ইতিহাসের ক্ষেত্রে সুচিন্ত্য ভট্টাচার্যর 'ত্রিপুরার ইতিহাস ও সংস্কৃতি'[৭০]গ্রন্থে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় বাঙালি অভিবাসনের চিত্র পাওয়া যায়। দিনেশ চন্দ্র সাহা তাঁর 'ত্রিপুরায় গণআন্দোলনের বিচিত্র ধারা'[৭১] গ্রন্থে রাজন্য যুগ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। জয়ন্ত দেবনাথের 'সন্ত্রাস ক্লান্ত ত্রিপুরা',[৭২] রঞ্জিত দের, ত্রিপুরার লোক জীবন ও লোকসংস্কৃতি[৭৩] নরেশচন্দ্র দেববর্মা, বিমান ধর, কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী সম্পাদিত 'ত্রিপুরার আদিবাসী',[৭৪] প্রভৃতি গ্রন্থে ত্রিপুরার বাঙালি জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত গ্রন্থ সমূহে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালি হিসেবে নমঃশূদ্রদের উল্লেখ থাকলেও নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতির নিরিখে এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রেক্ষাপটে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী আলোচনার ক্ষেত্রে Iftekhar Uddin Chowdhury তাঁর 'Caste-*Based Discrimination in South Asia: A Study of Bangladesh*',[৭৫] বইতে বাংলাদেশে জাতি গত বৈষম্যের বিবরণ

দিয়েছেন। Mazharul Islam, Altaf Pervez এর *'Dalit Initiatives in Bangladesh'*,[৭৬] গ্রন্থে বাংলাদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু দলিতদের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। যতীন সরকার তাঁর 'পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যু দর্শন',[৭৭] গ্রন্থে বাংলাদেশের ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন ইতিহাস তুলে ধরেছেন। পঙ্কজ ভট্টাচার্য, তপন কুমার দে সম্পাদিত 'বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু সঙ্কট',[৭৮]গ্রন্থে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি ২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সাম্প্রদায়িক হিংসার বিবরণ উঠে এসেছে। বদরুদ্দিন উমর, তাঁর 'যুদ্ধত্তর বাংলাদেশ',[৭৯] গ্রন্থে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনীতি এবং সংখ্যালঘু হিন্দুদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আহম্মেদ শরীফ তাঁর 'বাংলাদেশ নির্বাচন ও গনতন্ত্র',[৮০] গ্রন্থে ১৯৯০ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন। কাদের সিদ্দিক বীরত্তম, তাঁর 'স্বাধীনতা ৭১',[৮১] গ্রন্থে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ তুলে ধরেছেন। আবুল মনসুর আহমেদ, তাঁর 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর',[৮২] গ্রন্থে বাংলাদেশের ২৫ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

অমলেন্দু দে তাঁর, 'বাংলাদেশের জনবিন্যাস ও অনুপ্রবেশ সমস্যা',[৮৩] 'প্রসঙ্গ অনুপ্রবেশ',৮৪ প্রভৃতি গ্রন্থে বাংলাদেশ থেকে ভারতে হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। মহিত রায়ের, 'বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ কিছু বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ',[৮৫]গ্রন্থে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের বিবরণ পাওয়া যায়। সালাম আজাদের *'Atrocities on The Minorities in Bangladesh'*,[৮৬] গ্রন্থে হিন্দুদের বাংলাদেশ ত্যাগের কারণ তুলে ধরেছেন।আর.এম. দেবনাথ, তাঁর 'সংখ্যালঘু সমস্যা: দেশে দেশে',[৮৭] গ্রন্থে স্বাধীনতাত্তর বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনবিন্যাসের বিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করেছেন।

উপরিউক্ত লেখা সমূহে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় উঠে আসলেও, উপাদান গুলিতে ১৯৪৭ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর জাতি চেতনার

বিষয়টি অধরা রয়ে গেছে। ১৯৪৭ সাল পরবর্তী নমঃশূদ্র জাতি চেতনা, জাতি রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থানের কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিপাদ্য গবেষণা পত্রে আলোচিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে বাংলা বিভাজন (১৯৪৭) এর কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নমঃশূদ্র জাতি পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) এর নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে ভারত এবং অন্যান্য দেশে অভিগমন করে ছিলেন। আবার একটি অংশ অভিগমন না করার ফলে বর্তমান বাংলাদেশ অবস্থান করে আছে। এর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অঞ্চলে অভিবাসিত নমঃশূদ্র জাতির পরিচিতি এবং সামাজিক অবস্থানের ভিন্নতা তৈরি হয়েছে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে জন গোষ্ঠীটী তপশিলি জাতি হিসেবে রাজনৈতিক সমীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশের আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যে তপশিলি জাতি হিসেবে পরিচিত হলেও ভাষা এবং সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কারণে ভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। অপরদিকে জাতি চেতনা উত্থানের ভিত্তি ভূমি বা বর্তমান বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতিতে, তাঁরা ধর্মীয় সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন।

জাতি চর্চার বিভিন্ন গবেষণা মূলক আলোচনায় দেশভাগ পরবর্তী নমঃশূদ্র জাতির উদ্বাস্তু প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা হলেও তাদের পরিচিতিগত সমস্যার বৈষম্যমূলক দিকটি গবেষণামূলক আলোচনা পরিধির বাইরে রয়ে গেছে। এই বিষয়টিকে ঐতিহাসিক পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করা গবেষণা পত্রটির উদ্দেশ্যে।

গবেষণা প্রকল্প:

'বিভাজিত বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারতে জাতি চেতনার বিবর্তন: নমঃশূদ্র জাতির একটি আলোচনা (১৯৪৭-২০২১)' শিরোনামের গবেষণা কর্মটিতে, ১৯৪৭ এর দেশ বিভাজনের

পরবর্তী সময় থেকে ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত নির্ধারিত সময় পর্বের মধ্যে সংগঠিত জাতি চেতনার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পরিসরে উত্থান এবং তার সঙ্গে সামাজিক অবস্থানের সম্পর্কটি কার্য-কারণের সম্পর্কের ভিত্তিকে উপজীব্য করে আলোচনা করা হয়েছে।

এই পর্যালোচনায়-

১. ১৯৪৭ সালের বাংলা বিভাজনে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচিতি এবং সামাজিক অবস্থানের আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। এই পরিস্থিতিতে নব গঠিত দুইটি ভিন্ন রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় তাঁদের জনবিন্যাস, কর্মসংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক চেতনা এক নতুন ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে, যা তাঁদের নতুন পরিচিতি নির্মাণের দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য করে ছিল।

২. ভারতে বসবাসকারী নমঃশূদ্র জাতির একটি বৃহত্তম অংশ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করে আছেন। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে নমঃশূদ্র ভোট ব্যাংক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মধ্যে একটি অংশের মানুষ মতুয়া ধর্মের অনুসারী। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ তথা জাতীয় রাজনীতিতে মতুয়া সংগঠন সমগ্র নমঃশূদ্র জাতির প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে। সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই নমঃশূদ্র ও মতুয়া সমীকরণ আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু।

৩. উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে বসবাসকারী নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী আশির দশকের ‘বাঙাল খেদা’ আন্দোলনের পরিমণ্ডলে, তাদের স্বতন্ত্র জাতি পরিচিতি হারিয়ে সকল সঙ্কটাপন্ন বাঙ্গালীর একটি অংশ হয়ে উঠেছে।

৪. দেশভাগের (১৯৪৭) পর পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী পরিবর্তিত সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় নীতি ও রাজনীতিক পরিমণ্ডলের কারণে, দলে দলে অভিবাসিত হয়ে ভারতে চলে আসতে শুরু করে। ফলত ওই সকল অঞ্চলের জনবিন্যাসে এক বিপুল পরিবর্তন ঘটে যায়। এই পরিবর্তন তাদের বর্তমান বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশে পরিণত করেছে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পে নির্ধারিত তিনটি ভিন্ন স্থান ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতি ও জাতি চেতনার তিনটি ভিন্ন প্রেক্ষিত উঠে আসছে। এই ভিন্নতাপূর্ণ বিষয় সমুহকে উপজীব্য করে গবেষণা প্রকল্পটি পর্যালোচিত হয়েছে।

গবেষণার প্রশ্ন সমূহ:

ক. কোন ব্যক্তি বা মানব গোষ্ঠীর পরিচিতি নির্মাণ একটি প্রগতিশীল প্রক্রিয়া। ১৯৪৭ পরবর্তী বাংলা বিভাজনে নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতি নির্মাণে এই তত্ত্ব কীভাবে অবস্থান করছে?

খ. ১৯৪৭-এ বাংলা বিভাজনের মধ্য দিয়ে তপশিলি জাতি কীভাবে সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল এবং এই সঙ্কটের সমাধানে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা কীভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে?

গ. বাংলা বিভাজন (১৯৪৭) পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্র জাতি ও মতুয়া রাজনীতির সমীকরণ কীভাবে সহাবস্থান করে আছে?

ঘ. ১৯৪৭ পরবর্তী ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশে বাঙালি খেদা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা কীভাবে বাঙালি পরিচিতিতে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে?

ঘ. বাংলাদেশের রাজনীতিতে নমঃশূদ্র জাতি কীভাবে হিন্দু সংখ্যালঘু পরিচিতি পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে উঠেছে?

প্রভৃতি প্রশ্ন এই প্রস্তাবিত গবেষণার আলোচ্য বিষয়।

গবেষণার প্রকৌশল ও উপাদান:

গবেষণা সন্দর্ভটি লেখার প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক উপাদান, ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন গ্রন্থের তথ্য এবং তত্ত্বের সহায়তায় আরোহী পদ্ধতি (Inductive Method) অবলম্বন করে গবেষণা কার্যটি অগ্রসর হয়েছে। প্রাথমিক উপাদান হিসেবে ঔপনিবেশিক বাংলার আদমশুমারি, বিভিন্ন জেলার গেজেটিয়ার এবং সরকারি প্রতিবেদন, বিভিন্ন আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ ও সহকারী তথ্য মূলক প্রতিবেদন প্রভৃতি থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির ওপর রূপ কুমার বর্মণ মহাশয়ের বৃহৎ গবেষণা প্রকল্প (Major Project) এর ক্ষেত্র সমীক্ষার সহকারি হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চলের নমঃশূদ্র জাতির তথ্য ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করে, তা পর্যালোচনা করার সুযোগ হয়েছে। পাশাপাশি কুচবিহারের আঙারাকাটা পায়রাডুবি, নাদিয়ার পলাশীপাড়া, কলকাতার ঠাকুরপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণার ঠাকুরনগর অঞ্চলের ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে নমঃশূদ্র জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন আকলন করার প্রয়াস করা হয়েছে।

প্রাথমিক উপাদান ও বিভিন্ন গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, Centre for Studies in Social Sciences Library, জদুনাথ সরকার গ্রন্থাগার, দুর্গানগর আম্বেদকর মিশন, ঠাকুর নগর প্রকাশনী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় মহাফেজখানা ও জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতির তথ্যের সহায়তায় গবেষণা পত্রের ভিত্তি যাচাই করে নেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় বিন্যাস:

বর্তমান সন্দর্ভটি আলোচনার সুবিধার্থে পাঁচটি মূল অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ভূমিকাতে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, সাহিত্য অভীক্ষা, উদ্দেশ্য, গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, গবেষণার উপাদান, গবেষণা পদ্ধতি ও প্রতি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অবদমনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় চেতনার উত্থানের সঙ্গে কীভাবে কোন জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান বা পরিচিতি এবং মর্যাদার বিষয়টি পারস্পরিক কার্যকারণ বন্ধনে সম্পর্কিত রয়েছে, তা তুলে ধরা হয়েছে। এই আলোচনায় ভারতীয় জাতি ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থের ভূমিকা উঠে আসতে দেখা যায়। ঔপনিবেশিক পর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়ের ধারণার প্রসারের মধ্য দিয়ে এই সকল পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর মধ্যে চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। এই চেতনা তাদের আত্মপরিচিতি অন্বেষণে পরিচালিত করে ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতি চেতনায় উদ্ভূত হয়ে যে সকল সামাজিক ঊর্ধ্বগতিময়তার আন্দোলন গড়ে উঠে ছিল, তা আলোচিত হয়েছে। এর পাশাপাশি বাংলার রাজবংশী, নমঃশূদ্র, পৌন্ড্র বাগদি, বাউরি, মালো, ধোপা, হাড়ি প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর সামাজিক উত্থানের বিবরণ উঠে এসেছে। এই প্রেক্ষিতে মতুয়া আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর উত্থান এবং জাতি রাজনীতির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ মধ্যবর্তী পর্বে বাংলার রাজনীতিতে নমঃশূদ্র সম্পৃক্ততা তাদের জাতি রাজনীতিকে এক নতুন পরিচিতি এনে দিতে সক্ষম হয়ে ছিল, এই বিষয়টি উঠে এসেছে।

পরবর্তীতে দেশভাগের (১৯৪৭) মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র জাতি রাজনীতির এবং পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে সংকট তৈরি হয়ে ছিল। এমত পরিস্থিতিতে তাঁরা বাস্তুচ্যুত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে অভিবাসিত হয়ে পড়ে। এই ঘটনা ক্রমের মধ্যে দিয়ে তাঁদের নতুন সামাজিক অবস্থান বা পরিচিতি নির্মাণ শুরু হয়ে ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়ে দেশভাগ (১৯৪৭) পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে নমঃশূদ্র জাতির নব পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে জাতি চেতনার ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে মতুয়া এবং নমঃশূদ্র জাতির পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জাতি চেতনা ও জাতি রাজনীতির প্রেক্ষিত উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে অবিভক্ত বাংলার জাতি রাজনীতির ভরকেন্দ্র পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হয়ে আসতে দেখা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে উত্তর পূর্ব ভারতের আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যে নমঃশূদ্র জাতির সামাজিক পরিচিতি নির্মাণের প্রেক্ষিত আলোচনা করা হয়েছে। আসামের ভাষা এবং নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ক্ষেত্রে তাঁরা হয়ে উঠেছে বহিরাগত বাঙালি জনগোষ্ঠীর অংশ।

পঞ্চম অধ্যায়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশে থেকে যাওয়া নমঃশূদ্র জাতির সামাজিক অবস্থান আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় দেখা যায় যে, নমঃশূদ্র জাতি রাজনীতির উত্থান ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত বর্তমান বাংলাদেশ এই জাতিটি হয়ে উঠেছে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অংশ। সে ক্ষেত্রে তাদের পূর্ববর্তী জাতি চেতনা তথা জাতি আন্দোলন অবলুপ্ত হয়েছে।

উপসংহারে আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে পশ্চিম বঙ্গ, পূর্ব বঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশ এবং উত্তর পূর্ব ভারতের আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য, এই তিনটি অঞ্চলে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বে

নমঃশূদ্র জাতি চেতনার ইতিহাস লেখা হয়েছে। গবেষণার নিরীক্ষিণের মধ্য দিয়ে, এই তিনটি অঞ্চলে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা ও রাজনৈতিক অবস্থানের তিনটি ভিন্ন প্রেক্ষিত উঠে এসেছে।

প্রথম ক্ষেত্র হিসেবে বাংলা বিভাজন (১৯৪৭) পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে নমঃশূদ্র জাতিটি নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা সহ বেশ কয়েকটি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে, বিধানসভার ও লোকসভা নির্বাচনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভোট রাজনীতির সমীকরণ প্রভাবিত করার সক্ষমতা তাঁদেরকে একদিকে নাগরিক অধিকার, জাতি রাজনীতি চর্চার অধিকার এনে দিয়েছে। অপরদিকে তাদেরকে করে তুলেছে অন্যান্য স্থানে বসবাসকরি নমঃশূদ্র জাতির মানুষের অভিভাবক।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র হিসেবে উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যে নমঃশূদ্র জাতির প্রেক্ষিত উঠে এসেছে। রাজ্য দুইটিতে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বাঙালি জনগোষ্ঠীর নৃতত্ত্বগত (Ethno Cultural) এবং ভাষা সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্ব নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীকে জাতি সত্ত্বার পরিবর্তে ভাষা সত্ত্বা আরোপ করে, তাঁদের করে তুলেছে ‘বহিরাগত বাঙালি’।

ত্রিপুরা রাজ্যে দেশভাগ পরবর্তী অভিবাসনের ফলে, এখানকার জনবিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায়, বাঙালিরা হয়ে উঠেছে সংখ্যা গুরু। এই জনবিন্যাসগত পরিবর্তন ত্রিপুরার ভাষা সংস্কৃতিগত আন্দোলন তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

তৃতীয় প্রেক্ষিত হিসেবে ব্রিটিশ শাসন পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থানকারী নমঃশূদ্র জাতির অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের দীর্ঘকালীন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

নমঃশূদ্র জাতি চেতনাকে প্রান্তিকতার জায়গায় নিয়ে এসেছিল। এমতাবস্থায় একদা নমঃশূদ্র জাতির চেতনা উত্থানের ভিত্তি ভূমিতেই নমঃশূদ্র জাতি রাজনীতি অবলুপ্ত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় বর্তমান বাংলাদেশে তাঁরা অবদমিত বা তপশিলি পরিচিতি থেকে হিন্দু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ হয়ে উঠেছে।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ:

১. Note: Subaltern Studies emerged around 1982 as a series of journal articles published by Oxford University Press in India. Historians associated with the Studies are Ranajit Guha, Partha Chatterjee, Gyanendra Pandey, David Arnold, David Hardiman, Shahid Amin, Dipesh Chakrabarty, Gautam Bhadra, Gyan Prakash, Susie Tharu, Pradeep Jeganathan, Shail Mayaram, M. S. S. Pandian, Ajay Skaria, Eric Stokes and others.

২. Sekhar Bandyopadhyay: Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal, 1872-1947'

৩. Census of India, 1931

৪. Sekhar Bandyopadhyay: Caste, Protest and Identity

৫. চিত্ত মণ্ডল, প্রথমা রায়মণ্ডল (সম্পা): বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, (কলকাতা, একুশ শতক, ২০১৬), পৃ.পৃ. ১৭১-২০২।

৬. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: প্রান্তিক মানব, (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৯), পৃ. ১২।

৭. তদেব, পৃ.পৃ. ১২৫-১৫৯।

৮. আদমশুমারি, ২০২১।

৯. আদমশুমারি, ২০১১।

১০. প্রসূন বর্মন: অসম আন্দোলন ১৯৭৯-১৯৮৫, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২০)

১১. Note: The Asiatic Society founded on 15 January, 1784 in Calcutta by Sir William Jones.

১২. Montgomery Martin: The History, Antiquities, Topography and Statistics of eastern India, Vol. 5, (London, W.H. Allen and Co., 1838), Reprinted (New Delhi, Cosmo Publications, 1978)। (Note: স্কটিশ নাগরিক ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন (১৭৬২-১৮২৯) ভারতে এসে ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিযুক্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষক হিসেবে। ১৮০৭ সাল থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত তিনি দিনাজপুর, রংপুর, পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে কর্মরত থাকার সময় বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৯৩৮ সালে মন্তেগোমারি মারটিন কয়েকটি ভলিউমে প্রকাশ করেন।)

১৩. William Wilson Hunter: A Statistical Account of Bengal, 20 Volume Set, (London, Trubner & Co., 1875), Reprinted (New Delhi, D.K. Publishing House, 1973)

১৪. Herbert Hope Risley: The Tribes and Castes of Bengal, 2 volume set, (Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1892)

১৫. James Wise: Note on the Race, Caste and Tribes of Eastern Bengal, (London, Not Published, 1883).

১৬. H. Beverley: Report on the Census of Bengal 1872.

১৭. Jogendra Nath Bhattachariya: Hindu Caste and Sects: As Exposition of the Origin of the Hindu Caste system and the Bearing of the sects towards each other and towards other religious system, (Calcutta, Thacker, Spink and Co., 1896).
১৮. Nripendra Kumar Dutta: Origin and Growth of Caste in India, (Calcutta, Firma KLM Pvt. Ltd., 1969).
১৯. Nripendra Kumar Dutta: Origin and Growth of Caste in India, volume 2.
২০. নির্মল কুমার বসু: হিন্দু সমাজের গড়ন, (শান্তি নিকেতন, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, ১৯৪৯)।
২১. Shridhar Venkatesh Ketkar: History of Caste in India: Evidence of Laws of Manu, (Bombay, Taylor & Carpenter Booksellers and Publishers, 1909)
২২. G.S. Ghurye: Caste and Race in India, (London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., 1982).
২৩. Mysore Narasimhachar Srinivas: Social Change in Modern India, (New Delhi, Orient Longman, 2005).
২৪. Akshayakumar Ramanlal Desai: Rural Sociology in India, (Bombay, Vora & Co., 1961).
২৫. Irawati Karve: Hindu Society an Interpretation, (Poona, Decan College, 1961).
২৬. Mysore Narasimhachar Srinivas: প্রাগুক্ত। Note: According to this 'Sanskritization theory' lower castes adopt the cultural patterns of the higher castes, to raise their status in the caste hierarchical order.
২৭. Christophe Jaffrelot: Religion, Caste and Politics in India, (New Delhi, Primus Books, 2010).
২৮. Louis Dumont: Homo Hierarchicus: the Caste system and its implications, (USA, University of Chicago Press, 1974).
২৯. Subaltern Studies: প্রাগুক্ত।
৩০. Sekhar Bandyopadhyay: প্রাগুক্ত।
৩১. Sekhar Bandyopadhyay: *Caste, Culture and Hegemony: Social Domination in Colonial Bengal* (New Delhi, Sage Publications, 2004)
৩২. Swaraj Basu: *Dynamics of a Caste movement: The Rajbanshis if North Bengal 1910-1947, (New Delhi, Monohar, 2002).*
৩৩. যুথিকা বর্মা: জাতি-রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি: উপেন্দ্রনাথ বর্মন (১৮৯৮- ১৯৮৮) ও তাঁর সমকালীন উত্তরবঙ্গ, (কলকাতা,সোপান, ২০২১)।
৩৪. Rup Kumar Barman: *Partition of India and Its Impact on Scheduled Castes of Bengal'* (Delhi: Abhijeet publications, 2012)।

৩৫. Rup Kumar Barman: *Right-Left-Right' and Caste Politics: The Scheduled Castes in West Bengal Assembly Elections (from 1920 to 2016), (Kolkata,* Sage Publications, 2018).

৩৬. রূপ কুমার বর্মণ: *জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান,* (কলকাতা, অ্যালফাবেট বুক্স, ২০১৯)।

৩৭. Rup Kumar Barman: *Caste, Politics, Casteism and Dalit Discourse: The Scheduled Castes of West Bengal'* (New Delhi, Abhijit Publications, 2020).

৩৮. *Rup Kumar Barman: Migration, State Policies and Citizenship: A Historical study on India', Bangladesh and Bhutan' (*New Delhi, Aayu Publications, *2021).*

৩৯. রূপ কুমার বর্মণ: সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ জাত পাত, জাতি রাজনীতি ও তপশিলি সমাজ, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২)।

৪০. রূপ কুমার বর্মণ: পরিবর্ত অনুসন্ধান: রাষ্ট্র নাগরিকত্ব বাস্তুচ্যুতি ও ইতিহাসচর্চা, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২)।

৪১. Rup Kumar Barman: *Caste, Class and Culture: The Malos, Adwaita Malla Barman and History of India and Bangladesh,* (New Delhi, Abhijit Publications, 2020).

৪২. কৃষ্ণ কুমার সরকার: *জাতি আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ: বাংলার পৌন্ড্র জাতির একটি বিশ্লেষণ (১৯১১-২০১১)(অপ্রকাশিত গবেষণা পত্র)*

৪৩. মিলন রায়: *বাংলার বাগদি জাতি: জীবনধারা সংগ্রাম ও বিবর্তন,* (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২১)।

৪৪. মনোশান্ত বিশ্বাস: *বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি* (কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৬)

৪৫. Rohidas Mondal: *Dynamics of Caste, Religion, Culture and Politics 1872- 1971'* (New Delhi, Abhijit Publications, 2021)

৪৬. কানু হালদার: *স্বাধীনতা উত্তর পর্বে বঙ্গীয় সমাজে মতুয়াদের রাজনৈতিক জাগরন এবং উত্তরণ* (১৯৪৭ থেকে ২০১১ এর দশক), (কলকাতা, ডি.এম. লাইব্রেরী, ২০২১)।

৪৭. Dwaipayan Sen: *The decline of the Caste question: the marginalization of Dalit politics in Bengal, (UK, Cambridge University Press, 2018)*

৪৮. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়: উদ্বাস্তু, (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৮)।

৪৯. Kanti B. Pakrashi: A sociological study of Refugees of West Bengal' (1971)

৫০. Saibal Kumar Gupta: Dandakaranya: A Survey of Rehabilitation, The Economic Weekly, (১৯৬৫)। January 16, 1965.

৫১. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: প্রান্তিক মানব, (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৯)।

৫২. অনিল সিংহ: পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু উপনিবেশ, (কলকাতা, বুক ক্লাব, ১৯৯৫)।

৫৩. Joya Chatterji: Bengal divided Hindu communalism and partition 1932-1947, (UK, Cambridge University Press, 1994).

৫৪. Joya Chatterji - The Spoils of Partition Bengal and India, 1947-1967, ((UK, Cambridge University Press, 2007).
৫৫. বাবুল কুমার পাল: বরিশাল থেকে দণ্ডকারণ্য পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ইতিহাস, (গ্রন্থ মিত্র, কলকাতা, ২০১০)।
৫৬. Sekhar Bandyopadhyay, Anasua Basu Ray Chaudhury: *In search of space The Scheduled Caste Movement in West Bengal after Partition, (Kolkata, Mahanirban Calcutta Research Group, 2014).*
৫৭. Sipra Sen: Tribes and Castes of Assam, (New Delhi, Gayan Publishing House, 2009).
৫৮. K.S. Singh (Ed): People of India, Assam, Part-2, Anthropological survey of India, (Calcutta, seagull books, 2003).
৫৯. Bimal Kumar Hazarika (Ed): Core problems of Scheduled Castes of Assam, (Guwahati, AIRTSC, 2008).
৬০. G.C. Sharma Thakur: Socio-Economic Development of the Schedule Castes of Assam, (Guwahati, AIRTSC, 1992)
৬১. Rup Kumar Barman: Contested Regionalism, (New Delhi, Abhijeet publications, 2007).
৬২. Jayeeta Sharma: Empire's Garden Assam and the Making of India, (Durham and London, duke university press, 2011)
৬৩. Vivek Chadha: Low Intensity Conflicts in India An Analysis, (New Delhi, Sage Publications, 2004)
৬৪. Samir Kumar Das: Conflict and Peace in India's northeast: The Role of Civil Society, (Washington, East west Center, 2007)
৬৫. Yasmin Saikia: Assam and India: Fragmented Memories, Cultural Identity and the Tai-Ahom Struggle, (New Delhi, Permanent Black, 2004)
৬৬. Namrata Goswami: Bangladeshi Illegal Migration into Assam: Issues and Concerns from the Field, (New Delhi, IDSA, 2010)
৬৭. সুবীর কর: বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস, (কলকাতা, পুস্তক বিপনি, ১৯৯৯)
৬৮. প্রসূন বর্মন: অসম আন্দোলন ১৯৭৯-১৯৮৫, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২০)
৬৯. Prafulla Kumar Mahanta: The Tussle between the Citizens and Foreigners, (New Delhi, Vikas publishing house pvt ltd, 1985)
৭০. সুচিন্ত্য ভট্টাচার্যর: ত্রিপুরার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, (আগরতলা, উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০১৭)।
৭১. দিনেশ চন্দ্র সাহা: ত্রিপুরায় গণআন্দোলনের বিচিত্র ধারা, (আগরতলা, রাইটার্স পাবলিকেশন। ২০১৬)।
৭২. জয়ন্ত দেবনাথ: সন্ত্রাস ক্লান্ত ত্রিপুরা, (আগরতলা, দৈনিক সংবাদ পাবলিশার্স, ২০০১)

৭৩. রঞ্জিত দের: ত্রিপুরার লোক জীবন ও লোকসংস্কৃতি, (কলকাতা, নবজাতক প্রকাশনা, ১৯৮৬)
৭৪. নরেশচন্দ্র দেববর্মা, বিমান ধর, কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী (সম্পা): ত্রিপুরার আদিবাসী, (আগরতলা, ত্রিপুরা দর্পণ, ২০০৯)
৭৫. Iftekhar Uddin Chowdhury: Caste-based Discrimination in South Asia: A Study of Bangladesh, (New Delhi, I.I D.S., Working Paper Series, Vol III, Number 07, 2009)
৭৬. Mazharul Islam, Altaf Pervez: Dalit Initiatives in Bangladesh, (Dhaka, Nagorik Uddyog, 2013)
৭৭. যতীন সরকার: পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যু দর্শন (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫)।
৭৮. পঙ্কজ ভট্টাচার্য, তপন কুমার দে (সম্পা): বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু সঙ্কট, (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০২০)।
৭৯. বদরুদ্দিন উমর: যুদ্ধত্তর বাংলাদেশ, (ঢাকা, আফসার ব্রাদার্স, ২০১৫)।
৮০. আহম্মেদ শরীফ: বাংলাদেশ নির্বাচন ও গনতান্ত্র, (ঢাকা, আনন্যা, ২০১৭)।
৮১. কাদের সিদ্দিক বীরত্তম: স্বাধীনতা ৭১, (ঢাকা, বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী, ১৯৮৫)।
৮২. আবুল মনসুর আহমেদ: আমার দেখা রাজনীত পঞ্চাশ বছর, (ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১৩)।
৮৩. অমলেন্দু দে: বাংলাদেশের জনবিন্যাস ও অনুপ্রবেশ সমস্যা, (কলকাতা, নলেজ পাবলিশিং হাউস, ২০১২)।
৮৪. অমলেন্দু দে: প্রসঙ্গ অনুপ্রবেশ (কলকাতা, বর্ণপরিচয়, ১৯৯৩)।
৮৫. মহিত রায়: বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ কিছু বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ, (কলকাতা, ক্যাম্প, ২০১৩)।
৮৬. Salam Azad (Edited): Atrocities on the Minorities in Bangladesh, (Dhaka, Amity for peace, 2003)।
৮৭. আর.এম. দেবনাথ: সংখ্যালঘু সমস্যা: দেশে দেশে, (ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩)।

প্রথম অধ্যায়

জাতি পরিচিতি নির্মাণ: বাংলার নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী

ভূমিকা:

ভারতীয় উপমহাদেশ পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার বিকাশ কেন্দ্র। সময়ের প্রবাহে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং দর্শনের ধারা মিলিত হয়েছে, এই সভ্যতার মিলন ভূমিতে। আধ্যাত্মিকতা বা অতীন্দ্রিয়তাবাদের প্রভাবের কারণে ভারতীয় সভ্যতায় শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রভূত বিকাশ হয়েছে। অপর দিকে জ্ঞানচর্চার পরিসরে নশ্বর মনুষ্য জাতি এবং তাদের সামাজিক ঘটনা পর্যায়ক্রম বা ইতিহাস চেতনার প্রতি উদাসীনতার মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ এবং পরবর্তীকালে ইসলামের আগমনে ভারতীয় ইতিহাস চেতনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে ছিল। ভারতীয় ইতিহাসের এই নথিবদ্ধ ঘটনাবলী, সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্বের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতীয় ইতিহাসে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা হয়। ভারতীয় ইতিহাসে এই আধুনিক শৈলী তথা ঐতিহাসিক মননশীলতার অবতারণা করেছিলেন ইউরোপীয় রেনেসাঁ বা নবজাগরণের অভিঘাতে আলোকিত শাসক শ্রেণী। ইউরোপের নবজাগরণ বিশ্ব মানব সভ্যতার ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই ঘটনা বিশ্বসভ্যতা তথা ইতিহাসের অভিমুখ পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম হয়ে ছিল। নবজাগরণের মূল উপাদান ছিল, চেতনার উন্মোচন বা জ্ঞান দীপ্তি এবং যৌক্তিকতাবাদ।

চেতনা বা Consciousness হল মনের একটি ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য, যাকে আরও অনেকগুলি মানসিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন আত্মমাত্রিকতা, আত্মচেতনা,

অনুভূতিশীলতা, পৃথকীকরণ ক্ষমতা এবং নিজের সত্তা ও আশেপাশের পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্ক অনুধাবনের ক্ষমতা। অর্থাৎ চেতনার উন্মেষের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে নিজের পরিচিতি (Identity) ও সামাজিক অবস্থান (Social Status) বুঝে নেওয়ার প্রচেষ্টা কার্য-কারণ সম্পর্কের বাঁধনে গ্রন্থিত থাকে। কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে এই পরিবর্তন সাধিত হলে, তাদের সামাজিক পরিচিতি (Social Identity) ও সামাজিক অবস্থান (Social Status) এর পুনর্নির্মাণ হতে শুরু করে। এর ফলস্বরূপ ঘটতে থাকে সমাজের বিবর্তন।

এই পরিচিতি বা Identity নির্মাণ ইতিহাসের অন্যতম প্রধান উপজীব্য বিষয়। অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান অনুসারে ইংরেজি 'Identity' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Identitas' শব্দটি থেকে যার অর্থ হলো 'The same' বা 'একই'। শব্দটির মধ্যে দুইটি বৈশিষ্ট্য অন্তর্নিহিত আছে, একটি হল 'Similarity' বা 'সামঞ্জস্যতা' এবং অপরটি হল, 'Difference' বা 'বৈষম্যতা'। ১৯৭০ এর দশকে ব্রিটিশ সামাজিক মনস্তত্ত্ববিদ হেনরি তাজফিল (Henri Tajfel, 1919-1982) এবং তাঁর গবেষক ছাত্র জন টার্নার (John Turner) কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে শিক্ষায়তনিক পরিসরে সামাজিক পরিচিতি তত্ত্ব (Social Identity Theory) ব্যাখ্যা করেন।[১]

তাজফিলের মত অনুসারে সামাজিক পরিচিতি বিষয়টি একটি মানসিক ধারণার উপর নির্ভর করে, যেখানে কোন ব্যক্তি নিজেকে কোন জনগোষ্ঠী বা সংগঠনের অঙ্গ হিসেবে একাত্ম বোধ করেন। এই একাত্মবোধ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে 'In Group' বা 'আমরা' এবং 'Out Group' বা 'ওরা' এর একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্মিত হয়। এই প্রক্রিয়াটি তিনটি মানসিক ধাপে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রথমত, 'Categorise' বা শ্রেণিকরণের মাধ্যমে নিজেকে এবং অন্যদেরকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠিতে বিভাজিত করা হয়। যেমন নারী, পুরুষ,

ফুটবল দল প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত, নিজেদেরকে যে Category বা শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত বলে বিশ্বাস করা হয়, ওই জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য সকলকে নিজের মধ্যে আত্তীকরণ করা হয়। তৃতীয়, ধাপে অন্যান্য জনগোষ্ঠী বা শ্রেণীর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য থেকে নিজের জনগোষ্ঠী বা শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যকে পৃথকীকরণের মাধ্যমে 'আমরা' এবং 'ওরা' ধারনার পূর্ণতা প্রাপ্তির মাধ্যমে সামাজিক পরিচিতি বা Social Identity এর নির্মাণ হয়।

এই তত্ত্বটি সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক কর্তৃক বিভিন্ন পরিসরে সমালোচিত হলেও শিক্ষায়তনিক ক্ষেত্রে বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতা রয়েগেছে। ভারতীয় জাতি ব্যবস্থার ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক রূপ কুমার বর্মণের 'জাতি রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক' বইটিতে পরিচিতিগত সংঘাতের এই বিষয়টি উঠে এসেছে। তিনি দেখিয়েছেন 'আমরা' এবং 'ওরা' এই বিভাগের মধ্য দিয়েই জাতি ব্যবস্থার প্রাথমিক স্বার্থগত সংঘাতের উৎপত্তি হয়েছে। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রথম শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক 'আমার পুত্র' বা 'আমার' এবং 'পান্ডু পুত্র' বা 'ওরা' এর পৃথকীকরণের মাধ্যমে পরিচিতির সংঘাত তুলে ধরেছেন।[২]

সামাজিক পরিচিতি তত্ত্বের পরবর্তী আলোচকদের মধ্যে ব্রিটিশ সমাজতত্ত্ববিদ রিচার্ড জিনকিন্সের Social Identity (2008) বইটিতে পূর্ববর্তী সামাজিক ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তত্ত্বটির অসম্পূর্ণতাকে দূর করার প্রয়াস করেছেন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তত্ত্বটির যে অসম্পূর্ণতা উঠে এসেছিল তা পূরণ করার জন্য তিনি দেখিয়েছেন যে, সামাজিক পরিচিতি একটি প্রবাহমান বা নির্মীয়মান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে।[৩]

তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, পরিচিতি নির্মাণ প্রক্রিয়ায় ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। সমাজ এবং সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দের অর্থগত ব্যবধান তৈরি হয়ে থাকে। এছাড়া শব্দার্থের ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা

যায় পাশ্চাত্য দার্শনিকদের দৃষ্টিকোন ঈশ্বর এবং তৎসম্পর্কিত আধ্যাত্বিক দর্শন ব্যাখ্যার ভিত্তিভূমি হল একেশ্বরবাদ (Monotheism)। অপরদিকে ভারত ভূমিতে ঈশ্বর এবং তৎসম্পর্কিত ধর্মীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যায় একেশ্বরবাদ এবং বহু-ঈশ্বরবাদ (Polytheism) উভয় ধারণার অদ্ভুত সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। সে ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক দর্শন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দের অর্থগত ব্যাখ্যা ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। সময় ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরিসরে পরিচিতি তত্ত্বের ব্যবহার পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পরিসরে উদ্ভূত জাতি এবং বর্ণ পরিচিতি ইউরোপীয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে দেখা জাতি বা বর্ণ পরিচিতির ধারণার মধ্যে অর্থগত পার্থক্য হওয়া অসম্ভব নয়।

পরিচিতি নির্মাণের আলোচনার ক্ষেত্রে আরভিং গফমান (Erving Goffman (1922 - 1982) এর তত্ত্ব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিজেদের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং তার পাশাপাশি অপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কি ধারনা পোষণ করে সেই বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে উভমুখী প্রক্রিয়ার দিকটি তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ একদিকে একজন ব্যক্তি বা কোন জনগোষ্ঠীর পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী নিজেদের পরিচিতি সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে এবং অপরদিকে পারিপার্শ্বিক মানুষ বা অন্য জনগোষ্ঠী তাদের উপর যে পরিস্থিতি আরোপ করে। এই উভয় মুখী প্রক্রিয়া পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এরকম উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় বাংলার নমঃশূদ্র এবং পৌন্ড্র জাতির পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে। একদিকে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর উপর 'চন্ডালত্ব' এবং পৌন্ড্র জনগোষ্ঠীর উপর 'পোদ' পরিচিতি আরোপ করার প্রয়াস দেখা যায় এবং অপরদিকে উক্ত জনগোষ্ঠীদ্বয় কর্তৃক এই আরোপিত পরিচিতি খন্ডন করার জন্য

আন্দোলনের ইতিহাস পাওয়া যায়। এই উদাহরণ দুইটি আলোচ্য তত্ত্বটিকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

এছাড়া সমাজ নৃতত্ত্ববিদ থমাস ফ্রেডারিক ওয়েবি বার্থ (Thomas Fredrik Weybye Barth (1928-2016) তাঁর 'The Social Organisation of Culture Difference' প্রতিবেদনে জাতিগত পরিচিতি (Ethnic Identification) এবং সংস্কৃতিগত পার্থক্যে (Cultural' Difference) এর বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[৪] তাঁর আলোচনায় জাতি, বর্ণ, ধর্মীয়, নৃতত্ত্ব, ভাষা ও সংস্কৃতিগত প্রভৃতি পরিচিতির প্রেক্ষিত ইতিহাসের পাতায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে নাৎসি জার্মানির জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বর উদাহরণ তুলে ধরেছেন। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটেও জাতিগত মাপকাঠির উপর ভিত্তি করে পরিচিতি নির্মাণের উদাহরণ পাওয়া যায়।

এই বিষয়টি উপজীব্য করে সামাজিক চেতনা এবং পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিমণ্ডলের ওপর ভিত্তি করে জাতি ও বর্ণ পরিচিতি, ভাষা ও সংস্কৃতিগত পরিচিতি বা ধর্মীয় ভিত্তিতে তৈরি হওয়া সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু পরিচিতির সঙ্গে তাদের সামাজিক অবস্থানের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতি বা বর্ণগত পার্থক্য, সংস্কৃতি বা ভাষা গোষ্ঠীগত বিভেদ বা ধর্মীয় সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু প্রভৃতি পরিচিতি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ক্রমশ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে অবস্থানকারী বিভিন্ন জাতির পরিচিতি পরিবর্তিত হতে থাকে। সমাজের এই পরিবর্তন অনুধাবন করার ক্ষেত্রে জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ ম্যাক্স ওয়েবার (Maximilian Karl Emil Weber, 1864-1920) এর তত্ত্ব সমধিক প্রশংসিত হয়। তিনি সমাজ (Society) এবং সামাজিক পরিবর্তন (Social Change) এর ধারা অনুধাবন করার জন্য পরিকাঠামোগত (Structural) এবং কর্মপদ্ধতিগত পরিবর্তনের ঘটনা পরম্পরাকে

বিশ্লেষণ করার ওপর জোর দিয়েছেন। যা ভারতীয় বর্ণ বা জাতি চর্চায় অতি প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব হিসেবে উঠে এসেছে। অপরদিকে কাল মার্কস (Karl Heinrich Marx, 1818-1883) এর তত্ত্বে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শ্রেণি সংঘাত এবং সামাজিক বিবর্তনের ব্যাখ্যা উঠে আসতে দেখা যায়।

ভারতে ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারের পাশাপাশি পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের বিভিন্ন তত্ত্ব সমূহের আলোকে ভারতের সমাজ এবং সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভাবধারার থেকে উৎপন্ন তত্ত্ব গুলি ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ভিন্নতার কারণে যথোপযুক্ত প্রয়োগ সম্ভব হয়না। তথাপি ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনায় ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব সমূহের বহুল প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়েছে। এর কারণ হিসেবে ভারতে প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করা যায়। এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভারতের সামাজ ও সাংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধারনা প্রয়োগের প্রতি ব্যাপক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে মুলত: শাসনতন্ত্রকে সুসংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা ও ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অনুধাবন করার প্রয়াসে উইলীয়াম জোন্স (William Jones) এর তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক ভাবে এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রতিষ্ঠা করা হয়ে ছিল। এরপর থেকে ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত গবেষকদের ব্যক্তিগত উৎসুকতা বা প্রশাসনিক নির্দেশে পরিচালিত অনুসন্ধান ও গবেষণা মূলক প্রতিবেদনে, তাদের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য উঠে আসতে শুরু করে। এই প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ভারতের ইতিহাস চর্চায় পাশ্চাত্য বা কেমব্রিজ ঘরানার (Cambridge School of Historiography)[৫] উদ্ভব হয়ে ছিল।

অর্থাৎ শাসক হিসেবে ভারতীয় ইতিহাসকে দেখার এবং বর্ণনা করার প্রবণতা তৈরি হয়ে ছিল।

পরবর্তী সময়ে ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে প্রাচ্যবাদী ঘরানা বা oriental history, মার্কসবাদী, Annales School এবং নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা (Subaltern Studies) প্রভৃতি ধারার উৎপত্তি হয়। ১৯৮০ এর দশকের সাবলটার্ন স্টাডিজ বা নিম্নবর্গের ইতিহাস তত্ত্বটি উদ্ভাবনের পর বিশ্ব তথা ভারতের আধুনিক ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে, এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়েছে।

এই ধারায় ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে সমাজের প্রান্তিক এবং অবহেলিত অংশের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই ঘরানায় ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, লিঙ্গ, বর্ণ, জাতি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে সমাজের প্রান্তিক অংশের আলোচনায় জোর দেওয়া হয়েছে। যা একদিকে যেমন বিশ্বের বিভিন্ন অংশর অলিখিত ইতিহাস উন্মোচিত করে, একই রকম ভাবে ভারতের প্রান্তিক এবং অবহেলিত অংশের সামাজিক অবস্থানের ইতিহাসও বিশ্বের কাছে উন্মোচিত করে। এর ফলে সমাজের অন্যান্য অবহেলিত অংশের পাশাপাশি জাতি ও বর্ণের ভিত্তিতে সমাজের পশ্চাৎপদ অংশের আলোচনায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এই সকল নতুন ঐতিহাসিক তত্ত্বের অবতারণা সত্ত্বেও ভারতের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণার প্রভাব অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি।

ভারতের জাতি বা বর্ণ চর্চায়ও পাশ্চাত্য প্রভাব অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে বাংলা অভিধানে ব্যবহৃত জাতি ও বর্ণ শব্দটি বোঝাতে ইংরেজিতে 'Caste' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'Caste' শব্দটি পর্তুগিজ 'Casta' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ 'বিশুদ্ধ জাত' বা 'Pure Breed'।[৬] প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ সমূহে প্রথম পর্যায়ে 'জাতি' শব্দটির পরিবর্তে 'বর্ণ' শব্দটির ব্যবহার হতে দেখা যায়।[৭] কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কর্মভিত্তিক গোষ্ঠীর

উদ্ভব হওয়া শুরু হয়ে ছিল। বিভিন্ন বর্ণের অন্তর্গত এই গোষ্ঠী সকলকে নির্দেশ করার ক্ষেত্রে 'জাতি' শব্দটির প্রয়োগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

শ্রীমৎভাগবত গীতার প্রথম অধ্যায়ের ৪০-৪৩ নম্বর শ্লোক বর্ণসঙ্করের মাধ্যমে নতুন বর্ণ বা জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[৮] আবার বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে রচিত ধর্ম সূত্র সমূহ, বিশেষ করে গৌতম, বশিষ্ঠ ও বৌধায়ন ধর্মসূত্রে চার বর্ণের অন্তর্বিবাহ ধারণাকে অবলম্বন করে বর্ণসঙ্কর তত্ত্ব গড়ে ওঠে।[৯] অর্থাৎ 'জাতি' ও 'বর্ণ' শব্দের প্রকৃত ইংরেজি অর্থ নির্দেশ না করলেও সকল ক্ষেত্রেই 'Caste' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় তুর্কি বিজয়ের পর, রাঢ় অঞ্চলে বৃহদ্ধর্ম পুরাণ রচিত হয়। পুরানটিতে পদ্মা-যমুনা-গঙ্গার প্লাবন ভূমিতে মাছ, মাংস ভক্ষণকারি ব্রাহ্মণ ও ৩৬টি ব্রাহ্মণেতর সংকর বর্ণের বা জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১০] অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর এর ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে 'জাতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার সকল জাতিকে একত্রে 'বর্ণ' বা 'জাতি' বলা হয়েছে। অর্থাৎ একবচন এবং বহুবচন উভয় ক্ষেত্রেই 'জাতি' শব্দটির প্রয়োগ হতে দেখা যায়।

ভারতের সংবিধানে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী সমূহকে তপসিলের তালিকায় (Lists of Schedule) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদেরকে 'Scheduled Caste' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যার বাংলা তর্জমা (Translate) করা হয়েছে তালিকাভুক্ত জাতি বা তপশিলি জাতি। তফসিলের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করার ক্ষেত্রে লেখা হয়েছে 'Sub Caste' বা অন্তর্বর্তী জনগোষ্ঠী বা জাতি।

ভারতীয় সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা, সামাজিক সম্মান এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থেকে দূরে রাখার ফলে কিছু নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সমাজের মূল স্রোতে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

পিছিয়ে পড়েছে। এই সকল অবদমিত জনগোষ্ঠীকে তফসিলের তালিকাভুক্ত করার মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধান বিশেষ সহযোগিতা (Affirmative Action's) বা সংরক্ষণের অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে। যাতে করে এই সহযোগিতা মূলক প্রক্রিয়া (Affirmative Action's) এর মধ্য দিয়ে, এই সকল জনগোষ্ঠী তাদের প্রতি মানসিক এবং সামাজিক অসহযোগিতার ফলে তৈরি হওয়া পশ্চাৎপদতাকে প্রতিহত করে সামাজিক সম্মান অর্জন করতে পারেন। শুধু ভারত নয়, আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে, এই প্রকার সরকারি সহযোগিতার উদাহরণ পাওয়া যায়। ভারতের ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি (SC) এবং উপজাতি (ST) ছাড়াও অন্যান্য অনগ্রসর জাতি (OBC), মহিলা, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী (PD) এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমান ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় উদ্ভূত পশ্চাৎপদতা বা বৈষম্যের বীজ সমাজের মননশীলতার গভীরে উপবিষ্ট হয়ে আছে। বিশেষত লিঙ্গ এবং বর্ণ বা জাতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া মানসিক এবং সামাজিক বৈষম্যগত পরিচিতি আরোপের ক্ষেত্রে ধর্মসূত্র ও স্মৃতি গ্রন্থের তত্ত্ব এবং তথ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভারতীয় সভ্যতা আলোচনার ক্ষেত্রে বিষয়টির একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে।

১.২. বর্ণ ও জাতি পরিচিতি নির্মাণের ইতিহাস

ভারতীয় সমাজে আধ্যাত্মবাদের প্রভাব অতি প্রাচীন। ফলস্বরূপ সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিক মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করার ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের প্রভাব অনস্বীকার্য। ভারতীয় সমাজের অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতন বর্ণ এবং জাতি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ধর্মগ্রন্থ তথা ধর্ম তত্ত্বের ব্যাখ্যা কর্তাদের বিধানকে প্রশ্নাতীত সত্য বলে ধরে নেওয়া হত। যার ফলস্বরূপ গড়ে ওঠা সমাজ কাঠামো ভারতের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

বর্তমান ভারতীয় বর্ণ ব্যবস্থা হল এই ধর্মীয় গোঁড়ামির স্থবির (Stagnant) রূপের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ভারতীয় বর্ণাশ্রম প্রথা অভ্যাস যুক্তি যুক্ত করে তোলার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন ধর্মসূত্র ও স্মৃতি গ্রন্থের রচয়িতারা।[১১] ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা ধর্মীয় ভীতির উপর ভিত্তি করে মানব সমাজের মননে উপবিষ্ট হয়ে রয়েছে। এই কারণে বর্ণ ও জাতি পরিচিতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের তত্ত্ব এবং তথ্য ব্যবহারের সময় ধর্মীয় আবেগ বর্জিত যুক্তিসংগত নিরীক্ষণ অতি আবশ্যক।

বর্ণ সম্পর্কিত তত্ত্বের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় পরবর্তী বৈদিক যুগে ঋকবেদে সংযোজিত দশম স্কন্ধের পুরুষসূক্তে। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, আদিপুরুষ নিজের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে চতুর্বর্ণের সৃজন করেন। মুখমন্ডল থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও পদযুগল থেকে শূদ্রের উৎপত্তি।[১২] শ্লোকটি থেকে চারটি ভাগে বিভাজিত বর্ণের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হলেও এই সকল বর্ণের সঙ্গে নির্দিষ্ট কোন মানুষ বা গোষ্ঠীর পরিচিতি নির্ণয় করা হয়নি।

আবার সর্ববেদের সারাংশ হিসেবে পরিচিত শ্রীমদ্ভগবদগীতার গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ নামক চতুর্দশ অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজ ও তমো এই তিনটি গুণের প্রাধান্য বিবেচনা করে বর্ণ নির্ণয় ও পেশা ধারণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বিশিষ্ট মানুষকে বর্ণ বিভাজিত সমাজের উর্দ্ধতম স্থান প্রদান করার কথা বলা হয়। এদের কাজ ছিল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রসার, শিক্ষা ও পরামর্শ প্রদান। রজোগুণের প্রধান বৈশিষ্ট্য মানুষকে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করার কর্তব্য প্রদান করা হয়। রজ ও তমো গুণের সামঞ্জস্যযুক্ত বৈশ্যদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং তমোগুণ প্রাধান্য সম্পন্ন মানুষকে উর্দ্ধতন তিন বর্ণের সেবায় নিয়োজিত থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়।[১৩] অর্থাৎ গুণের উপর ভিত্তি করে কর্মনির্বাহের কর্তব্য আরোপিত হয়।

আবার জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রাচীন বৈদিক সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে, জাতক ও জাতিকার বর্ণ বিচার করার প্রতিবিধান অনুসরন করার ক্ষেত্রে পদবী ও জাতি পরিচয়কে গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে, গ্রহ নক্ষত্রের কৌণিকমাত্রার (Degree) অবস্থানের পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। যা থেকে প্রমানিত হয় যে, সামাজিক গোঁড়ামির প্রচলন হওয়ার আগে, বংশপরিচয় বা পিতৃ পদবির পরিবর্তে ত্রি-গুনের প্রভাবের উপর ভিত্তি করেই জীবিকা প্রস্তাব (Recomend) করার পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। কিন্তু পরবর্তী বৈদিকযুগে এই নীতির অতিসরলীকরণ করে বংশানুক্রমিক কর্মভিত্তিক বর্ণব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয়। যেখানে পিতার বর্ণের উপর ভিত্তি করে পুত্রের বর্ণ, বংশগত সূত্রে ভাবে সীমাবদ্ধ হতে থাকে।[১৪]

পরবর্তীকালে গুণের পরিবর্তে কর্ম বা জীবিকার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জাতি পরিচিতি নির্মাণ হতে শুরু করে। এই পরিচিতির নির্মাণকে বৈধ করা এবং সমাজের মননশীলতা স্থাপন করার ক্ষেত্রে মহর্ষি বাল্মীকি রচিত ‘রামায়ণ’, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বীরোচিত ‘মহাভারত’ মহাকাব্য দুইটি এবং স্মৃতি, ধর্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়।

বাল্মিকী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের ত্রিসপ্ততিতমসর্গ থেকে ষষ্ঠপ্ততিতমসর্গের শ্লোকে শম্বূক নামক একজন শূদ্রের ঘটনা বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে, এরকম প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। এই ঘটনা দেখানো হয়েছে যে, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর মৃত পুত্রকে নিয়ে রামের রাজদরবারে উপস্থিত হন। যুবকের এই অকাল মৃত্যুর জন্য রাজ্যে অনাচার এবং রাজার চরিত্র হীনতাকে দায়ী করে বিলাপ করেন এবং এই ঘটনার বিচার চেয়ে রামের দরবারে আর্জি পেশ করেন। এমন পরিস্থিতিতে রাম তাঁর মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ এবং সভাসদকে ডেকে এই মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে বলেন। তাদের মধ্যে নারদমুনি বলেন যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতিরেকে

অন্য কোন বর্ণ তপস্যারত হলে রাজ্যে অনাচার ও অধর্ম বৃদ্ধি পায়। আপনার রাজ্যে শূদ্র তপস্যারত হওয়ার কারণে এরূপ অকাল মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এর যথাযথ প্রতিকার করুন।

পঞ্চসপ্ততিতম স্বর্গের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, রাজ্যের অনাচার ও পাপের উৎস অনুসন্ধানে রাম তাঁর পুষ্পক রথে চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করতে শুরু করেন। অবশেষে তিনি রাজ্যের দক্ষিণ দিকে শৈবাল পর্বতের উত্তর পাশে সরোবরের কাছে সুপ্রশস্ত ভূমিতে অবস্থিত একটি গাছে উল্টো ভাবে ঝুলে থেকে একজনকে তপস্যারত মানুষকে দেখতে পান। রাম তাঁর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে তপস্বীর পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। ষষ্ঠসপ্ততিতম স্বর্গে তপস্বী বলেন, তিনি শম্বুক। তাঁর শূদ্র যোনিতে জন্ম। তিনি সশরীরে স্বর্গ লাভের মনস্কামনায় তপস্যারত আছেন। এই কথা শোনা মাত্র রাম তাঁর দিব্যদর্শন খড়্গ দিয়ে, ওই তপস্বীর শিরোচ্ছেদ করেন। এই ঘটনায় উৎফুল্ল হয়ে দেবতাগণ রামের মাথায় ফুল বর্ষণ করেন এবং দেবলোকে শূদ্রের প্রবেশ প্রতিহত করে, তাদের রক্ষা করার জন্য সাধুবাদ জানান। দেবতার আশীর্বাদে মৃত বাহ্মণ পূত্রও পুনর্জীবিত হয়ে ওঠেন।[১৫]

এখানে দেখা যাচ্ছে তপস্যা প্রভৃতি ধর্মাচরণের থেকে প্রতিহত করার জন্য শূদ্রকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করার মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন এবং এই ভীতি প্রদর্শনকে বৈধ করার জন্য রাম এবং ব্রহ্মর্ষি নারদের মতন চরিত্রকে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান রামায়নের লেখক ঋষি বাল্মীকির উত্তরপুরুষ হিসেবে পরিচিত বিহারের বাল্মিকী জনগোষ্ঠী ভারতীয় সংবিধানের তপশিল অন্তর্ভুক্ত জাতি। যদিও রামায়ণের এই ঘটনার বিবরণ নিয়ে বিভিন্ন মতপার্থক্য দেখা যায়। একটি মতবাদ অনুযায়ী বলা হয় যে, বাল্মিকীর লেখা আসল রামায়ণে ‘উত্তরাকাণ্ড’ নামক কোন অধ্যায় ছিলনা। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে এই অধ্যায়টি সংযুক্ত করা হয়েছে। এর সংযুক্তি কাল ছিল আনুমানিক ১৫০ বৎসর পূর্বের। এই মতবাদ অনুযায়ী যদি পরবর্তী সময়ে অধ্যায়টির সংযুক্তি হয়ে থাকে তবে আমরা বলতে পারি যে, ভারতীয়

সমাজে জাতি ও বর্ণ বৈষম্যকে বৈধ এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি আরোপ করার জন্য ধর্মীয় সাহিত্য এবং গ্রন্থ গুলির পরিবর্তন করা শুরু হয়ে ছিল।

অনুরূপভাবে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত মহাভারতের আদিকাণ্ডের ৪১ নম্বর থেকে ৬৮ নম্বর শ্লোকে নিষাদ রাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য এবং দ্রোণাচার্যের ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বিবরণ অনুযায়ী, একলব্য দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্র শিক্ষার জন্য আসেন। কিন্তু নিম্ন জাতির হওয়ার কারণে দ্রোণাচার্য তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলেন। অতঃপর দ্রোণাচার্যের মাটির মূর্তি নির্মাণ করে তাকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করে একলব্য অস্ত্রবিদ্যা শুরু করেন।

পরবর্তীতে কুরু এবং পান্ডবগন শিকারের জন্য বনে গেলে, তাদের একজন কর্মচারী সঙ্গে করে অস্ত্রশস্ত্র এবং কুকুর নিয়ে যান। ওই কুকুর বনে ঘুরতে ঘুরতে একলব্যের কাছে উপস্থিত হয়ে, তাঁর মৃগচর্ম পরিহিত কৃষ্ণবর্ণ, মলিন দেহ ও মাথায় জটা দেখে চিৎকার করতে থাকে। তখন একলব্য একসঙ্গে সাতটি বাণ কুকুরটির মুখে নিক্ষেপ করে তাঁর মুখ বন্ধ করে দেন। এ অবস্থায় কুকুরটি পান্ডব ও কৌরব রাজকুমারদের সামনে উপস্থিত হলে সকল রাজকুমার বিস্ময় ও লজ্জায় অবনত হন।

এই পরিস্থিতিতে গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে অর্জুন মনে করিয়ে দেন যে, তিনি অর্জুনকে কথা দিয়েছিলেন যে, তাঁর কোনও শিষ্য অর্জুনের থেকে শ্রেষ্ঠ হবে না, সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হতে চলেছে। এই কথা শুনে গুরু দ্রোণাচার্য শিষ্য অর্জুনকে নিয়ে একলব্যর কাছে উপস্থিত হন। দ্রোণাচার্যকে গুরু বলে প্রণাম করলে, দ্রোণাচার্য একলব্যর কাছ থেকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল চাইলেন। একলব্য বৃদ্ধাঙ্গুল কেটে গুরুর চরণে অর্পণ করলেন। এরপর একলব্যের তির চালানোর গতি মন্থর হয়ে পড়েছে, এই দেখে অর্জুন আশ্বস্ত হলেন।[১৬]

এই একই অধ্যায়ের ৩০ থেকে ৩২ নম্বর শ্লোকে কর্ণ এবং অর্জুনের অস্ত্রবিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। গুরু দ্রোণাচার্যের অস্ত্রশিক্ষা পূর্ণ হলে পাণ্ডব এবং কৌরবদের অস্ত্র পরীক্ষা শুরু হয়। এই ঘটনা ক্রমে অর্জুন তাঁর অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন করা শুরু করলে কর্ণ এসে উপস্থিত হন এবং অর্জুনকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন। তখন কৃপাচার্য অর্জুনের বংশ পরিচয় দিয়ে কর্ণের বংশ পরিচয় জানতে চান। কর্ণের পরিচয় জেনে কৃপাচার্য বলেন যে, রাজপুত্ররা কোন হীন বংশ ও হীনাচার লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। এ পরিস্থিতিতে দূর্যোধন কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন। অর্জুন এর সঙ্গে কর্ণের সম্মুখ সমরের পথ প্রস্তুত করেন।[১৭]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে রামায়ণ এবং মহাভারতের মত ধর্মীয় আবেগ বিজড়িত গ্রন্থ গুলিকে বর্ণ এবং জাতি ব্যবস্থার বৈধতা তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। শূদ্রবর্ণের শিক্ষা অর্জন এবং আধ্যাত্বিক জিজ্ঞাসা নিরসনের পথ বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনে কঠোরতম শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব, ঋষি পরাশরের ঔরসে নৌকা পারাপারকারি মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে মৎস্যগন্ধা অর্থাৎ রানী সত্যবতীর নির্দেশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডু এবং বিদুরের জন্ম হয়ে ছিল। অর্থাৎ বর্ণ সঙ্করের মধ্য দিয়েই কৌরব এবং পান্ডব বংশের উৎপত্তি হয়ে ছিল। রামায়ণ এবং মহাভারতে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে শূদ্র বর্ণের জন্য শিক্ষা এবং জ্ঞান অর্জনের প্রয়াস করলে উদাহরণের মধ্যে দিয়ে শাস্তি বিধানের কথা আলোচনা করা হলেও সূত্রশাস্ত্র এবং স্মৃতিশাস্ত্রে সরাসরি কঠোর শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে।

জাতি ও বর্ণ ব্যবস্থার গোঁড়ামি তৈরি করার ক্ষেত্রে যেসকল সূত্রশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে ছিল। তারমধ্যে মনুসংহিতা অন্যতম। মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৭৯ থেকে ৮১ নম্বর শ্লোকে শূদ্রকে সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। বলা হয় যে, ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণের জন্যও তাদের সাথে একই বৃক্ষের ছায়ায় বসবে না। তাদের কোন ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ এবং পরামর্শ প্রদান করবে না। শুদ্রদেরকে সবসময় উচ্ছিষ্ট ভোজন প্রদান করবে।[১৮] অষ্টম অধ্যায়ের ২৭০ থেকে ২৭১ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে কোন শূদ্র উর্দ্ধতন তিন বর্ণকে কঠিন বাক্য বললে, তাঁর জিভ কেটে নেওয়া হবে এবং কোন ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ আচরণ বা নাম ধরে আক্রোশ দেখালে, তাঁর মুখে জ্বলন্ত লৌহ দন্ড নিক্ষেপ করা হবে।[১৯]

১৫টি গ্রন্থের সমাহারে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমসাময়িক বলে মনে করা হয়। প্রাচীন হিন্দু রাজাদের জন্য তৈরি করা প্রশাসনিক আইন সমন্বিত এই গ্রন্থাবলীতে শূদ্রের প্রতি বিধান দেওয়া হয়েছে যে, কোন শূদ্র যদি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয় তাঁর দুই চোখ অন্ধ করে দেওয়া হবে।[৪.১০.১৩][২০] ব্রাহ্মণের রন্ধনশালা অপবিত্র করলে তাঁর জিভ ছিড়ে নেয়া হবে।[৪.১২.২১][২১] বা কোন শূদ্র ব্রাহ্মণ নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে তাকে জীবিত দহন করা হবে।[৪.১৩.৩২][২২] যদিও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রচনা কাল এবং রচনা শৈলীতে একাধিক ধরণ পরিলক্ষিত হয়। যা থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, একাধিক ব্যক্তির দ্বারা অর্থশাস্ত্র রচিত হয়ে ছিল এবং দীর্ঘ সময় ধরে গ্রন্থটি রচিত হয়ে ছিল। এছাড়া সমসাময়িক বৈদেশিক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিসের বিবরণে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রিসভায় কৌটিল্য নামক কোন মন্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায় না।[২৩] তবুও ভারতের ইতিহাস এবং বর্ণবৈষম্যের বিধানের ক্ষেত্রে বারংবার গ্রন্থটির উল্লেখ হয়ে থাকে।

মৌর্য আমলে ভারত পরিভ্রমনে আসা গ্রিক লেখক মেগাস্থিনিসের ‘ইন্ডিকা’ গ্রন্থে ভারতের সমাজ ব্যবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের লেখা মূল গ্রন্থটি পাওয়া না

গেলেও এরিয়ান, ডিওডোরাস, স্ট্রাবো, প্লিনি প্রভৃতি লেখকের বিবরণে মেগাস্থিনিসের ভাষ্য উঠে এসেছে। তিনি ভাষা এবং সংস্কৃতির পার্থক্যের কারণে ভারতীয় সমাজের উপর পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির অনুরণন করেছেন। তিনি অনুধাবন করেছেন যে, ভারতীয় জনসমষ্টি কর্মের ভিত্তিতে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

এই শ্রেণি গুলির মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিনি কৃষকদের কথা উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় শ্রেণীতে পশুপালক ও শিকারি এবং চতুর্থ শ্রেণীতে কারিগরদের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন শ্রেণী বৈষম্য এত তীব্র ছিল যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের সম্পর্ক স্থাপন হত না এবং একটি শ্রেণীর জীবিকা অন্য কোন শ্রেণী গ্রহণ করতে পারতেন না।[২৪] এই বিবরণের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, এই কালপর্বে কর্মভিত্তিক জাতি ব্যবস্থা এবং বিবাহ প্রভৃতি সম্পর্ক স্থাপনে কঠোরতা মেনে চলা হত। স্ট্রাবোর বিবরণে মেগাস্থিনিসের বিবরণের দার্শনিক শ্রেণীর মধ্যে তৃতীয় প্রকার দার্শনিক হিসেবে 'প্রামনাই' এবং 'জিমনেটাই' এর কথা উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তাঁরা ছিলেন 'বৌদ্ধ' এবং 'জৈন' ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিক্ষু।[২৫] অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পাশাপাশি বুদ্ধ এবং জৈন ধর্মের মতন প্রতিবাদী ধর্ম সমূহের অবস্থান ছিল।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোরতা প্রভৃতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণের নিম্নবর্ণের অনেক মানুষই বুদ্ধ এবং জৈন ধর্ম গ্রহণ করে ছিল। এই প্রক্রিয়া বজায় ছিল গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের পর্ব পর্যন্ত।[২৬]

১.৩. বঙ্গদেশে বর্ণ ও জাতি ভিত্তিক পরিচিতির প্রসার

গুপ্ত যুগ থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান এবং বিভিন্ন ধর্ম সূত্র এবং স্মৃতিশাস্ত্র রচনার মধ্য দিয়ে আর্যাবর্তের শুদ্রদের প্রতি কঠোর নিয়মের বিধান দিতে দেখা যায়। তবে বাংলা অর্থাৎ বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিস্তৃত জলা-জঙ্গলের আর্দ্র পরিবেশে আর্য

সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ দেরিতে শুরু হওয়ার কারণে, এখানে চতুর্বর্ণ বিভাজিত সমাজ ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসার গোবলয়ের তুলনায় বিলম্বিত হয়ে ছিল। এর প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, প্রাচীন বাংলায় কোন স্মৃতিশাস্ত্রই রচিত হয়নি।[২৭] তা শুরু হয় অনেক পরের দিকে। ততদিনে বাংলায় তুর্কি প্রভৃতি বহিঃআক্রমণের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়ে যায়।

বাংলার বর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে, যে সকল গ্রন্থ, তাম্রপত্র, শিলালেখ প্রভৃতি পাওয়া যায়, তার মধ্যে ত্রয়োদশ শতকে লেখা বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, ও সমসাময়িক ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বাংলায় সংকরায়নের ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের বর্ণনা সহ তালিকা প্রস্তুত করা শুরু হয়। এছাড়া বল্লাল চরিত, কুলজি গ্রন্থ মালা, বৌদ্ধ গ্রন্থ চর্চা বিনিশ্চয় বা চর্যাগীতি কবি গ্রন্থে বাংলার বর্ণ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়।

নদিয়া বঙ্গসমাজের কূলজীগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, গৌড়রাজ শশাঙ্কের শাসনকালে অর্থাৎ আনুমানিক সপ্তশতাব্দীতে বর্তমান উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত সরজু নদীর তীর থেকে বারো জন উচ্চকোটির শুদ্ধ ব্রাহ্মণ নিয়ে আসা হয়ে ছিল। এই ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীই গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত হয়।[২৮] এই ভাবে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সম্প্রসারণের যে ঘটনা লেখা হয়েছে, তা ইতিহাস স্বীকৃত না হলেও, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিস্তারের কৈফিয়ত হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়াস হিসেবে দেখা যেতে পারে। এছাড়া বল্লাল চরিত, কুলজি গ্রন্থ মালা, বৌদ্ধ গ্রন্থ চর্চাবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতি গ্রন্থে বাংলার বর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে যেসকল তপশিলি জাতি অবস্থান করে আছেন। বর্ণ ব্যবস্থার সর্বনিম্ন সোপানে অবস্থানকারী এই জাতি সকলের মধ্যে রাজবংশী, নমঃশূদ্র, পৌন্ড্রক্ষত্রিয়, বাগদি, বাউরী, মালো, চর্মকার প্রভৃতি ষাটটি জাতি বিদ্যমান। কিন্তু বাংলায় রচিত বৃহৎধর্ম পুরান, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, জাতি মালা প্রভৃতি গ্রন্থে ৩৬ টি সংকর জাতির কথা উল্লেখ আছে। আবার

এই ৩৬ জাতির অনেক জনগোষ্ঠীই বর্তমান ভারতীয় সংবিধান স্বীকৃত অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতি সমূহের তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় তুর্কি বিজয়ের পর, রাঢ় অঞ্চলে বৃহদ্ধর্মপুরাণ রচিত হয়। গ্রন্থটিতে ৩৬ টি ব্রাহ্মণেতর সংকর বর্ণের জাতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, রাজা বেন বর্ণাশ্রম প্রথা নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন বর্ণের নর-নারীকে বলপূর্বক বৈবাহিক-সম্পর্কে বেঁধে দেন। এর ফলে বাংলায় ৩৬টি মিশ্র বা সংকর বর্ণের উৎপত্তি হয়। তাদেরকে উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ৩৬ টি বর্ণের বিবরণ থাকলেও তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে ৪১ টি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৯] উত্তম সংকরের অন্তর্গত কুড়িটি বর্ণ হল- করণ বা লেখাপড়া জানা রাজকর্মচারী, অম্বষ্ঠ বা ভেষজ বৈদ্য, উগ্র বা অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী, মাগধ বা সংবাদবাহক, গান্ধিক বা গন্ধবণিক, সাঙ্খিক বা শাঁখারি, কংস কার বা কাঁসার জিনিস নির্মাতা, কুম্ভকার বা মৃৎশিল্পী, তন্তুবায় বা তাঁতি, কর্মকার বা লোহার জিনিস নির্মাতা, গোপ বা লেখক, দাস বা কৃষি এবং মৎস্য জীবিকার সঙ্গে যুক্ত মানুষ, রাজপুত্র, নাপিত বা ক্ষৌরকর্মী, মোদক বা মিষ্টি প্রস্তুতকারী, বারুজীবী বা পান উৎপাদনকারী, সূত বা কাঠমিস্ত্রি, মালাকার বা ফুল বিক্রেতা, তাম্বুলি বা পান বিক্রেতা, তৌলিক বা সুপারি ও রং বিক্রেতা প্রভৃতি নির্ভর মানুষ।

মধ্যম সংকরের অন্তর্গত বারোটি বর্ণের মধ্যে ছিল তক্ষক বা খননকারী, রজক বা ধোপা, স্বর্ণকার, আভির বা গরু পালনকারী, তৈলকারক, ধীবর, শৌণ্ডিক বা মদ বিক্রেতা, নট বা নৃত্য এবং গীত পরিবেশক অথবা বাজিকর, শাবাক, শেখর, জালিক বা জেলে। অধম সংকরের অন্তর্গত নয়টি বর্ণের মধ্যে ছিল মলেগ্রাহী বা কুস্তিগীর, কুড়ব বা সম্ভবত নৌকাচালক, চন্ডাল বা শবদহনকারী, বারুড় বা কাঠমিস্ত্রি, চর্মকার, ঘট্টজীবী বা খেয়া পারের

মাঝি, ডোলাবাহি, মল্ল বা মৎস্যজীবী এবং তক্ষ প্রভৃতি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া পুলিন্দ, পুক্কস, যবন, শবর, খস, সূক্ষ্ম, কম্বোজ ইত্যাদি ম্লেচ্ছ গোষ্ঠীর উল্লেখ করা হয়েছে।

অপরদিকে বৃহদ্ধর্মপুরাণের সমসাময়িক ধর্মগ্রন্থ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও ৩৬টি মিশ্রবর্ণ সমূহকে সৎশূদ্র এবং অসৎশূদ্র এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সৎশূদ্র বিভাগের মধ্যে গোপ, নাপিত, ভিল্ল, মোদক, কুবর, তাম্বুলী, স্বর্ণকার, বণিক, করণ, অম্বষ্ঠ, এবং বিশ্বকর্মার ঔরসে শূদ্রনারীর গর্ভজাত নয়টি শিল্পকার জাতি যেমন মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক বা তন্তুবায়, কুম্ভকার, কংসকার, স্বর্ণকার, চিত্রকর এইকটি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। অপরদিকে অসৎশূদ্র হিসেবে অট্টালিকার, কোটক, তীবর, তৈলকার, মল্ল, চর্মকার, শুন্ডি, পৌন্ড্রক, মৎস্যছেদক, রাজপুত্র বা রাউত, কৈবর্ত, রজক, কৈয়ালী, গঙ্গাপুত্র, লেট, যুগী, আগুরি বা উগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতির পাশাপাশি অন্তজ জনগোষ্ঠী হিসেবে ব্যাধ, ভর, কোল, কোঞ্চ, হাড়ি, চন্ডাল, কাপালি, ডোম, জোলা, বাঘতিতা বা বাগদি, বেদে ইত্যাদি জাতির কথা পাওয়া যায়।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে চল্লিশটি জাতির পাশাপাশি সাতটি ম্লেচ্ছ জনগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অপরদিকে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সংমিশ্রনের ফলে উৎপন্ন ছত্রিশটি জাতি এবং এগারটি অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সমসাময়িক পুরান দুইটিতে মিশ্রবর্ণ বা নতুন জাতিসমূহের সামাজিক সরণিতে অবস্থানের পার্থক্য দেখাযায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে উল্লেখিত মধ্যম এবং অধম সংকরের একুশটি জাতি ছাড়াও সাতটি ম্লেচ্ছ জনগোষ্ঠী। অপরদিকে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উল্লেখিত সতেরটি অসৎশূদ্র এবং এগারটি অন্ত্যজ জলাচল জনগোষ্ঠীর বর্তমান ভারতীয় সংবিধানের তপশিল অন্তর্ভুক্ত জাতি হিসেবে পরিচিত। এছাড়া বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তম সংকরের অন্তর্গত কুড়িটি বর্ণ বা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সৎশূদ্র বিভাগের

উনিশটি সংকর জাতির অধিকাংশ মানুষ অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতি (OBC) ভুক্ত সংরক্ষণের পরিসরে অবস্থান করে আছে।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে ছত্রিশটি জাতির উল্লেখ থাকলেও চল্লিশটি জাতির তালিকা বা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অন্ত্যজ হিসেবে লিখিত উল্লেখিত হাড়ি, চন্ডাল, কাপালি, ডোম, জোলা, বাগদি প্রভৃতি জনগোষ্ঠী সময়ের সঙ্গে শূদ্র বর্ণের জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এছাড়া ১১০০ সালে বল্লাল সেনের লেখা নৈহাটি লিপি বিশ্লেষণ করলে নতুন বর্ণের অঙ্গীকরণের তথ্যটির স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩০] যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নতুন নতুন জাতিকে চতুর্বর্ণ বিভাজিত বৈদিক সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্তি করন প্রক্রিয়া সচল ছিল।[৩১] একাদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে লেখা বিজ্ঞানেশ্বরের মিতক্ষরা, স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য মহাশয়ের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব, বল্লাল চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণ ব্যবস্থা প্রচলন করার স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দেখানো হয়েছে। এই কারণে নতুন জাতি সৃষ্টির নতুন নতুন ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বের প্রয়োজন হতে থাকে, যার ফলস্বরূপ বিভিন্ন গ্রন্থে নব সংযোজিত বর্ণের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

বঙ্গদেশের জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে স্মৃতি এবং ধর্মগ্রন্থের বিধায়করা যে বিভিন্ন সমীকরণ দিয়েছেন তা আধুনিক সমাজ সমাজতাত্ত্বিক তথা বিভিন্ন ঐতিহাসিক কর্তৃক প্রভূত সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসকের আগমনের পর বিভিন্ন অবদমিত জাতিগুলির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং পাশ্চাত্যভাব ধারার অভিঘাতে চেতনার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। এই চেতনার বিকাশ তাদের নিজেদের ইতিহাস বা আত্মপরিচিতি অন্বেষণের প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ করে ছিল। এই প্রয়াসের ফলস্বরূপ সামাজিকভাবে অবদমিত এবং নিষ্পেষিত জাতি গুলি ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র আরোপিত পরিচিতির বাইরেও নিজেদের আত্মপরিচিতি

অনুসন্ধানের প্রয়াস শুরু করে ছিল। যার ফলে উঠে আসতে থাকে বিভিন্ন জাতি পরিচিতি তত্ত্ব। এই সকল জাতির মধ্যে ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলার নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী ছিল অন্যতম।

১.৪. নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতি নির্মাণ

ঔপনিবেশিক পর্বে অবিভক্ত বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক চন্ডাল জনগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য জাতিটি নিজেদেরকে নমঃ বা নমো জাতি হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন।[৩২] এক্ষেত্রে চন্ডাল নামকরণটি আলোচ্য জনগোষ্ঠীর ওপর বিদ্বেষ পূর্বক আরোপিত হয়ে ছিল, এই মতবাদ উঠে আসতে দেখা যায়। জাতির নাম পরিবর্তনের জন্য সংঘটিত এক দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯১১ সালে এই বিশাল জনগোষ্ঠীটি 'চন্ডাল' এর পরিবর্তে 'নমঃশূদ্র জাতি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ঔপনিবেশিক পর্বে বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে চর্চা শুরু হলে, তার পাশাপাশি নমঃশূদ্র (চন্ডাল) জাতির পরিচয় সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব উঠে আসতে থাকে। সংগৃহীত তথ্যের পর্যালোচনা ও ইতিহাস ভিত্তিক ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে উঠে আসা তত্ত্ব সমূহকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতি ও সামাজিক অবস্থানের ইতিহাস তুলে ধরা সম্ভব। এই আলোচনায় ঐতিহাসিক বিবরণ ও তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে নমঃশূদ্র জাতির উৎস সম্পর্কিত পরিচয় ও সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য উপাদান তথা তত্ত্ব গুলি হল-

১.৪.২. প্রাচীন গ্রন্থে নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতি সম্পর্কিত ধারণা

প্রাচীন ভারতে ইতিহাস মনষ্কতার অভাবে জাতি ও বর্ণ সম্পর্কিত তথ্য পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে যে বিস্তর শূন্যতা রয়ে গেছে তা পূরণ করা সুদূর পরাহত। তবে বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত তত্ত্ব ও তথ্য যুক্তি-প্রমাণের মাপকাঠিতে যাচাই করে, ঐতিহাসিক উপাদান

হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়াস দেখা যায়। এইসকল শাস্ত্রগ্রন্থে বাংলায় মাছ মাংস ভক্ষণকারি ব্রাহ্মণদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অথচ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে দ্বিজ ব্রাহ্মণদের জন্য আমিষ আহার ছিল সম্পূর্ণরূপে বর্জিত। একইরকম ভাবে বর্তমানে বাংলার নমঃশূদ্র হিসেবে পরিচিত জনগোষ্ঠীটিকে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে চন্ডাল হিসেবে বর্ণনা করা হলেও বাংলা এবং গোবলয় বর্ণিত চন্ডাল জনগোষ্ঠীর পরিচিতিগত ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়।

মনুর বিধান অনুযায়ী বর্ণসঙ্করের ফলে উৎপন্ন জাতি সমূহের স্থান হয় উপরিউক্ত চতুরবর্ণেরও নিচে। সেখানে চন্ডাল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

"শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাং।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ান্তে বর্ণসঙ্করাঃ ।।" ১০/১২[৩৩]

অর্থাৎ বৈশ্যের গর্ভে শূদ্র থেকে আয়োগভ, ক্ষত্রিয়র গর্ভে শুদ্র থেকে ক্ষত্তা, আর ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে শূদ্র থেকে চণ্ডালের উৎপত্তি, এরা মানুষের মধ্যে অধমাধম। চণ্ডাল বর্ণের মানুষকে মনুস্মৃতিতে শূকর, কুকুর, বানর, ক্লীব ও রাজঃস্বলা রমনীর সাথে একই সরণিতে রাখা হয়েছে।[৩৪]

অপরদিকে বাংলায় রচিত বৃহদ্ধর্মপুরাণে শূদ্রদেরকে সংকর জাতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর এবং অধম সংকর।[৩৫] এরমধ্যে অধম সংকরকে জলা-অচল জাতি বা অচ্ছুত জনগোষ্ঠী হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই অধম সংকরের নয়টি জাতির মধ্যে চন্ডালের অবস্থান তৃতীয়। গ্রন্থটিতে এই তিনটি শ্রেণী ছাড়াও কয়েকটি ম্লেচ্ছ অর্থাৎ পঞ্চম বর্ণের বহির্ভূত জনগোষ্ঠীর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বৃহদ্ধর্মপুরানে ৩৬ টি বর্ণসংকরের বিবরণ থাকলেও পরবর্তীতে আরও পাঁচটি নতুন বর্ণের সংযোজন হওয়ার উদাহরন পাওয়া যায়।[৩৬]

অপরদিকে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে একইভাবে শূদ্রদের দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে সৎশূদ্র এবং অসৎশূদ্র। উল্লেখিত এই দুটি শ্রেণীর কোনোটিতেই চন্ডাল জনগোষ্ঠীর স্থান হয়নি। এই গ্রন্থে চন্ডালকে রাখা হয়েছে অন্ত্যজ শ্রেণি মানুষ হিসেবে। অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে এই জনগোষ্ঠী ছিল অচ্ছুত বা পঞ্চম বর্ণের বহির্ভূত জনগোষ্ঠীর মানুষ। বৃহদ্ধর্মপুরাণের তুলনায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বিভিন্ন কর্মভিত্তিক জাতির উপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে। এছাড়া বৌধায়ন সূত্র এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে নমঃশূদ্র জাতিকে চন্ডাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৭]

ধর্মসূত্র এবং স্মৃতিগ্রন্থে উল্লেখিত তৎকালীন বাংলায় বিভিন্ন জাতির অবস্থানগত পার্থক্যের কারণ হিসেবে কিছু যুক্তি উঠে আসে। যেমন পরবর্তী বৈদিক যুগ বিভিন্ন নতুন অঞ্চল আর্য সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হলে, ওই অঞ্চলে বসবাসকারী জাতি ও উপজাতি সমূহ নতুন নতুন বর্ণ হিসেবে সংযোজিত হতে শুরু করে। এই কারণে নতুন নতুন জাতির অঙ্গীকরণের প্রয়োজনে বিভিন্ন নতুন ধর্মীয় তত্ত্বের প্রয়োজন হতে থাকে। এইভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে নব সংযোজিত বর্ণের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন সরণিতে নবসংযুক্ত জাতিগুলির স্থান হয়েছে। ১১০০ সালের বল্লাল সেনের নৈহাটি লিপি বিশ্লেষণ করলে নতুন বর্ণের অঙ্গীকরণের তথ্যটির স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩৮]

আবার চন্ডাল সম্পর্কে মনু-সংহিতায় বিভিন্ন ধরনের কঠোর নিয়ম নীতি আরোপের কথা থাকলেও, বাংলায় এই নীতি পালনের ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখতে পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের বাংলার বিখ্যাত শাস্ত্রকার স্মার্ত রঘুনন্দনের বিধানে চন্ডালের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক এবং পংক্তি ভোজন এড়িয়ে চলার কথা বলেছেন।[৩৯] কিন্তু তাদের স্পর্শ সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলতে হবে, এমন কথা জোর দিয়ে বলেননি। মনুর বিধান অনুযায়ী, চন্ডালের অবস্থান হবে গ্রামের বাইরে। কিন্তু মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য যথা কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর রচিত

চন্ডীমঙ্গল ও ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্য গুলোতে, বাংলার চন্ডাল সাম্প্রদায় গ্রাম ও শহরের মধ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবাস করছেন, এরকম উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪০] অতএব মনুর দ্বারা উল্লেখিত ভারতের বিহার বা গুজরাট অঞ্চলের চন্ডাল আর বাংলার চন্ডাল অভিহিত জাতির সামাজিক অবস্থান একই পঙক্তিতে রাখা সম্ভব নয়।

এর ফলস্বরূপ ব্রিটিশ আমলে অবমাননাকর এই চণ্ডাল নাম পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘ প্রতিবাদের অবতারণা হয়ে ছিল। যার ফলে ১৯১১ সালের জনগণনার প্রতিবেদনে আলোচ্য জনগোষ্ঠীর মানুষজন আইনি ভাবে নমঃশূদ্র জাতি নামে পরিচিতি অর্জন করেন।[৪১] এই প্রতিবেদন অনুযায়ী অবিভক্ত বঙ্গ ও আসাম মিলিয়ে নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সংখ্যা ছিল ১৪ লক্ষের ওপর, অপরদিকে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এদের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ প্রায়।[৪২] এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ মাতা ও শূদ্র পিতার সংকরায়নের ফলে উৎপন্ন চন্ডাল বা নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সংখ্যা ব্রাহ্মণের থেকে অধিক হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আবার বাংলায় যাদেরকে চন্ডাল বলা হয়েছে, তাদের মূল জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। অপরদিকে মনুর বিধান অনুযায়ী চন্ডালের কাজ হবে শব দহন করা। সুতরাং বাংলার নমঃশূদ্র (চন্ডাল) এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী চন্ডাল দুটি পৃথক জনগোষ্ঠী এই সিদ্ধান্ত হওয়ার সম্ভাবনা উঠে আসে।

অপর একটি তত্ত্ব অনুসারে বলা হয় যে, 'শক্তিসঙ্গম তন্ত্র' নামক প্রাচীন গ্রন্থের প্রাণতোষী অধ্যায়ের 'হরপার্ব্বতী সংবাদ' অংশটিতে নমঃশূদ্র জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৩] বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত এই গ্রন্থ অনুসারে ব্রহ্মার মানসপুত্র মারিচ, কাশ্যপ মুনিকে সৃজন করেন। কাশ্যপ মুনির নাম অনুসারে নমঃশূদ্র জাতির গোত্রের নাম হয় 'কাশ্যপ গোত্র'। কাশ্যপ মুনির পুত্র নামস মুনির যমজ পুত্র কীর্তিমান এবং উরুবানের বংশধররাই বর্তমানে নমঃশূদ্র নামে পরিচিত। বাস্তব ক্ষেত্রে শক্তিসঙ্গম তন্ত্র বলে কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এই কারণে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তথ্যটির কোন গুরুত্ব নেই।

প্রাচীন ধর্মীয় সাহিত্যিক উপাদান হিসেবে বেদ, পুরাণ প্রভৃতি রচয়িতাদের ওপর ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী ঘটনা এবং বিষয় গুলিকে নথিভূক্ত না করার অভিযোগ আরোপিত হয়। ম্যাক্সমুলার ভারতীয় আর্যপন্থী পন্ডিত ও লিপিকার কর্তৃক বিরোধী সাংস্কৃতিক তথ্য এবং ঘটনাবলী অস্বীকার করার প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। ম্যাক্স মুলার ও এই প্রবণতা অনুধাবন করে উদাহরণ তুলে ধরেছেন যে, আলেকজান্ডারের আক্রমণ ও সুলতান মাহমুদের সোমনাথ মন্দির লুটের ঘটনা কোন পুরান বা ধর্মীয় আখ্যানে প্রত্যক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে উঠে আসেনি। আর.সি. দত্ত (R.C. Dutta) এই প্রবণতাকে 'নীরবতার ষড়যন্ত্র' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। শাসকশ্রেণী বা বিজয়ী গোষ্ঠীর দ্বারা লিখিত ইতিহাসে সমাজের বিজিত বা পরাজিত অংশের কথা স্মরণাতীত কাল থেকে অবহেলিত হয়ে এসেছে। ভারতীয় ইতিহাসে এই তথ্য হারিয়ে যেতে দেওয়া ও বিকৃতকরণের কারণে বাংলার জাতি ব্যবস্থার ইতিহাস নির্ভর ব্যাখ্যা পাওয়া সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। তথ্যের এই অসম্পূর্ণতা ও পক্ষপাতিত্বের কারণে বাংলার জাতি ব্যবস্থার ইতিহাস নির্ভর সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া দুরূহ হলেও অন্যান্য সাহিত্যিক উপাদানে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

১.৪.৩. নমঃশূদ্র জাতির উৎপত্তিতে ব্রাহ্মণত্ব সম্পর্কিত তত্ত্ব

নদিয়া বঙ্গসমাজের কূলজীগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, গৌড়রাজ শশাঙ্কের শাসনকালে অর্থাৎ আনুমানিক সপ্তশতাব্দীতে বর্তমান উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত সরয়ূ নদীর তীর থেকে বারো জন উচ্চকোটির শুদ্ধ ব্রাহ্মণ নিয়ে আসা হয়ে ছিল। এই ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীই গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত হয়।[৪৪] এই ভাবে বাংলায় ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির সম্প্রসারণের যে ঘটনা লেখা হয়েছে, তা ইতিহাস স্বীকৃত না হলেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিস্তারের কৈফিয়ত হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়াস হিসেবে দেখা যেতে পারে। চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বঙ্গদেশে বসবাসকারী ব্রাহ্মণ সকল জাতি সম্পর্কে নিন্দাসূচক উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৫]

ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় তুর্কি বিজয়ের পর, রাঢ়অঞ্চলে বৃহদ্ধর্মপুরাণ রচিত হয়। পুরানটিতে পদ্মা-যমুনা-গঙ্গার প্লাবনভূমিতে ৩৬টি ব্রাহ্মণেতর সংকর বর্ণের জাতির পাশাপাশি বঙ্গদেশের বাইরে থেকে আসা দেবল বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, পুলিন্দ, পুককস, যবন শবর, খর ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উল্লেখিত হয়েছে যে, গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণ সমাজে সম্মানিত ছিলেন না। জ্যোতিষ ও নক্ষত্র বিদ্যাচর্চার এবং দান গ্রহণকরার কারণে, তাঁরা ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে পতিত হয়ে পড়েন।

এই গ্রন্থে সংকর যুক্ত বর্ণসমূহকে সৎ এবং অসৎ শূদ্র, এই দুই ভাগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উপরোক্ত গ্রন্থগুলোতে বাংলার সকল প্রকার জাতির উল্লেখ থাকলেও নমঃশূদ্র জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় না। উপরোক্ত তথ্য থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সাম্পন্ন জাতিটি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বহির্ভূত কোন জনগোষ্ঠী অথবা বঙ্গদেশে অবস্থানকারী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির থেকে বিচ্যুত হওয়া কোন জনগোষ্ঠী যাদের, পুরোনো পরিচিতি বিলুপ্ত হয়ে, নতুন পরিচিতি সৃষ্টি হয়ে ছিল।

প্রচলিত তত্ত্ব অনুসারে বল্লাল সেনের রাজত্বে বসবাসকারী শাকদ্বীপী বা মঘা ব্রাহ্মণ যারা, দেবল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একটি শাখা, তাঁরা ভারতের রাজস্থান, গয়া, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাস করেন। বাংলায় বসবাসকারী এই শাখাটি রাজা বল্লাল সেনের বিরাগভাজন হয়ে, নবদ্বীপ থেকে বিতাড়িত হয়। পরবর্তীতে অধঃপতিত এই জাতির মানুষ পূর্ববঙ্গের জলা-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কালক্রমে শিক্ষা দীক্ষা ও জাতি গৌরব হারিয়ে, অপমানজনক চণ্ডাল অপবাদে ভূষিত হতে শুরু করেন। এই ভাবে শাকদ্বীপী বা মঘা ব্রাহ্মণ বা পরাশববিপ্র, যারা দেবল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী, তাঁরা নমস্যা শূদ্র বা নমঃশূদ্র বা চণ্ডাল নামে পরিচিত হয়ে পড়েন।

এই যুক্তির সমর্থনে গয়া ক্ষেত্রে অন্নের পিন্ডদানের তথ্যটি তুলে ধরা হয়। ২০১৮ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ৩রা এপ্রিলে সংস্কৃত সাহিত্যের গবেষক গোপাল বিশ্বাস এবং প্রাবন্ধিক সুনীলকৃষ্ণ মন্ডল মহাশয়ের গয়া ক্ষেত্র সমীক্ষায় উঠে এসেছে। তাঁর অনুসন্ধানের মাধ্যমে উঠে এসেছে যে, বাংলা ব্রাহ্মণ ছাড়া একমাত্র নমো এবং নাথ যোগী সম্প্রদায় ভাত বা অন্নের পিণ্ড প্রদানের যোগ্য। গয়ার পাণ্ডাদের দস্তাবেজে ১২২২ বঙ্গাব্দ (অর্থাৎ ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দ) এ নমো কর্তৃক অন্নের পিন্ডদানের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৬] এছাড়াও এই যুক্তির সমর্থনে নমঃশূদ্রদের মধ্যে সূর্য পূজা বা বৈষ্ণব সাংস্কৃতির প্রভাব, দশ দিনে অশৌচান্ত, বিবাহে প্রজাপত্য রীতি অনুসরণ, কুশণ্ডিকা ধারণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ আচার-পদ্ধতির অনুসরণকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।[৪৭]

১.৪.৪. বাংলার আদি নিবাসী হিসেবে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর পরিচিতি সম্পর্কিত মতবাদ

নমঃশূদ্র জাতির ব্রাহ্মণত্ব দাবির পাশাপাশি, তাদের বাংলায় আদিম জনগোষ্ঠী হওয়ার মতবাদের সমর্থনে কিছু তথ্য ও যুক্তি পাওয়া যায়। ঋকবেদে [১/৫৩/৭-৮] উল্লেখ করা হয়েছে যে, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিরোধী বস্তুবাদী মতাদর্শের অনুসারী ও সম্পদে পরিপূর্ণ প্রাচীর-বেষ্টিত নমদস্যুদের শত শত নগরী ছিল।[৪৮] অপর একটি শ্লোকে শত শত পুর ধ্বংস করে দেবরাজ ইন্দ্র আর্যাবর্তের প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ এদের জনসংখ্যা ছিল বিপুল পরিমাণ।

অপরদিকে আনুমানিক ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যে আবিষ্কৃত একটি মাটির পাত্রের গায়ে ব্রাহ্মী লিপিতে 'নমোহ' শব্দটি লেখা আবিষ্কৃত হয়েছে।[৪৯] পরাজিত জাতি গুলিকে দাস পরিণত করা হয় অথবা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নগর পরিত্যাগ করে তাঁরা জঙ্গল বা দুর্গম জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুরধ্বংস পরবর্তীতে পরাজিত এবং ঘৃণিত নমদস্যু নামক বিশাল জনগোষ্ঠীর ইতিহাস পাওয়া যায় না। অর্থাৎ

আনুমানিক চন্দ্রকেতুগর বা ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে শশাঙ্কের সময় ৭০০ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যবর্তী পর্বে 'নমদস্যু' নামক বিশাল জনগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। অপর দিকে ৭০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে চণ্ডাল নামক এক বিশাল জনগোষ্ঠীর বসবাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

দেবরাজ ইন্দ্র দ্বারা বা আর্যদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত জনগোষ্ঠী সমূহের আশ্রয় হয় জঙ্গলে অথবা আর্য সৃষ্ট চতুর্বর্ণের চতুর্থতম বর্ণ হিসেবে বাকি বর্ণের সেবক বা দাস হিসেবে অথবা বর্ণ বহির্ভূত মানুষ হিসাবে লোকালয়ের বাইরে। কালক্রমে এই পরাজিত দস্যুরাই জলাচল ও শূদ্রবর্ণের পরিচয় প্রাপ্ত হয়। জার্মান পন্ডিত ম্যাক্সমুলারের বিশ্লেষণেও একই মত উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন যে, নিজের সংস্কারের অনুকুল মতবাদে বিশ্বাসী তথ্যকে আর্যরা প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতেন প্রতিকূল হলে ম্লেচ্ছতম বলে অগ্রাহ্য করতেন অথবা ধ্বংস করতেন।

ঐতরেয় আরণ্যকে বাংলায় বসবাসকারী বঙ্গ, বগধ ও চের এই তিনটি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫০] অনুরূপভাবে গ্রিক মহাকবি ভার্জিলের বিবরণে (৭০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৯৩ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যবর্তী সময়) বঙ্গদেশে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কালব্যাপী রাজত্বকারি গন্ডারিডী বা গঙ্গারিডি জাতির উল্লেখ আছে।[৫১] BC Allen তাঁর Gazetteer of Bengal and North East India প্রতিবেদনে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রাচীন বঙ্গ জাতির বংশধর হওয়ার সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়েছেন।[৫২]

উপরোক্ত তথ্যগুলি প্রাচীন বঙ্গের 'নম' নামে একটি জাতি অবস্থান করার তথ্যকে তুলে ধরে। সপ্তশতাব্দীতে লেখা 'এগরা তাম্রশাসনে' এক ভূসম্পত্তি সম্পন্ন চণ্ডাল কৃষক তাঁর নিজের জমিতে সরকারি অনুমোদনে শান বাঁধানো ঘাট যুক্ত বিশাল পুষ্করিণীর খনন করেছিলেন, এই উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৩] উক্ত তথ্যটিকে তৎকালীন কৃষিনির্ভর ও প্রতিপত্তি সম্পন্ন চন্ডাল জাতির সামাজিক অবস্থানের লিখিত তথ্য হিসেবে গণ্য করা যায়।

অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কালে অতীশ দীপঙ্করের পাঁচজন শিষ্যের মধ্যে অন্যতম ভসুকু পাদ তাঁর দোহাতে চন্ডাল জাতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন-

আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী

নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।[৫৪]

দোহাটীতে বলা হয়েছে ভুসুকু চণ্ডালিকে বিয়েকরে বাঙালি হয়ে গেল। অর্থাৎ বঙ্গদেশের বসবাসকারী জাতির মধ্যে চন্ডাল নামক জাতিটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, যে কারণে চন্ডালিকে বিয়ে করে বাঙালিত্ব অর্জন করা সম্ভব হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় লেখা মঙ্গলকাব্যে উল্লেখিত হয়েছে যে বাংলার চন্ডাল (নমঃশূদ্র) এরা নগর বা গ্রামের মধ্যে বসবাস করত।[৫৫]

শেরশাহ সুরি বাংলা দখল করার পর, রাজস্ব আদায়ের ও প্রসাশনিক সুবিধার্থে, তাঁর সাম্রাজ্যকে ৪৭ টি সরকারে বিভাজিত করেন। এই সরকার গুলিকে অসংখ্য পরগনা বা ডিহিতে ভাগ করেন। কয়েকটি মৌজা নিয়ে একটি ডিহি বা পরগনা গঠন করা হতো। অধুনা বাংলাদেশ খুলনা বিভাগের নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলায় অবস্থিত নলদী পরগনা বা বর্তমান নলদী ইউনিয়নে ১২৭ টি নমঃশূদ্র অধ্যুষিত গ্রামের নাম পাওয়া যায়।[৫৬] অনুরূপভাবে যশোর জেলায় মনিরামপুর উপজেলা অন্তর্গত কুলটিয়া ইউনিয়ন বা ছিয়ানব্বই গ্রাম (ছিয়ানব্বইটি গ্রাম) নমঃশূদ্র জাতি অধ্যুষিত ছিল।

নবীন চন্দ্র ভদ্র তাঁর 'ভাওয়ালের ইতিহাস' গ্রন্থে ঢাকা পার্শ্ববর্তী ভাওয়াল অঞ্চলের দুই শাসক হিসেবে প্রতাপ রায় ও প্রসন্ন রায় নামক চন্ডাল জাতির জমিদারের কথা উল্লেখ করেছেন। এই জমিদারি পরিচালনার জন্য রাজধানীটি স্থাপিত হয়ে ছিল জয়দেবপুর বরোমাইল উত্তর-পূর্ব দিকে রাজবাড়ি অঞ্চলে। যার ধ্বংসাবশেষ উপনিবেশিক শাসনকালে ও দেখতে পাওয়া যেত।[৫৭] ১৮৪০ সালে জেমস টেলর (James Tailor) তাঁর সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রতিবেদনে ভাওয়াল রাজ্য ও ঢাকা সহ পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চণ্ডাল অর্থাৎ নমঃ

শূদ্রদের বসতির উল্লেখ করেছেন। প্রশাসনিক গবেষক জেমস ওয়াইজের (James Fawns Norton Wise 1835-86) ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে থেকে চন্ডাল বা নমঃশূদ্র বা চাঙ্গা জাতি উৎপত্তির ব্যাখ্যায় উপরিউক্ত তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

তিনি নমঃশূদ্রদের চতুর্বর্ণের বাইরে অনার্য বা নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে দ্রাবিড়ীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। নমঃশূদ্রদের আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে ভাওয়ালের জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণকারী ও পরবর্তীতে ওই জঙ্গলেই রাজত্ব স্থাপনকারী এবং খিয়েতি নগরী (Kayati Nagari) বর্ণমালা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রমাণ হিসেবে ভাওয়ালের জঙ্গলে চণ্ডাল রাজ দূর্গের ভগ্নাবশেষের কথাও তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন বাংলার পূর্ব অংশে বসবাসকারী অন্যান্য শূদ্র বর্ণের জাতির থেকে নমঃশূদ্রদের স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং আলাদা সাংস্কৃতির ধারক ও বাহক জনগোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১৮৭২ সালে এইচ.বেভারলির তত্ত্বাবধানে সংগঠিত প্রথম আদমশুমারির প্রতিবেদনে বাংলার চন্ডাল (নমঃশূদ্র) কে অন্যান্য অনেক জাতির সঙ্গে 'Semi Hinduised Aboriginals' জাতির সরণিতে রেখেছেন।[৫৮] এই তথ্য অনুসারে অহিন্দু জাতি থেকে চন্ডাল(নমঃশূদ্র) জনগোষ্ঠীটি ধীরে ধীরে হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে অঙ্গীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় অবস্থান করছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে নতুন নতুন বর্ণে অন্তর্ভুক্তি বা বল্লাল সেনের আমলে লেখা নৈহাটি লিপি থেকে প্রাচীন বাংলায় বসবাসকারী সুক্ষ, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি জাতিকে হিন্দু সংস্কৃতিতে আত্তীকরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলার বিস্তীর্ণ ভূমিতে বসবাসকারী আদি চন্ডাল(নমঃশূদ্র) জনগোষ্ঠীটি সময়ের প্রবাহে ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিতে জলআচল জাতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। অনুরূপ ভাবে নবীনচন্দ্র ভদ্র তাঁর ভাওয়ালের ইতিহাস গ্রন্থটিতে

নমঃশূদ্রদের ব্যবহৃত চাষনগরী শিল্প শৈলীকে মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় ব্যবহৃত হওয়া লিপির সঙ্গে সামঞ্জস্যতা প্রমাণ করার প্রয়াস করেছেন।[৫৯]

১.৪.৫. নর তত্ত্ব বা শরীরবৃত্তিয় বিশিষ্টের ভিত্তিতে নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতি তত্ত্ব

জাতি পরিচিতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শরীরতাত্ত্বিক বা নর তত্ত্ব গঠনের বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন জাতির মানুষের দেহের গঠন বৈশিষ্ট্য, কেশের প্রকৃতি, চোখ ও চামড়ার রঙ, নাসিকা, কপাল, মাথার প্রভৃতির আকৃতি পরিমাপের মাধ্যমে অর্থাৎ ব্যক্তির দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জাতি পরিচিতি নির্ণয়ের প্রক্রিয়াটিকে এই পদ্ধতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ মানুষের দৈহিক গঠন ও প্রকৃতি, জিনের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল।

এই প্রক্রিয়াটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রয়োগ করা হলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হয়ে উঠতে পারে। ভারত তথা বাংলায় শরীরতাত্ত্বিক বা নর তত্ত্ব গঠনের আধুনিক পরিমাপ পদ্ধতি শুরু করেন হুটন ও রিজলে। বাংলা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে নর তাত্ত্বিক পরিমাপ নথিভূক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা করেন বিরোজা শংকর গুহ। তিনি বাংলর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, পৌণ্ড্র জাতির নর তত্ত্ব পরিমাপ লিপিবদ্ধ করেছেন। সাঁওতাল ভূমিজ, বাউরি বাগদি, লোহার, তেলি, সুবর্ণ বণিক, গন্ধ বণিক, ময়রা, তন্তুবায়, মাহিষ্য, তমালি, নাপিত, রজক প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর নর তত্ত্ব পরিমাপ নথিবদ্ধকরণ করেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। এইচ.এইচ.রিসলে (Herbert Hope Risley, 1851-1911) রাজবংশী, সদগোপ, মুচি, মালি, কৈবর্ত, মালো, চন্ডাল, গোয়ালা, বাগদী, বাউরি এবং পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের নর তাত্ত্বিক পরিমাপ লিপিবদ্ধ করেছেন।[৬০] বাংলার নর তাত্ত্বিক গঠনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে উঠে আসা তথ্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলায় বসবাসকারী বিভিন্ন

জাতির দৈহিক পরিমিতি নির্দেশ করে যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ সহ বাংলায় বসবাসকারী সকল জাতির মধ্যে সংকরায়নের বৈশিষ্ট্য প্রকট।

বৃহদ্ধর্মপুরানে উল্লেখিত ৩৬ টি সংকর জাতি ও পরবর্তীতে সংযোজিত আরো পাঁচটি জাতির মত, সমাজের উচ্চবর্ণ হিসেবে বিবেচিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতিও সংকরায়ন দোষে জর্জরিত। তথাপি ব্রাহ্মন ব্যতীত অন্য সকল জাতির সংকরায়নের বর্ণনা পুরান, স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। এর কারণ হিসেবে রচয়িতারা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হওয়ায় নিজ সম্প্রদায়ের সংকরায়নের তথ্যকে গোপন করার প্রবণতা (Biasness) কে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়।[৬১] যাই হোক সংগ্রহীত তথ্যের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাঙালি ব্রাহ্মণ জাতির দেহ দৈর্ঘ্য হয় মধ্যম আকৃতির। মাথার খুলির আকৃতি মধ্যম (Mesocephalic) অর্থাৎ গোল নয় বা দীর্ঘ নয়। নাসিকা তীক্ষ্ণ ও উন্নত। বিরজা শঙ্কর গুহ লিপিবদ্ধ পরিমিতিতে, এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ এবং উত্তর অংশ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও বরেন্দ্র অঞ্চলের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে কম বেশি একই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বাঙালি ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর মত কায়স্থ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যে কোন পার্থক্য নেই।

কিন্তু সামাজিক বর্ণ বিন্যাসের সর্বনিম্ন স্তরে রাখা নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর দৈহিক পরিমিতির বিশ্লেষণ নীহাররঞ্জন রায়ের কাছে চাঞ্চল্যকর মনে হয়েছে। তিনি মনে করেন যে, দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিরিখে উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সাথে বাঙালি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থদের তুলনায় বাঙালি নমঃশূদ্র জাতির আত্মীয়তা বা সামঞ্জস্যতা বেশি।[৬২] রাজস্থান, গয়া, বিহার দেবল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মত নমঃশূদ্ররাও সূর্যপূজা, ইতুপুজা প্রভৃতি এবং অন্যান্য সংস্কৃতিগত মিল পাওয়া যায়। নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্টের পর্যালোচনায় নমঃশূদ্রদের মাথার খুলির আকৃতি, নাসিকার পরিমাপ, দৈহিক গঠন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ হওয়ার দাবিকে শক্তিশালী করে।

যদিও নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ সংক্রান্ত তত্ত্বের সিদ্ধান্তকে বিশ্বের বহু পন্ডিত সমর্থন করেননি। তাদের মতে এই পরিমাপ জাতি নির্ণয়ের একটি প্রণালী মাত্র। এর দ্বারা কোন নির্দিষ্ট জাতি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। সম্ভবত এই কারণে রিজলে ও অধ্যাপক অয়াদ্যালের লিপিবদ্ধ পরিমাপের ফলাফলে মিল পাওয়া যায় না।[৬৩] তথাপি বর্তমান বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে সংকরায়নের প্রভাব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করার ক্ষেত্রে জিনগত ও নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি (Tool) হয়ে উঠেছে।

১.৪.৬. ঔপনিবেশিক গবেষক ও প্রশাসক বর্ণিত উপাদানে নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতি

নমঃশূদ্র জাতির সামাজিক ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক গবেষক ও প্রশাসক বর্ণিত তথ্য আধুনিক ইতিহাস এবং জাতিচর্চার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ঔপনিবেশিক ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ থেকে ভারতের সমাজ-সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য বিদেশি আমলা তান্ত্রিক প্রতিনিধিদের অনুসন্ধান ও গবেষণামূলক প্রয়াস শুরু হয়। যার ফলস্বরূপ ১৭৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি স্যার উইলিয়াম জোনসের তত্ত্বাবধানে ব্রিটিশ ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্থাটিকে গবেষণামূলক তথ্য সংগ্রহের প্রাথমিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও গবেষণামূলক লেখায় ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি বর্ণবৈষম্যের বিষয়টিও উঠে আসে। পূর্ববঙ্গের সমাজ সংস্কৃতি এবং ইতিহাস পর্যালোচনা করার প্রক্রিয়ায় তৎকালীন সময়ে চন্ডাল নামে পরিচিত (বর্তমানে নমঃশূদ্র) জাতিটির বিপুল জনসংখ্যা উপনিবেশিক গবেষক এবং লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন বর্ণনায়, ওই অঞ্চলগুলিতে চন্ডাল বা নমঃশূদ্র জাতির প্রভাবের কথা উঠে আসে।

১৮৩৮ সালে হ্যামিল্টন বুকানন তাঁর প্রতিবেদনে নৃ-তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে চন্ডাল (নমঃশূদ্র) জাতির সামাজিক, ধর্মীয় রীতিনীতি ও জীবিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রতিবেদনটিতে, তিনি বাংলার চন্ডাল (নমঃশূদ্র) এবং বিহারের দোসাদ জাতির শারীরিক গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্যের কথা বলেছেন। (Francis Buchanan)দোসাদ জনগোষ্ঠী বর্তমান বিহার, ঝাড়খন্ড ও উত্তর প্রদেশে বসবাসকারী পাসোয়ান বা অঙ্গরক্ষাকারি (Bodyguard) জীবিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, অপরদিকে নমঃশূদ্র জাতির ঢালী, সরদার, পাইক প্রভৃতি পেশাভিত্তিক পদবি সমগোত্রীয় কর্মের আভাস দেয়। বর্তমান ভারতীয় দলিত রাজনীতিতে দোসাদ বা পাসোয়ান জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি বর্তমান।

১৮৪০ সালে জেমস টেলর (James Tailor) সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রতিবেদনে ভাওয়াল রাজ্য ও ঢাকা সহ পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চণ্ডাল অর্থাৎ নমঃশূদ্রদের বসতির উল্লেখ করেছেন। মূলত কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত রায়ত হিসেবে তাদের বর্ণনা পাওয়া গেলেও, এই জনগোষ্ঠী শহর ও জেলাগুলিতে মালী, নৌকাচালক, পাল্কি বাহক, ঢুলি বাদক, ঘাস কর্তনকারী পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে।[৬৪] নমঃশূদ্রদের বিভিন্ন পদবী যেমন- মিদ্যো, মাঝি, মালি, গায়েন, বায়েন প্রভৃতি জেমস টেলরের লেখা প্রতিবেদনের তথ্যকে সমর্থন করে।

১৮৭২ সালে এইচ. বেভারলির (H. Beverley) তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত আদমশুমারিতে বাংলার চন্ডাল (নমঃ শূদ্র) দের semi Hinduised Aboriginals বলে বর্ণনা করেছেন।[৬৫] স্যার উইলিয়াম উইলসন হান্টার ১৮৭৫ সালে সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, জীবিকা, জীবনশৈলী, সাংস্কৃতিক রীতির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।[৬৬] বেভারলির তথ্য নমঃশূদ্রদের হিন্দু ধর্মে ক্রম আত্তীকরণের প্রক্রিয়াটির দিকে নির্দেশ করে। যেখানে এই জাতিটি ধীরে ধীরে হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে মিশে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় সামিল হয়ে চলেছিল, এমন আভাস পাওয়া যায়। ১৮৮৩ সালে জেমস ওয়াইজের (James

Fawns Norton Wise 1835-86 গ্রন্থে চন্ডাল বা নমঃশূদ্র জাতির উৎপত্তি ও সামাজিক অবস্থান তুলে ধরেন। তাঁর বর্ণনা থেকে চন্ডাল বা নমঃশূদ্র বা চাঙ্গা জাতি উৎপত্তির বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

তিনি নমঃশূদ্রদের চতুর্বর্ণের বাইরে অনার্য বা নৃতাত্ত্বিক ভাবে দ্রাবিড়ীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। নমঃশূদ্রদের আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে, ভাওয়ালের জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণকারী ও পরবর্তীতে, ওই জঙ্গলেই রাজত্ব স্থাপনকারী এবং খিয়েতি নগরী (Kayati Nagari) বর্ণমালা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তৎকালীন বাংলার পূর্ব অংশে বসবাসকারী অন্যান্য শূদ্র বর্ণের জাতির থেকে স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক ধারক ও বাহক জনগোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রমাণ হিসেবে ভাওয়ালের জঙ্গলে চণ্ডাল রাজার দূর্গের ভগ্নাবশেষের কথা, তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

ওয়াইজের বর্ণনায় তাঁর পূর্ববর্তী গবেষক এইচ. বেভারলির তত্ত্বকে সমর্থন করে, প্রামাণ্য ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। যেখানে আদি বনবাসী মানুষ থেকে অভিযোজন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বর্তমান নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতি ব্যক্ত হয়েছে। ১৮৯১ সালে প্রকাশিত এইচ.এইচ. রিসলের গ্রন্থে জাতি তত্ত্ব উন্মোচনের ক্ষেত্রে নৃতত্ত্ব ভিত্তিক সমীক্ষার মধ্য দিয়ে আর্য, দ্রাবিড়িয়ান ও অনন্য জাতিকে সনাক্ত করার প্রয়াস করেন। বাংলার দক্ষিন-পূর্বঅঞ্চলে বসবাসকারী চন্ডাল বা নমঃশূদ্র জাতির নাসিকার প্রস্থ, মাথার খুলির আকার প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক গঠন, বিবাহ রীতি, ধর্মীয় আচার-আচারণ, পেশা, সামাজিক অবস্থান ও জনবিন্যাস তুলে ধরে এই জাতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তুলেধরেন। [৬৭]

নমঃশূদ্র জাতির বর্ণনার ক্ষেত্রে, ঔপনিবেশিক পর্বে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভান্ডার হল, উপনিবেশিক সরকারকর্তৃক প্রবর্তিত আদমশুমারি ব্যবস্থা। ১৮৭২ সাল থেকে ঔপনিবেশিক আদমশুমারি ব্যবস্থা শুরু হয়। এরপর ১৮৮১ থেকে প্রতি দশ বছর অন্তর

ব্রিটিশ শাসনের অধীনস্ত সারাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী জাতি ও তাদের জনবিন্যাসের সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক ভারতের ১৯০১ আদমশুমারি অনুযায়ী বঙ্গ প্রদেশ (বেঙ্গল প্রভিন্স) এর ঢাকা বিভাগে (Dhaka Division) এর ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রকৃতি জেলাগুলিতে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর ৫৫ ভাগের অধিক মানুষ বসবাস করতেন।[৬৮] প্রেসিডেন্সি বিভাগের খুলনা, যশোর, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা প্রভৃতি জেলায় প্রায় ২৪ শতাংশ এবং বাকি অংশ রাজশাহি ডিভিশন, চিটাগং ডিভিশন, বর্ধমান ডিভিশন, কোচবিহার, পার্বত্য তিপিরা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করতো।[৬৯] মূলত কৃষি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত জাতি হিসেবে বর্ণনা পাওয়া গেলও তাঁদের মৎস্য শিকার, নৌকা পারাপার, পালকি বাহক, লাঠিয়াল এবং অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার বিবরণ পাওয়া যায়।

জনসংখ্যায় বিপুল পরিমাণে হওয়া সত্বেও, অনালোচিত নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে, উপনিবেশিক ইতিহাস অনুসন্ধানকারী এবং গবেষকদের কৃতিত্ব যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি ভাবে উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহারের ফলে নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস পুনর্লিখনের ক্ষেত্রটিও জটিলতর হয়ে উঠেছে। মূলত লেখকদের ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকা, গবেষণার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ধারণার প্রয়োগ করার প্রবণতাকে এজন্য দায়ী করা যায়। যাইহোক, নমঃশূদ্র ইতিহাস চর্চার এই ধারা ত্বরান্বিত হতে থাকে, যা আলোচ্য জাতিটির উৎপত্তি ও সামাজিক অবস্থানের ইতিহাস পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

১.৫. সিদ্ধান্ত এবং প্রশ্ন উত্থাপন:

ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সময়ের প্রবাহে বিভিন্ন জাতি বা জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি ও দর্শন এসে মিলিত হয়েছে এই প্রাচীন

ভূমিতে। এই সভ্যতায় পরিচিতি সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব এবং ধারনার বিবর্তনের ইতিহাস অতি সুপ্রাচীন। কখনো আর্য ও অনার্য পরিচিতি দ্বন্দ্ব অথবা কখনো একেশ্বরবাদি ও বহুত্ববাদি সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব হিসেবে তা প্রকাশ পেয়েছে। ভারতীয় হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে বর্ণ ও জাতি পরিচিতি অন্যতম বহুল আলোচিত বিষয়।

এই বর্ণ বা জাতি পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে স্মৃতি শাস্ত্র ও সূত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যাকে একতরফা মান্যতা দিতে দেখা গেছে। একদিকে যেমন এই ব্যাখ্যা সমূহকে আরোপ এবং বৈধ করার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থকে ব্যবহার করা হয়েছে। অপরদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী ঘটনা এবং বিষয় গুলিকে নথিভূক্ত না করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ম্যাক্সমুলার ভারতীয় আর্য পন্থী পন্ডিত ও লিপিকার কর্তৃক বিরোধী সাংস্কৃতিক তথ্য এবং ঘটনাবলী অস্বীকার করার প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন।[৭০] তিনি এই প্রবণতা অনুধাবন করে উদাহরণ তুলে ধরেছেন যে, আলেকজান্ডারের আক্রমণ ও সুলতান মাহমুদের সোমনাথ মন্দির লুটের ঘটনা কোন পুরান বা ধর্মীয় আখ্যানে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে উঠে আসেনি। আর.সি. দত্ত (R.C. Dutta) এই প্রবণতাকে 'নীরবতার ষড়যন্ত্র' বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[৭১]তথ্যের এই অসম্পূর্ণতা ও পক্ষপাতিত্বের কারণে ভারত তথা বাংলার জাতি ব্যবস্থার ইতিহাস নির্ভর সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে রয়েছে।

ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম হওয়ার পর, বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জাতি সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা ও তথ্য উঠে আসতে শুরু করে ছিল। এছাড়া সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার দুয়ার উন্মুক্ত হওয়ায় সামাজিক ন্যায় ও যুক্তি বাদের প্রসার ঘটেছিল। এই প্রক্রিয়া অনেক জনগোষ্ঠীকে নিজেদের আত্মপরিচিতি অনুসন্ধানের নতুন সম্ভাবনা খুলে দিয়ে ছিল। যার ফলস্বরূপ ধর্মীয় গ্রন্থে সম্বলিত তত্ত্ব এবং তথ্যের বাইরে গিয়েও পরিচিতি অনুসন্ধান শুরু হয়ে ছিল। যার উদাহরণ পাওয়া যায় বিভিন্ন জাতির একাধিক পরিচিতি তত্ত্ব উদ্ভবের মধ্য দিয়ে।

এই প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পাশাপাশি বঙ্গপ্রদেশের নমঃশূদ্র জাতির পরিচিতি নির্মাণের প্রয়াসের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ হওয়ার স্বপক্ষে তত্ত্ব গড়ে ওঠে, অপরদিকে প্রাচীন বঙ্গে বসবাসকারী আদিম জনগোষ্ঠী বা উপজাতি তত্ত্বটিও উঠে আসতে দেখা যায়। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এই সকল তত্ত্বসমূহ প্রামাণ্য উপাদানের নিরিখে গ্রহণযোগ্য না হলেও পরিচিতি নির্মাণের এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়নি। পরিচিতি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া এই সকল প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে বাংলার নমঃশূদ্র তথা অন্যান্য জাতি সমূহের মধ্যে আত্মপরিচিতি সম্পর্কিত চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল।

প্রাথমিকভাবে হরিচাঁদ ঠাকুর এবং গুরুচাঁদ ঠাকুরের সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক সংস্কারের মধ্যে দিয়ে জাতি পরিচিতি নির্মাণের নবউদ্যোগের অবতারণা হয়ে ছিল। যার ফলস্বরূপ অসন্মান জনক চন্ডাল নাম পরিবর্তনের জন্য আলোচ্য জনগোষ্ঠীর দীর্ঘকালীন সংগ্রাম এবং সামাজিক অসম্মানের প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে উঠতে দেখাযায়। পরবর্তীতে যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল, প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক প্রভৃতি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের হাত ধরে নমঃশূদ্র জাতি, বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে স্বতন্ত্র পরিচিতি নির্মাণে সক্ষম হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের জাতিচর্চার ইতিহাসে আলোচনার প্রসঙ্গে অন্য সকল পশ্চাৎপদ জাতির উত্থান এর পাশাপাশি নমঃশূদ্র জাতির উজ্জ্বল উপস্থিতি সমাজবিজ্ঞানী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। জাতি চর্চায় নমঃশূদ্র জাতি সম্পর্কে এসকল প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা জাতিটির পরিচিতি তত্ত্ব হিসেবে উঠে আসা মতবাদ সমূহের প্রয়োজনীয়তাকে অতিক্রম করে, তাঁদের স্বতন্ত্র পরিচয় নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে জাতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার নমঃশূদ্র সহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যেভাবে স্বতন্ত্র জাতি পরিচিতি নির্মাণের প্রয়াসে উদ্যোগী হয়ে ছিল, এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ:

১. Matthew J. Hornsey: *Social Identity Theory and Self-categorization Theory: A Historical Review*, in book, *Social and Personality Psychology Compass* 2/1, Blackwell Publishing Ltd, 2008), পৃ.পৃ. ২০৪-২২২।

২. রূপ কুমার বর্মণ: *জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির আবস্থান*, (কলকাতা, অ্যালফাবেট বুক্স, ২০১৯)

৩. Richard Jenkins: *Socila Identity*, (London and New York, Routledge, 2008) পৃ.পৃ. ১৭-১৮।

৪. তদেব, পৃ.পৃ. ১১৯-১২১।

৫. The Cambridge School of historiography was a school of thought which approached the study of the British Empire from the imperialist point of view. It emerged especially at the University of Cambridge in the 1960s. John Andrew Gallagher (1919-80) was especially influential, particularly in his article with Ronald Robinson on "The Imperialism of Free Trade". It was led by Anil Seal, Gordon Johnson, Richard Gordon, and David A. Washbrook.

৬. Rup Kumar Barman: Caste, Class and Culture: *The Malos, Adwaita Malla Barman and History of India and Bangladesh*, (New Delhi, Abhijeet Publicatios, 2020), পৃ.১৬।

৭. রূপ কুমার বর্মণ: *সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ,* (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২) পৃ.২৪

৮. শ্রীল প্রভুপাদ: *শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ*, প্রথম অধ্যায়, শ্লোক নং ৪০-৪৩, (কলকাতা, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, ২০০৪), পৃ.

৯. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: *প্রাচীন ভারতীয় সমাজ,* (কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০১), পৃ. ৩৬।

১০. নীহাররঞ্জন রায়: *বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব,* (কলকাতা, দে'জ প্রকাশনী, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ),পৃ. ৬৯।

১১. তদেব, পৃ. ২৯৩।

১২. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

১৩. শ্রীল প্রভুপাদ: প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ৪৬৪-৪৭৮।

১৪ নীতিশ বিশ্বাস: *শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর স্বর্ণ সংকলন*, (কলকাতা, ঐক্যতা, ২০১৫) পৃ. ২৯।

১৫. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য (সম্পাদিত): *বাল্মিকী রামায়ণ,* (কলকাতা, তুলি কলম, ১৯৯৫), পৃ.পৃ. ৯৬৯- ৯৭৩।

১৬. মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস: *মহাভারতম,* (কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ), (বঙ্গানুবাদ) শ্রীমদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচাজ্য। পৃ.পৃ. ১৪১৬-১৪২১।

১৭. তদেব, পৃ.পৃ. ১৪০৭-১৪৫৪।

১৮. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত): *মনুসংহিতা- মেধাতিথি ভাষ্য,* (কলকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ), পৃ.পৃ. ৩৩৯-৩৪০।

১৯. তদেব, পৃ. ৭০৪।

২০. L.N. Rangarajan: *The Arthashastra*, (New Delhi, Penguin Books, 1987) পৃ. ৪৭।

২১. তদেব, পৃ. ৪৭।

২২. তদেব, পৃ. ৪৮৮।

২৩. তদেব, পৃ. ১৯।

২৪. সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় (দ্বিতীয় খন্ড): *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস,* (কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৮) পৃ.পৃ.২-১১।

২৫. তদেব, পৃ.পৃ. ৫-৬।

২৬. তদেব, পৃ. ১১।

২৭. নীহাররঞ্জন রায়: *বাঙালি হিন্দুর বর্ণভেদ,* (কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ) পৃ.

২৮. নীহাররঞ্জন রায়: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯।

২৯. বিনয় মিত্র: ধর্ম, ধর্মতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যবাদ, (ঢাক, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৮), পৃ.পৃ. ১৩৪-১৪০।

৩০. বিপুল কুমার রায়: *নম:শূদ্রদের ইতিহাস,* (ঢাকা, বাংলাদেশ, মুক্ত চিন্তা, ২০১৬) পৃ. ২০।

৩১. নীহাররঞ্জন রায়: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

৩২. Annual administration report, Presidency division 1880-81, Letter number 87 J.G dated Alipur, 8th July, 1881.

৩৩. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত): প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬৫।

৩৪. মনোশান্ত বিশ্বাস: *বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি,* (কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৬), পৃ. ৩৩।

৩৫. বিনয় মিত্র: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

৩৬. বিপুল কুমার রায়: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৩৭. তদেব পৃ. ১৭।

৩৮. তদেব, পৃ. ২০।

৩৯. বিনয় মিত্র: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

৪০. তদেব, পৃ. ১৮৬।

৪১. শিপ্রা বিশ্বাস: বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, (কলকাতা, একুশ শতক, ২০১৬), পৃ.পৃ. ১৭১-২০২।

৪২. বিনয় মিত্র: প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ১৯২-১৯৩।

৪৩. বিপুল কুমার রায়: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৪৪. নীহাররঞ্জন রায়: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯।

৪৫. বিপুল কুমার রায়: প্রাগুক্ত, পৃ ১৪।

৪৬. কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর (সম্পাদনা): বাংলার নমঃশূদ্র, (কলকাতা, কে. এন. টি. এ. এ. ২০২১), পৃ.পৃ. ৮৪-১৩০।

৪৭. সুধাংশু শেখর বিশ্বাস: নমসপুত্র, (ঢাকা, বাংলাদেশ, নালন্দা, ২০১৭), পৃ. ৬৫।

৪৮. সুনীল কুমার রায়: নিম্নবর্গের ফলিত ইতিহাসে বাংলার নমঃশূদ্র, পৃ. ৩৫

৪৯. তদেব, পৃ.

৫০. রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়: বাঙ্গলার ইতিহাস প্রথম ভাগ পৃ. ১৮

৫১. রমেশচন্দ্র মজুমদার: বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ.পৃ. ১৭-১৯।
৫২. সুকুমার রায়: নিম্নবর্গের ইতিহাস, পৃ. ৫০।
৫৩. দীনেশ চন্দ্র সরকার: শিলা লেখ তাম্র শাসনআদির প্রসঙ্গ, পৃ.পৃ. ৭৭-৭৮।
৫৪. মণীন্দ্র মোহন বসু (সম্পাদিত): চর্যাপদ, (কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩) পৃ. ১৭০।
৫৫. চিত্ত মন্ডল, প্রথমা মণ্ডল (সম্পাদিত): বাংলা দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, পৃ.পৃ. ২০২-২২৯।
৫৬. বিপুল কুমার রায়: প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ১১৬-১১৭।
৫৭. জগন্নাথ শিকদার(অনু): নমঃশূদ্র উৎপত্তি ও বিকাশ, (২৪ পরগনা, রেনুবালা শিকদার, ২০১৫), পৃ. ১৩০।
৫৮. H. Beverley: Report on the Census of Bengal, 1872.
৫৯. জগন্নাথ শিকদার: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।
৬০. নীহাররঞ্জন রায়: প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
৬১. তদেব, পৃ.৭০।
৬২. তদেব, পৃ.৮৪।
৬৩. শ্যামল কুমার প্রামানিক: পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতি ও আদিবাসী, (কলকাতা, ফার্মা.কে.এল.এম.প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭), পৃ. ১১।
৬৪. James Tailor: A sketch of the topography & statistics of Dacca, (Calcutta, GH Huttman, Military Orphan Press, 1840)
৬৫. H. Beverley: Report on the Census of Bengal 1872.
৬৬. W.W. Hunter: A Stastical Account of Bengal.
৬৭. H.H. Risley: The Tribes and Castes of Bengal, vol-II
৬৮. Sekhar Bandyopadhyay: Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal, 1872-1947, (Kolkata, Oxford, 2011), পৃ. XI.
৬৯. তদেব, পৃ. XI.
৭০. বিপুল কুমার রায়: নমঃশূদ্রের ইতিহাস, (ঢাকা, মুক্তচিন্তা, ২০১৬), পৃ. পৃ. ১২-১৭।
৭১. জগন্নাথ শিকদার: প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

জাতি চেতনা ও জাতি রাজনীতির উত্থানে বাংলার নমঃশূদ্র (১৮৭২-১৯৪৭)

২.১ ভূমিকা:

ভারতীয় সমাজে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত (Identify) করে, সামাজিক হীনমন্যতা (Inferiority) আরোপ করার মধ্য দিয়ে বর্ণপ্রথা তথা জাতি ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে এই বর্ণপ্রথা বা জাতি ব্যবস্থাকে ভারতীয় জনমানসে ধীরে ধীরে দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ায় স্থাপন করা হয়ে ছিল। বিভিন্ন বৈশিষ্টের পার্থক্যর উপর ভিত্তি করে বৈষম্য সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে সামাজিক শোষণের বৈধতা স্থাপন করা ছিল এই ব্যাবস্থার মূল উপপাদ্য বিষয়। শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের অনেক দেশেই গাত্র বর্ণ (Skin Colour), বংশ পরিচয়, কর্ম, খাদ্যভ্যাস, জীবনশৈলী, বসতভূমি, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে, বিভিন্ন ভাবে সমাজে বিভেদ এবং মানবিক বৈষম্য (Injustice to Mankind) স্থাপনের ঘটনা পাওয়া যায়।

উদাহরণ হিসেবে আমেরিকার মতন প্রথম বিশ্বের দেশে অথবা দক্ষিণ আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়া মতন দেশে শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের প্রতি বৈষম্য ও শোষণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইহুদিদের প্রতি নাৎসী জার্মান বাহিনীর জাতিবাদী বিদ্বেষ প্রসূত নির্যাতন। মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গা (Rohingya) বিতাড়ন। এই ভাবে বিশ্বের প্রতিটি মহাদেশে সামাজিক পরিচিতির বৈষম্যের ফলে তৈরি হওয়া দ্বন্দ (Strife) এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইতিহাসের পাতায় এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াস দেখা গেছে। এর উদাহরণ

হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে সংগঠিত বর্ণ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই সকল প্রয়াস বা আন্দোলন বর্ণ বৈষম্য সমস্যার প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়ে ছিল। এরই সফল প্রয়াস হিসাবে ২০০১ সালের ৩১শে আগস্ট থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান শহরে জাতিগত বৈষম্য (Racial Discrimination) এর বিরুদ্ধে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সকল প্রকার সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য খসড়া নির্মিত হয়েছে।[১] পরবর্তীতে ২০১১ এবং ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ডারবান সম্মেলন ছিল বিশ্বের জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ প্রক্রিয়ার সদর্থক পদক্ষেপের অপর দুইটি সোপান।

ভারতের মত বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির দেশে, এই বর্ণ ও জাতি পরিচিতিগত বৈষম্যর বিষয়টি সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। এর পাশাপাশি এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা সংস্কার বা প্রতিরোধ আন্দোলন ইতিহাসের পাতায় এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে। প্রাচীন এবং মধ্যকালীন ভারতীয় ইতিহাসে বর্ণ বা জাতি ব্যবস্থার এই ধারা বজায় থাকলেও আধুনিক ভারতে এই সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও মানবতাবাদী দর্শনের প্রভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজ সংস্কারের অনুকূলে এই আবহ প্রস্তুত হয়ে ছিল।[২] এছাড়া ঔপনিবেশিক শাসক এবং গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতির ইতিহাসের পাশাপাশি বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার সূচনা হয়ে ছিল। পরবর্তীতে পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত সমাজ সংস্কারকদের হাত ধরে ভারতের বিভিন্ন অংশে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি বর্ণ ব্যবস্থা বিরোধী বা জাতি আন্দোলনের উত্থান হতে দেখা যায়। বাংলায় হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন

বা রেনেসাঁ হতে দেখা গেলেও বর্তমান মহারাষ্ট্রে জাতি ব্যবস্থার কঠোরতার বিরুদ্ধে প্রাথমিক বিরোধিতা বা সংস্কারের সূচনা হয়ে ছিল। পরবর্তীতে ভারতের বিভিন্ন অংশে জাতি আন্দোলনের উত্থান হতে দেখা যায়। এই রকম বর্ণ বৈষম্য বা জাতি ব্যবস্থার মত সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন জ্যোতিবা ফুলে (১১ই এপ্রিল, ১৮২৭-২৮শে নভেম্বর, ১৮৯০), থানান্তে পেরিয়ার ই. ভি. রামস্বামী (১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯-২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩), ড: বি.আর. আম্বেদকর (১৪ই এপ্রিল, ১৮৯১-৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬) প্রভৃতি সংস্কার মনস্ক ব্যক্তিত্বরা।

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত অবিভক্ত বাংলা (Bengal Province) এর বিভিন্ন প্রান্তিক তথা অবদমিত জাতির মধ্যে এই বর্ণ বা জাতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়ে ছিল। বাংলার এই সকল তপশিলি জাতি সমাজের গঠন, গতিময়তা বা পরিবর্তনশীলতার ধারা বিশ্লেষণের একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।[৩] এই ইতিহাস ভারতের তপশিলি জাতি চর্চায় এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে। ভারতীয় সংবিধানের তপশিল বা সরণি পঞ্জিতে পশ্চিমবঙ্গের ষাটটি সামাজিক ভাবে অবদমিত বা পশ্চাৎপদ (Backward) জাতির উল্লেখ আছে।[৪] তাদের মধ্যে রাজবংশী, নমঃশূদ্র, বাগদি, পৌন্ড্র, বাউরি, মালো, ধোপা প্রভৃতি অন্যতম।

বাংলায় সংগঠিত বিভিন্ন জাতি আন্দোলনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাজবংশী, নমঃশূদ্র, পৌন্ড্র প্রভৃতি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী উত্থান। বাংলার উত্তর অংশের জেলা গুলিতে রাজবংশী এবং দক্ষিণ অংশের জেলা সমূহে নমঃশূদ্র এবং পৌন্ড্র জাতির আন্দোলনে বাগদি, বাউরি, মালো, ধোপা, হাড়ি এবং অনান্য জাতিগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয়। রাজবংশী আন্দোলন উত্থানের প্রেক্ষাপটে ছিলেন রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা এবং উপেন্দ্রনাথ বর্মন।[৫] পৌন্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনের ছিলেন বেণীমাধব হালদার (১৮৫৮-১৯২৩), শ্রীমন্ত নস্কর (১৮৬৩-

১৯০৭), রাইচরন সরদার (১৮৭৬-১৯৪২), হেমচন্দ্র নস্কর (১৮৮৬-১৯৬০) প্রভৃতি।[৬] নদীয়া জেলায় বলরাম হাড়ির নেতৃত্বে হাড়ি জাতির আন্দোলন।[৭] অপরদিকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১) এর লেখনীর মাধ্যমে মালো জাতির আন্দোলনের কথা উঠে আসতে দেখা যায়।[৮]

অনুরুপভাবে হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা মতুয়া ধর্ম সংস্কার আন্দোলন তৎকালীন বঙ্গদেশের পূর্ব অংশের নমঃশূদ্র সহ অন্যান্য জাতির সামাজিক উত্থান বা আন্দোলনে সহায়ক হয়ে ছিল। এই আন্দোলন ছিল আধুনিক ভারতের বর্ণবাদ বা জাতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংঘটিত আন্দোলন সমূহের অন্যতম মাইল ফলক।

এই আন্দোলনের বিবরণ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বা রূপরেখা, 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত' ও 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত' নামক ধর্মীয় গ্রন্থ দুটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ধর্মীয় দর্শন স্বরূপ লিপিবদ্ধ গ্রন্থ দুইটি নমঃশূদ্র জাতিসহ সকল প্রান্তিক বা অবদমিত জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উত্থানে ও সার্বিক আগ্রগতির ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশ হিসেবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধারন করে চলেছে। নমঃশূদ্র সহ অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতির ওপর মতুয়া দর্শন তথা মতুয়াসংঘের এই প্রভাব, পরবর্তী বঙ্গরাজনীতি তথা জাতি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠে ছিল।

ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলায় জাতি চেতনা তথা জাতি আন্দোলনের যে উত্থান দেখা যায়, ১৯৪৭ সালের দেশভাগ এবং তার আনুষাঙ্গিক ঘটনা হিসেবে বাংলার বিভাজন এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই বিভাজন ভারতীয় উপমহাদেশের পাশাপাশি বাংলার জনবিন্যাস এবং ভূ-রাজনৈতিতে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। এর ফলে একদিকে দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তান নামক একটি নতুন রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। অপরদিকে ভারত সর্বধর্ম ও জাতি সমন্বয় নীতির উপর আস্থা বজায়

রেখে অগ্রসর হয় স্বাধীনতার দিকে। এই ঘটনা প্রবাহে বিভাজিত দুইটি ভুখন্ডে বসবাসকারী মানুষজনের কাছে জাতীয়তাবাদের এক নতুন সংজ্ঞা উদ্ভাসিত হয়।

ভারতের পূর্বপ্রান্তের বাংলা ও অসমের কিছু আংশ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম প্রান্তের পাঞ্জাবের কিছু অংশ ও কয়েকটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তান। রাতারাতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত পূর্ববাংলা ও ভারতের পশ্চিম অংশের প্রদেশ পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করা অঞ্চলে বসবাসকারী অনেক মানুষের কাছে আগের জাতীয় পরিচিতি (National Identity) সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। ফলত নব উদ্ভূত ইসলামি রাষ্ট্রে অন্য ধর্মের মানুষ বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ দেশহীনতা (S*tatelessness*) ও উদ্বাস্তুতার সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই দেশভাগ জনিত অভিবাসনের ফলে সংগঠিত জনবিন্যাসগত পরিবর্তন সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয় ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তর জুড়ে থাকা পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পূর্ব অংশের বাংলা ও আসাম প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে। ভারতের পূর্ব এবং পশ্চিম এই দুই প্রান্তের বিভাজন ঘটিত পরিস্থিতি উদ্ভূত উদ্বাস্তু (Forced Migration) প্রবাহের প্রকৃতি ও তৎসম্পর্কিত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের উদ্বাস্তুদের প্রতি এই বৈষম্যের বিষয়টি বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক গবেষণায় উঠে এসেছে। প্রকৃতিগত ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তু প্রবাহ ছিল অল্প সময়ে বিপুল মানুষের আগমন। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাস্তুচ্যুত মানুষের প্রবাহ ছিল অপেক্ষাকৃত ধীর গতির ক্রমাগত তরঙ্গের প্রবাহের মত, যা দীর্ঘ সময় ধরে চলেছে।

বাংলা বিভাজনের ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন অংশে চলে আসা মানুষের মধ্যে একটি বড় অংশ ছিল চতুর্থ বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

তাঁদের মধ্যে একটি বড় অংশ ছিল নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষ। এছাড়া ছিল রাজবংশী, পৌন্ড্র, বাগদি, মালো জাতির অন্তর্ভুক্ত কৃষি, মৎস্য শিকার প্রভৃতি বৃত্তি নির্ভর মানুষ।

বাস্তুচ্যুত এই অংশটি ছিল সামাজিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় বিন্যাসের নিম্নতম সরণিতে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠী। তাঁদের কাছে অভিবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম তথ্য ও পরিকাঠামো ছিল অধরা। এই কারণে সচ্ছল ও শিক্ষিত উচ্চবর্ণের অভিবাসন প্রক্রিয়া দেশভাগের প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু হলেও তথাকথিত নিম্নবর্ণিয় উদ্বাস্তু প্রবাহ দেখা যায় অপেক্ষাকৃত পরবর্তী পর্বে, যা দীর্ঘ সময় ব্যাপি ব্যাপ্ত হয়ে ছিল। এই পরিস্থিতি তাদেরকে নতুন পরিচিতি নির্মাণের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন অবদমিত গোষ্ঠীর মধ্যে জাতি চেতনা তথা জাতি রাজনীতির উত্থানের মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র জাতির পরিচিতি নির্মাণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক চর্চার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার বাইরে রয়ে গেছে।

অপরদিকে ১৯৪৭ সালের বাংলা বিভাজনের ফলে রাজনীতিতে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক পরিচিতি নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ছিল। মূলত বাংলা বিভাজনের ফলে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা উদ্বুদ্ধ রাজনৈতিক ক্ষেত্রটির সম্পূর্ণ অংশ তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান বা পরবর্তী বাংলাদেশের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল। এই ঘটনা ভারতীয় রাজনীতিতে তাদের গুরুত্ব ক্ষীণতম পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে এসেছিল।

এই নব উদ্ভূত পরিস্থিতি তাদের পূর্ববর্তী জাতি রাজনীতির ক্ষেত্রে যে পরিচিতি ছিল, তা থেকে বেরিয়ে এসে নতুনভাবে পরিচিতি নির্মাণের প্রেক্ষাপট নির্মাণ করে দিয়ে ছিল। প্রতিপাদ্য অধ্যায়ে ভারতীয় জাতি আন্দোলনে নমঃশূদ্র জাতির তুলনামূলক অবস্থান এবং পরবর্তীতে বাংলা বিভাজনের ফলে যেভাবে তাদের জাতি পরিচিতি তথা জাতি রাজনীতিতে নিজেদের পরিচিতি পুনর্নির্মাণের পটভূমি প্রস্তুত হয়ে ছিল, তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.২ ভারতে জাতি চেতনা থেকে জাতি আন্দোলন ও জাতি রাজনীতির উত্থান

১৭৮৩ সালের (Regulating Act 1773) পর থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভারতের ঔপনিবেশিক চরিত্র পরিবর্তন হতে শুরু করে। এরপর থেকে ভারতের মত বৈচিত্র্যময় সমাজ সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য এবং এই বিস্তৃত ভূখণ্ডকে সুসংহত ভাবে পরিচালনা করা জন্য ইংল্যান্ডের সরকার উদ্যোগী হয়ে উঠে ছিল। এই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ১৭৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি স্যার উইলিয়াম জোন্স (Sir William Jones) এর তত্ত্বাবধানে ব্রিটিশ ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ এবং সংস্কৃতিকে বোঝার প্রয়াস শুরু করা হয়।

এই প্রক্রিয়ারই অপর আরেকটি দিক ছিল ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার। কেমব্রিজ (Cambridge School) ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতীয় সভ্যতার প্রতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহানুভবতা এবং দায়বদ্ধতা হিসেবে দেখানো হয়।

অপরদিকে প্রাচ্যবাদী (Oriental School of History) ঐতিহাসিকদের মতে ভারতের মতন বিশাল ভূখণ্ডের শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল বা কর্মচারী ইংল্যান্ড সাম্রাজ্যের কাছে ছিল অপ্রতুল। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ভারতীয় সমাজের মধ্য থেকেই ইংরেজি শিক্ষিত কর্মচারী তৈরি করার প্রয়োজনে ভারতে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো শুরু হয়ে ছিল।

এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৮১৩ সালের সনদ আইন (The Charter Act of 1813) অনুসারে ভারতে শিক্ষা খাতে প্রতিবছর এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে ছিল। কিন্তু এই অর্থ ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা নাকি পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য

বরাদ্দ করা হবে এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়। অবশেষে ১৮২৩ সাল থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য এই অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা শুরু হয়।

ভারতের ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন একটি ইংরেজি শিক্ষিত কর্মচারী গোষ্ঠী তৈরি হওয়া শুরু হয়ে ছিল। অপরদিকে পাশ্চাত্য দর্শন, মূল্যবোধ এবং সামাজিক ন্যায়ের ধারণাও প্রসারিত হতে শুরু করে ছিল। যার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় রামমোহন রায়, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হেনরি ডিরোজিও প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকের উত্থানের মধ্যে দিয়ে।

এই সকল সমাজ সংস্কার বা রেনেসাঁ প্রক্রিয়ার কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার দূরীকরণের প্রয়াস পর্যন্ত। এই সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রাথমিক উৎসকেন্দ্র ছিল কলকাতা বা তৎকালীন Calcutta। পরবর্তীতে দেশের বিভিন্ন অংশে এই সংস্কার আন্দোলনের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছিল।

ভারতের বিভিন্ন অংশে সংগঠিত সমাজ সংস্কারের এই প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা যোগ করে ছিল বিভিন্ন ঔপনিবেশিক প্রশাসন এবং গবেষকদের বিভিন্ন প্রতিবেদন, আদমশুমারি (Census) ইত্যাদি।[৯] এই সকল প্রতিবেদনগুলোতে তাঁরা ভারতের বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সমস্যা তুলে ধরতে শুরু করেছিলেন। এই বিষয়গুলোর মধ্যে ভারতের বর্ণপ্রথা এবং জাতির অবস্থা ছিল অন্যতম।

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের পরিবর্তে সমাজের সকল শ্রেণি এবং বর্ণের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার দুয়ার উন্মুক্ত হওয়ার কারণে সমাজের এই অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষিত কিছু উচ্চবর্ণের পাশাপাশি তথাকথিত নিম্নবর্ণের সংস্কারকের উত্থান পরিলক্ষিত হয়।

১৮৬১ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে সি.ভি. রমন পিল্লাই, কে. রাধাকৃষ্ণান পিল্লাই, এম. পদ্মনাভন পিল্লাই এর নেতৃত্বে স্থানীয় নাম্বুরি ব্রাহ্মণ এবং তামিল এবং মারাঠি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে নায়ার আন্দোলন (Nair Movement) গড়ে ওঠে। সমাজের অর্থনৈতিক তথা সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে একাধিপত্যের বিরুদ্ধে এই জাতি আন্দোলন গড়ে উঠে ছিল।

পরবর্তীতে ১৮৯১ সালে সি.ভি. রমন পিল্লাই এর নেতৃত্বে মালায়ালাম মেমোরিয়াল গঠন করে সরকারি চাকরিতে ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের এই একাধিপত্যের বিরোধিতা শুরু হয়। ১৯৪১ সালে এম. পদ্মনাভন পিল্লাই-এর নেতৃত্বে 'নায়ার সার্ভিস সোসাইটি' স্থাপন করে নায়ার সমাজের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অগ্রগতির চেষ্টা চালিয়ে যান। সমাজের নির্দিষ্ট প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে এই আন্দোলন চলতে থাকে।

মহারাষ্ট্রে জ্যোতিবা গোবিন্দ রাও (গোড়ে) ফুলের নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলন ছিল বর্ণ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মাইলফলক। তিনি ছিলেন মালি সম্প্রদায়ের মানুষ। ফুল বিক্রি পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে তিনি ফুলে নামে পরিচিতি লাভ করেন। এই আন্দোলনে তিনি সমাজের অস্পৃশ্য, বিধবা এবং নিষ্পেষিত মানুষের প্রতি শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৮৭৩ সালে গড়ে ওঠা সংগঠন 'সত্যশোধক সমাজ' ভারতের বর্ণ তথা জাতি আন্দোলনের অভিমুখ পরিবর্তন করে দিয়ে ছিল।

এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি অস্পৃশ্যতা, অর্থনীতি এবং সামাজিক সম্মানের কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, অস্পৃশ্যতার কারণে এই জনগোষ্ঠীর উপার্জনে গভীর প্রভাব পড়ে এবং এই কারণে তৈরি হওয়া দারিদ্রতা তথা অসন্মান জনক সামাজিক পরিচিতি তাঁদের সামাজিক বৈষম্য মূলক আচরণের সম্মুখীন হতে বাধ্য করে।

তাঁর লেখা বিভিন্ন বই এর মাধ্যমে সমাজের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু করেন। তাঁর লেখা 'তৃতীয় রত্ন' (১৮৫৫), 'গোলামগিরি' (১৮৭৫), 'সার্বজনীন সত্যধর্ম পুস্তক' (১৮৯১) প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল এই প্রচেষ্টার অন্যতম নিদর্শন। তিনি আর্য আক্রমণ তত্ত্বের মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের বহিরাগত আর্য এবং শুদ্রদের ভারতের আদি নিবাসী বলে বর্ণনা করেছিলেন।

১৮৮৮ সালে শ্রী নারায়ণ গুরুর নেতৃত্বে কেরালায় এজভা (Ezhava) বা আরাভিপুরম (Aravipuram) আন্দোলন ছিল অপর একটি জাতি আন্দোলনের উদাহরণ। চতুর্থ বর্ণের মানুষের উপরে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিকল্প ধর্মীয় আদর্শ স্থাপনের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন শুরু হয়ে ছিল। ১৯০২ সালে নারায়ন গুরুর নেতৃত্বে স্থাপিত 'শ্রী নারায়ন ধর্ম প্রতিপালন' (SNDP) যোগম সংগঠনের মাধ্যমে সমাজের অবদমিত অংশের সংস্কারের জন্য এই আন্দোলন শুরু হয়ে ছিল। এই আন্দোলনের স্লোগান ছিল 'সকলের জন্য এক জাতি, এক ধর্ম, এক ঈশ্বর।' (One Caste, One Religion, One God for All Men.)

উনিশ শতকের শেষের দিকে তামিলনাড়ুর রামানন্দ জেলায় কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত সানন জাতির মানুষ সামাজিক সম্মান আদায়ের জন্য নাদার আন্দোলন (Nadar Movement) শুরু করেন। ১৯১০ সালে তাঁরা 'নাদার মহাজনসংঘ' গঠন করে উচ্চবর্ণের বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান অনুকরণের মধ্য দিয়ে সামাজিক সম্মান আদায় করার প্রয়াস করতে থাকেন।

১৯১৬ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সকল অবদমিত জাতি (Depressed Class) এর জন্য একটি সার্বজনীন মঞ্চ নির্মাণের উদ্যোগ দেখা যায়। ডক্টর. সি.এন. মুদালাই, পি. থেয়াগারায়া চেট্টি, টি.এম. নায়ার প্রভৃতি নেতার উদ্যোগে 'সাউথ ইন্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশন' (South Indian Liberal Federation) রাজনৈতিক দলটি নির্মাণের মধ্য

দিয়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে অবদমিত জাতির জন্য সরকারি চাকরির সংরক্ষণের সুবিধার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন ভারতের জাস্টিস পার্টি আন্দোলন নামে অধিক পরিচিত।

১৯২৫ সালে ইভি রামস্বামী নায়িকার বা পেরিয়ার (১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯- ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৩) এর নেতৃত্বে তামিলনাড়ুতে 'Self-Respect' আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বিভিন্ন সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে অবদমিত জাতিগুলির সামাজিক সম্মান আদায় করা ছিল এই আন্দোলনের মূল উপজীব্য বিষয়। এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য তিনি ১৯২৫ সালে 'কুদি আরসু' পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে জনজাগরনের প্রক্রিয়া শুরু করেন।

মহারাষ্ট্রে মাহার জাতির উত্থান ভারতীয় বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে ছিল। এই মহার আন্দোলনের প্রথম নেতাদের মধ্যে গোপাল বাবা বলংকর (Gopal Baba Walangkar) ছিলেন অন্যতম। তিনি জ্যোতিবা ফুলের আর্য অনার্য জাতি তত্ত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি ১৮৮৮ সালে 'বৈতাল বিধ্বংসক' (Vital Vidhvansak or Destroyer of Brahmanical or Ceremonial Pollution) নামক মাসিক পত্রিকায় বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লেখা শুরু করেন।

এছাড়া 'শূদ্রক' এবং 'দিন বন্ধু'' নামক দুটি মারাঠি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেছিলেন। মাহার আন্দোলনের অপর একজন নেতা ছিলেন কিষণ বানসোডে (Kisan Bansode)। তাঁর আন্দোলন পদ্ধতি ছিল ভক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অস্পৃশ্যতা থেকে সামাজিক ঊর্ধ্ব গমন।

পরবর্তীতে ভীমরাও রামজি আম্বেদকর (১৪ই এপ্রিল ১৮৯১–৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৬) এর নেতৃত্বে মাহার সহ ভারতের সকল জাতি আন্দোলন আঞ্চলিকতার গণ্ডী পেরিয়ে সর্বভারতীয় বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৯২৩ সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি

ধীরে ধীরে বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকেন। ১৯২৪ সালে তৎকালীন বোম্বেতে মাহারদের পাশাপাশি মাতঙ্গ এবং চামারদের জন্য 'বহিস্কৃতি হিতকারিণী সভা' (Bahiskrit Hitkarini Sabha) গঠন করে নিষ্পেষিত জাতি গুলির জন্য ঐক্য মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে তিনি ভারতের সকল অবদমিত জাতির আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠেন।

তাঁর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতের নিষ্পেষিত জাতি আন্দোলন একটি ছাতার তলায় একত্রিত হয়ে বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের রূপ ধারণ করে ছিল। তাঁর নেতৃত্বে শূদ্রদের মন্দিরে প্রবেশ, ঘাট থেকে জল তোলার বিধি নিষেধ প্রভৃতি বৈষম্যমূলক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তিনি জাতি বৈষম্য ব্যবস্থার অবসানের জন্য, প্রয়োজনে ইংরেজ সরকারের সহায়তা গ্রহণ করার পক্ষপাতি ছিলেন। ইংরেজ সরকারের তত্ত্বাবধানে ১৯৩০ সালের নভেম্বর থেকে ১২৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসের অন্তর্বর্তী কালীন সময়ে ভারতীয় সংবিধান সংস্কারের জন্য ভারতের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে তিনটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এই বৈঠকে আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রতিটি স্বতন্ত্র জাতির জন্য পৃথক নির্বাচন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভারতের নিষ্পেষিত বা অবদমিত জাতির প্রতিনিধি হিসেবে ড. ভীমরাও আম্বেদকর তপশিলি জাতির জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা (The Communal Award, 16 August 1932) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তপশিলি জাতির জন্য পৃথক নির্বাচনের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এর বিরোধিতায় গান্ধীজী আমরণ অনশন শুরু করলে, সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। অবশেষে পুনা চুক্তি (Poona Pact, September 24, 1932)) এর মধ্য দিয়ে তপশিলি

জাতির জন্য সংরক্ষণ প্রদানের সুরাহার মাধ্যমে তপশিলি জাতির জন্য পৃথক নির্বাচন রদ করা হয়।

পরবর্তীতে গান্ধীজী নিষ্পেষিত জাতির জন্য 'হরিজন সেবক সংঘ' (Harijan Sevak Sangh, September 30, 1932) প্রতিষ্ঠা করে তাদের উন্নয়নের প্রয়াস শুরু করেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে তিনি সমাজের উচ্চবর্ণের হৃদয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তথাকথিত নিম্নবর্ণের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাকে উন্নীত করার পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি হরিজন কথার মধ্য দিয়ে নিষ্পেষিত জাতির মানুষকে ঈশ্বরের সন্তান (Children of God) বলে উল্লেখ করতে চেয়েছেন।

ড. বি.আর. আম্বেদকর এই মতের পরিপন্থী ছিলেন। তিনি মনে করতেন উচ্চবর্ণের মানুষের মনে চতুর্থ বর্ণের জাতির প্রতি যে আধিপত্য বিস্তার (Hegemony) করার প্রবণতা আছে, তাঁরা তা কখনোই বর্জন করতে পারবে না। হিন্দু সমাজে প্রচলিত জাতি বৈষম্যের সঙ্গে লড়াই করার উপায় হিসেবে ১৯৩৫ সালে জাতি ব্যবস্থার অবলুপ্তি (Annihilation of Caste) নামক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। আজীবন জাতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পর তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই প্রক্রিয়ায় ড. আম্বেদকরের কিছু অনুগামী তাঁকে অনুসরণ করলেও ধর্ম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিষ্পেষিত জাতির মানুষের সর্বত সমর্থন পরিলক্ষিত হয়নি।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্ভূত এই সকল জাতি আন্দোলনের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য এবং বিধি-বিধানের বিরোধিতা, শিক্ষা সংস্কার, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, সামাজিক সংস্কার প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে ধর্মীয় সংস্কার তথা উচ্চ বর্ণীয় আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক অবস্থানের তথাকথিত ঊর্ধ্ব গমনের প্রয়াস

অনুধাবন করা গেছে। এই সকল প্রক্রিয়ায় প্রতিটি জাতি আন্দোলনের চেতনার উত্থানের পেছনে পাশ্চাত্য ন্যায়ের ধারণার পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন এবং গণমাধ্যম প্রকাশনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়েছে।

২.৩ বঙ্গপ্রদেশে জাতি চেতনা ও জাতি রাজনীতিতে নমঃশূদ্র

তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মত বঙ্গপ্রদেশেও (Bengal Province) জাতি আন্দোলনের উন্মেষ দেখা যায়। ঔপনিবেশিক বাংলায় রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা ও উপেন্দ্রনাথ বর্মনের নেতৃত্বে রাজবংশী জাতির উত্থান, পৌন্ড্রক্ষত্রিয় জনসমাজের উত্থানে বেণীমাধব হালদার, শ্রীমন্ত নস্কর, রাইচরণ সরদারের নেতৃত্বে জাতি আন্দোলন, অদ্বৈত মল্লবর্মণের লেখায় মালো জাতি চেতনার বহিঃপ্রকাশ, বলরাম হাড়ির নেতৃত্বে, হাড়ি সমাজের আন্দোলন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কার ও উচ্চবর্ণ আরোপিত নিয়ম, নীতি ও অসন্মান জনক সামাজিক অবস্থানের বিরুদ্ধে জনমত ও সচেতনতা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া সামনে আসতে থাকে।[১০] অনুরূপভাবে, বাংলায় জাতি আন্দোলনের ইতিহাসের অন্যতম অধ্যায় হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র জাতি আন্দোলন উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে।

১৯৪৭ পূর্ববর্তী নমঃশূদ্র জাতির এই চেতনা ও উত্থানের ইতিহাস আলোচনার সুবিধার্থে দুটি পর্বে বিভাজন করা সম্ভব। প্রথম পর্বে হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর সুযোগ্য সন্তান গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা ও আন্দোলনের উন্মেষ (১৯৩৭)। দ্বিতীয় পর্বে গুরুচাঁদ ঠাকুর পরবর্তী সময়ে, ১৯৪৭ এর বাংলা তথা ভারত ভাগের কাল পর্যন্ত নমঃশূদ্র জাতি চেতনার নতুন ধারা পরিলক্ষিত হয়।

২.৩.২ প্রথম পর্ব: হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা ও আন্দোলনের উন্মেষ (১৮১২-১৯৩৭)

হরিচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে উত্থানের আগে পর্যন্ত কৃষি কার্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই নমঃশূদ্র জাতি অবিভক্ত বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশের বিস্তীর্ণ জলা জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিপুল সংখ্যায় বসবাস করত। জনগোষ্ঠীটি শিক্ষা বা আধুনিকতার আলোক থেকে দূরে, অসংগঠিত কৌমগোষ্ঠী রূপে, সমাজের অসন্মান জনক বর্ণগত স্থানে, জলা-চল জাতি বা অ-বর্ণ জাতি হিসেবে অবস্থান করে ছিল।

প্রাথমিকভাবে ঔপনিবেশিক তৎপরতায় ভারতের অন্য সকল নিষ্পেষিত জাতির মত বাংলার চণ্ডাল তথা নমঃশূদ্র জাতির বিষয়টি শিক্ষায়তনিক আলোচনায় উঠে আসতে শুরু করে। ব্রিটিশ প্রশাসকদের উদ্যোগে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সামাজিক ন্যায়ের অধিকার পাওয়ার ফলে, ভারতের অন্যান্য সকল পশ্চাৎপদ জাতির পাশাপাশি নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে আত্মচেতনার উন্মেষ দেখা দেয়। এই চেতনা তাঁদের সমাজ সংস্কার তথা সামাজিক ঊর্ধ্ব গমনের পথে পরিচালিত করে ছিল। একই সময়, এই সকল পশ্চাৎপদ জাতির মধ্যে থেকে নেতৃত্ব স্থানীয় মানুষের উত্থান হতে দেখাযায়, যারা এই জাতি সংস্কার বা আন্দোলনের অগ্রগতির পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

নমঃশূদ্র জাতির ক্ষেত্রে হরিচাঁদ ঠাকুরের (১৮১২-১৮৭৮) মত সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং ভবিষ্যৎ প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির হাত ধরে, এই জাতির চেতনার বিকাশ এবং সামাজিক উত্থানের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়ে ছিল। তিনি ১৮১২ সালে ১১ই মার্চ পরাধীন ভারতে বাংলা প্রদেশের দক্ষিন-পূর্ব প্রান্তের ফরিদপুর জেলায় অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা ডিভিশনের গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলা অন্তর্গত সফলীডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১১] হরিচাঁদ ঠাকুরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং বাণী কবি শ্রী তারকনাথ গোসাই রচিত ‘শ্রীশ্রী

হরিলীলামৃত' গ্রন্থে, শ্রী বিচরণ পাগল গোসাই রচিত 'শ্রীশ্রীহরিলীলা রসামৃত' এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের কলমে উঠে এসেছে।

আধ্যাত্বিক আবহে লেখা উপরিউক্ত গ্রন্থদ্বয়ের বিবরণ অতিপ্রাকৃতিক ভক্তি রসের পাশাপাশি মতুয়া ধর্মকে অবলম্বন করে, নমঃশূদ্র তথা পূর্ব বাংলার সর্বধর্ম নির্বিশেষে প্রান্তিক ও নিষ্পেষিত মানব সমাজের প্রতিবাদ স্পর্ধা তথা জাগরনের আকর দলিল। সে ক্ষেত্রে, এই উপাদান বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের প্রতিপাদ্য উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

হরিচাঁদ ঠাকুর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চেতনার সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থানকারী হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণ বহির্ভূত জলা-চল চন্ডাল (নমঃশূদ্র) এবং অন্যান্য নিষ্পেষিত জাতির উন্মেষের পথ নির্দেশিকা প্রদান করেছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে কর্মসাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে নমঃশূদ্র জাতির চেতনতার উন্মেষ হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়।

এর প্রথম সোপান হিসেবে কৃষিকর্ম সংস্কৃতির সংস্কারকে উল্লেখ করা যায়। তিনি 'আপনি আচরি বিধি সবারে শেখায়' নীতি অনুসরণ করে সকলকে উৎসাহিত করার জন্য নিজেই অনাবাদি জমি চাষ করা শুরু করেন। অকর্ষিত পতিত জমিতে ফসল ফলিয়ে আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি উদ্বৃত্ত উৎপাদনের মাধ্যমে তিনি আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির পথ প্রদর্শন করেন।[১২]

এইভাবে তিনি সকলকে আশেপাশের পতিত বা জলা-জঙ্গলাকীর্ণ জমি আবাদ করে ফসল ফলাতে উৎসাহিত করে তোলেন। যার ফলস্বরূপ নমঃশূদ্র জাতির মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় যায়। শ্রীশ্রীহরিলীলা রসামৃত গ্রন্থে

উল্লেখিত এই তথ্যের সমর্থনে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে পতিত জমি সরকারি শুল্ক (Tex) এর আওতায় আসতে শুরু করে।[১৩]

এই পদ্ধতি সফল হওয়ার ফলে হরিচাঁদ ঠাকুরের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এর পাশাপাশি নিষ্পেষিত জাতিগুলির আশার আলো প্রজ্বলনকারী হরিচাঁদের নামে দৈবিক শক্তি আবেশের মহিমাও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। অচিরেই তিনি আধ্যাত্বিক ও সামাজিক সংস্কারের নেতার স্থানে আসীন হয়ে পড়েন। এর পর তাঁর নেতৃত্বে শুরু হয় বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার এবং সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

তিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব প্রদান করতেন, এইরকম একটি প্রতিবাদের উদাহরণ পাওয়া যায় ১৮৩০ সালে জন ডিক সাহেবের কুটি অভিযানের মধ্য দিয়ে। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়ার ফলে সরকার এবং রায়তের মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার, যোতদার, নায়েব, গোমস্তা শ্রেণীর উদ্ভব হয়। যার ফলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষকরা জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর অত্যাচারের কবলে পড়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী বঙ্গদেশের ভূমি রাজস্ব নির্ধারিত হয় দুই কোটি আটষট্টি হাজার টাকা কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার যোতদার, এর তিনগুণ রাজস্ব আদায় করতেন কৃষকদের কাছ থেকে।

এরকম পরিস্থিতির শিকার হয়ে এক সময় জমিদার সূর্যমনি মজুমদার কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর সপরিবারে তাঁর জন্মভিটা সফলিদাঙ্গা ত্যাগ করে ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দী গ্রামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই ঘটনা তৎকালীন জমিদারি ব্যবস্থার রায়ত চাষীর প্রতি কর আদায়ের জন্য নিত্যনৈমিত্তিক অত্যাচারের উদাহরণ ছিল।

পরবর্তীতে তিনি জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ঐ অঞ্চলের কৃষক, ধোপা, জেলে, মালি প্রভৃতি নিম্নবর্ণের সকল মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে

তোলেন। এই রকম উদাহরণ পাওয়া যায় ১৮৩০ সালের পদ্মবিলা গ্রামের একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে। হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুগামী দশরথ বিশ্বাস এই গ্রামে ধর্মসভার আয়োজন করার কারণে নায়েবের অত্যাচারের মুখে পড়েন।[১৪] এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে হরিচাঁদ মহিলা কাছারি বা গ্রমীন বিচার সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিচার সভায় একজন নারীকে বিচারপতির আসনে আসীন করে, সালিশির মাধ্যমে নায়েবের শাস্তি বিধান করেন।[১৫]

ভারতের মতন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, এই অভিনব বিচারের কথা শুনে জোনাসুরের নীলকর জন ডিক সাহেব হরিচাঁদ ঠাকুরকে দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর, তাঁর সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তি প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে প্রায় ৫০০ অনুগামী নিয়ে নীলকর সাহেবের সাথে দেখা করতে যান। এই রকম ঘটনা প্রবাহে হরিচাঁদ ঠাকুরের নামডাক ও নেতৃত্ব করার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই ভাবে হরিচাঁদ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন।

অতঃপর ১৮৬০ সালে ওড়াকান্দিতে হরিচাঁদ ঠাকুর 'মতুয়া ধর্ম' প্রতিষ্ঠা করেন, যা ছিল একাধারে আধ্যাত্বিক চেতনার সংগঠন অপরদিকে সমাজের নিম্ন স্তরে থাকা সকল নিষ্পেষিত মানুষের একজোট হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঐক্যমঞ্চ। আপাত দৃষ্টিতে ধর্মীয় সংগঠনটি অচিরেই সামাজিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে সমাজের অবহেলিত মানুষের জন্য সুদুরপ্রসারি সংগ্রামের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ভিত্তি হিসেবে 'মতুয়াসঙ্ঘ' স্থাপন করেন। পরবর্তীতে নমঃশূদ্র তথা পশ্চাৎপদ জাতিগুলির সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনের অবলম্বন হিসেবে সংগঠনটির উত্থান হতে থাকে।

মতুয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠান ছাড়াও তিনি বিভিন্ন নিয়ম ও নির্দেশের মধ্য দিয়ে সামাজিক সংস্কার ও ভবিষ্যত আন্দোলনের পথনির্দেশ (Guide Line) তৈরি করে দিয়ে যান। এই নির্দেশগুলি বারোটি নির্দেশ বা দ্বাদশআজ্ঞা নামে পরিচিত।[১৬] এই নির্দেশ সমূহের মূল কথা হলো

প্রথমত: সদা সত্য কথা বলা। দ্বিতীয়ত: নারীর প্রতি সম্মান এবং পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে সম্মান করা। তৃতীয়ত: পিতা-মাতাকে প্রধান গুরু হিসেবে সম্মান করা। চতুর্থত: জগতে সবাইকে ভালোবাসার বা সৌহার্দের দৃষ্টিতে দেখা। পঞ্চমত: সকল মানুষকে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমান চোখে দেখ। ষষ্ঠত: আধ্যাত্মিক উন্নতির পথের প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ ছয়টি রিপু দমন করে আদর্শ সংসারী হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সপ্তমত: পৃথিবীর সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অষ্টম আজ্ঞাটি ছিল সামাজিক ঊর্ধ্বগমনতার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ। এখানে 'হাতে কাম মুখে নাম' অর্থাৎ কর্মে নিষ্ঠা ও ঈশ্বরের প্রতি মন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। নবমত: বাহ্যিক আড়ম্বর ত্যাগ করে অন্তর থেকে শুদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। দশমত: প্রতিটি মতুয়া ভক্তের বাড়িতে হরি মন্দির প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একাদশতমে: হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে ভক্তকে পূর্ণ সমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বাদশ আজ্ঞায়: নিত্য প্রার্থনার বিধান দেওয়া হয়েছে। উপরিউক্ত নির্দেশে মানবিক গুন বিকশিত করার মাধ্যমে সুসমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে আত্মচেতনার উন্নতির পাশাপাশি জাতি চেতনা ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়াটি লক্ষণীয়। এছাড়া তিনি সমাজ, শিক্ষা, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা সংস্কারের সূচনা করেন।

হরিচাঁদ ঠাকুরের সমাজ সংস্কার তথা জাতি চেতনার আন্দোলনকে তাঁর উত্তরাধিকারী গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৭-১৯৩৭) আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ (১২৫৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমা) জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করার পর, বর্ণবাদী পণ্ডিতদের অসহযোগিতার কারণে মক্তব বা মাদ্রাসায় তাঁর পরবর্তী উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া নিয়ে মুসলমান

সমাজেরও কেউ কেউ আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের কঠোর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রতিরোধের কাছে, সেই আপত্তি ছিল খুবই নগণ্য।

তৎকালীন সময়ে ১৮৮২ সালে ঔপনিবেশিক বাংলায় ব্রিটিশ শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ডাবলু.ডাবলু. হান্টারের ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে প্রতিবেদনে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতার কথা জানা যায়। তিনি বাংলা শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্নবর্ণের শিশুদের স্কুল ভর্তির সামাজিক ও ধর্মীয় বাধা-নিষেধের বিবরণ দিয়েছেন। নিম্নবর্ণের শিশুরা কেবল আলাদা মাদুরে উচ্চবর্ণের শিশুদের স্পর্শ বাঁচিয়ে স্কুলে বসতে পারত, যাতে কেউ কলুষিত না হয়। উচ্চবর্ণের শিশুরা নিম্নজাতের শিশুদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করুক, এটা উচ্চবর্ণের অভিভাবকরা চাইতেন না।[১৭]

গুরুচাঁদ ঠাকুর সর্বাগ্রে শিক্ষার অগ্রগতির দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। এমন সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের শুরু করেন ১৮৮০ সালে নিজের বাড়িতে প্রথম সকল নিম্নবর্ণীয় শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠশালা গড়েতোলার মাধ্যমে। তাঁর পুত্র শশিভূষন ঠাকুর ও রঘুনাথ পন্ডিত এই পাঠশালার শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। জাতি চেতনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে খুলনার দত্তডাঙ্গার ঈশ্বর গাইনের বাড়িতে অবিভক্ত বঙ্গদেশের প্রায় পাঁচ হাজার প্রতিনিধি সমন্বিত সভার সভাপতি হিসেবে গুরুচাঁদ ঠাকুর সকল পিছিয়ে পড়া জাতির অগ্রসরের হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষা প্রসারের গুরুত্ব সম্পর্কে এক দীর্ঘ ভাষন দেন। তিনি বলেন- "বিদ্যা ধর্ম, বিদ্যা কর্ম, বিদ্যা সর্বসার। বিদ্যাবিনা, মানবের, গতি নাই আর।" তিনি জাতির অগ্রগতির প্রয়োজনে পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে খুলনা শহরে নমঃশূদ্র কল্যাণ সংঘ বা Namasudra Welfare Association গঠিত হয়। সংগঠনটিতে তৎকালীন ২২টি জেলার

প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মেলনের পর শিক্ষা অভিযানের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে এই সংগঠনের কর্মী বৃন্দ নিরন্তর প্রচার চালাতে থাকে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগে তাঁর অনুগামীরা জেলায় জেলায় স্কুল তৈরি করা শুরু করেন। খ্রিস্টান ধর্মযাজক সি.এস. মীডের সহযোগিতায় ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে ওড়াকান্দী মীড (M.E.) হাইস্কুল ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে উন্নীত হয়। নারী শিক্ষাকে আন্দোলনে সঙ্গে যুক্ত করে নিজ বাসভবনে শান্তি-সত্যভামা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যা, সামাজিক চেতনাকে নতুন উচ্চতা প্রদান করেন।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা প্রসারের ডাকে সাড়া দিয়ে পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র তথা সকল সামাজিক নিষ্পেষিত জাতির উদ্যোগে স্কুল গঠন হতে শুরু হয়। বাড়ির দাওয়াখানা, ঘরের বারান্দা, গাছতলা সর্বত্র ন্যূনতম একজন শিক্ষক জোগাড় হলেই স্কুল শুরু করা হয়।[১৮] ধীরে ধীরে এই শিক্ষা আন্দোলন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মাহিষ্য, কপালী, তেলী, মালী, কুম্ভকার, যাদব প্রভৃতি সকল পশ্চাৎপদ জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষা ও জাগরণের এই সম্মেলনের পর, সর্বত্র সর্বশিক্ষা অভিযানের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে। এসময় সমগ্র বঙ্গে এক হাজারের উপর বিদ্যালয় (পাঠশালা) প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৯] ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে বিভাগের কমিশনার স্যামুয়েল ন্যাথন সাহেবের নিকট গুরুচাঁদ ঠাকুর শিক্ষা, ছাত্রাবাস ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য দাবী পেশ করেন।

এই উদ্যোগের ফলে নিম্নবর্ণের মধ্যে শিক্ষার হার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ফলস্বরুপ ১৯০১ সালে ৩.৩%, ১৯১১ সালে ৪.৯২%, ১৯২১ সালে ৭.৫০%, ১৯৩১ সালে ২১.০২% হারে, নমঃশূদ্র জাতির শিক্ষার বৃদ্ধি হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়।[২০] শিক্ষা আন্দোলন প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নমঃশূদ্র তথা সকল পশ্চাদপদ জাতি থেকে শিক্ষিত মানুষ উঠে আসতে থাকে। শিক্ষা আন্দোলনের পাশাপাশি সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ও সংরক্ষণের দাবি উঠতে শুরু করে।

সি.এস. মীডের পরামর্শে ছোটলাট স্যার ল্যান্সলট হেয়ারের কাছে নমঃশূদ্র তথা নিম্নবর্ণের জন্য উচ্চপদের সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের দাবি পেশ করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য (ভীষ্মদেব দাশ, শশীভূষণ ঠাকুর, তারিণীচরণ বালা, রাধা মোহন বিশ্বাস, পূর্ণ চন্দ্র মল্লিক) বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল এই মর্মে ছোটলাটের সাথে দেখা করেন।

এর ফলশ্রুতিতে শশীভূষণ ঠাকুর সাব রেজিস্ট্রার, তারিণীচরণ বালা সরকারি ডাক্তার, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত হন। এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।[২১] ১৯১১ সালে নমঃশূদ্র জাতির তিনজন প্রশাসনিক উচ্চপদে চাকরিরত ছিলেন, ৩০ জন সরকারি সনদ প্রাপ্ত আধিকারিক এবং ১১২ জন ডাক্তার শিক্ষক উকিল প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত হন।[২২] ১৯৩১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭ জন উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক, ৭৬৭ জন সনদপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং ৪২৬ জন ডাক্তার উকিল শিক্ষক প্রভৃতি।[২৩]

শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নমঃশূদ্র জাতির চেতনা মূলক লেখার উদ্যোগ শুরু হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য খুলনা থেকে স্কুল শিক্ষক রাসবিহারী রায়ের পত্রিকা ‘নমঃশূদ্র দর্পণ’। তিনি নিজ উদ্যোগে পত্রিকা ছাপিয়ে খুলনা, যশোর, ২৪ পরগনা, হুগলি অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে নিজের পত্রিকা বিক্রি করতেন।[২৪] ১৯১১ সালে বরিশালের স্বরূপকাঠির মালহার গ্রাম থেকে শশী কুমার বাড়ৈবিশ্বাস সম্পাদিত ‘নমঃশূদ্র জাতিতত্ত্ব’, ১৯১১ ফরিদপুর জেলার উলপুরের বোলতলি হাই স্কুলের শিক্ষক বলরাম সরকার সম্পাদিত ‘নমঃশূদ্র জ্ঞান ভান্ডার’[২৫] ১৯১২ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুরের উদ্যোগে সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'নমঃশূদ্র সুহৃদ' পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়।[২৬] ১৯১৩ যশোর জেলার জ্ঞানেন্দ্র নাথ মজুমদারের ‘নমঃশূদ্র

চন্দ্রিকা' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি করার সোপান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।[২৭]

সাক্ষরতার মাধ্যমে চেতনার বৃদ্ধির প্রকাশ হিসেবে পত্রপত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি সভা-সমিতি ও সংগঠন জাতি চেতনা বৃদ্ধির পরিমাপক রূপে গন্য করা যায়। ১৮৮১ সালে খুলনা জেলার মোল্লারহাট থানার দত্ত ডাঙ্গা গ্রামে নমঃশূদ্র জমিদার ঈশ্বর গায়েনের বাড়িতে, যে সভার আয়োজন করা হয়ে ছিল। তা নমঃশূদ্র সমাজে 'উত্তোলনী সভা' নামে পরিচিত।[২৮] এই সভা আয়োজিত হত নমঃশূদ্র তথা নিম্নবর্ণের মতুয়াপন্থী সচ্ছল গৃহস্থের সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে। একদিকে সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হত এবং অপরদিকে নমঃশূদ্র তথা সকল পশ্চাৎপদ জাতির উত্থানের জন্য আলোচনা ও নীতি নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া পরিচালিত হতো।[২৯]

১৮৮১ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের জেলাগুলোতে ক্রমাগত 'উত্তোলনী সভা' আয়োজিত হয়েছে। ১৯১০ সালে খুলনার অবস্থাপন্ন নমঃশূদ্র জাতির রামচরণ পোদ্দারের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত 'উত্তোলনী সভায় সি.এস. মীড উপস্থিত ছিলেন।[৩০] উক্ত কালপর্বে সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘটিত আন্দোলন ও প্রতিবাদের আলোচনা এবং নীতিনির্ধারণে উত্তোলনী সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছিল।

ইতি পূর্বেই নমঃশূদ্র জাতি আন্দোলন সাংগঠিত হতে দেখা যায়। যেমন, ১৮৭২ সালে ফরিদপুরের এস.পি কর্তৃক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ১৮৭৩ সালে ১৮ মার্চে পেশ করা জুডিশিয়াল রিপোর্টে। এই রিপোর্টে ১৮৭২ সালে বাখরগঞ্জের আমগ্রামে একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। চণ্ডাল (নমঃশূদ্র) জাতির মোড়ল কায়স্থ পড়শিকে মায়ের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের নেমন্তন্ন করেন, ঐ কায়স্থ পড়শি নিচু জাতির নেমন্তন্ন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। প্রত্যাখ্যাত ও

অপমানিত হয়ে গ্রামে সালিশি ডেকে সকলের সামনে এই ঘটনার কথা বর্ণনা করলে নমঃশূদ্র সমাজে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

এর প্রতিবাদে তারা ফরিদপুর বাখরগঞ্জে এলাকা জুড়ে উচ্চ বর্ণের সকল কাজ কর্ম বয়কট শুরু করেন। জেলে ও সরকারি দফতরে নিম্ন পদস্থ কর্মচারী ও সাফাই কর্মী হিসেবে কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করা হয়। তাঁদের দাবি ছিল, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে তাঁদের সমান সন্মান দিতে হবে। এই বয়কট ও আন্দোলন ছয় মাসের অধিক সময় ধরে চলেছিল।[৩১]

পরাধীন ভারতে বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষেত্রে ফরিদপুর বাখরগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সংঘটিত বয়কট আন্দোলন নমঃশূদ্র তথা জাতি আন্দোলনে একতা, আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা এবং আন্দোলন পরিচালনা করার সামর্থ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টান পাদ্রী ডাঃ সি.এস. মীড গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে সামিল হন। তাঁর সহযোগিতায় জেলখানার সাফাই কর্মী কর্ম থেকে নমঃশুদ্র মানুষকে আইনগতভাবে মুক্ত করা হয়।

১৮৮০ সালে এই রকমই একটা আন্দোলন যশোর জেলার নড়াইল মহকুমায় সংঘটিত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। যশোর জেলার শাসক এফ. পিককের চিঠিতে, তিনি ১৮৮০-৮১ সালের প্রেসিডেন্সি বিভাগের বার্ষিক প্রশাসনিক রিপোর্টে জানান সামাজিক মর্যাদার জন্য নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর আন্দোলনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে।[৩২] উত্তোলনী সভা পরিচালিত একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের উদাহরণ পাওয়া যায়, নমঃশূদ্র জাতির নাম পরিবর্তনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

১৮৭২ সালে এইচ. বেভারলির তত্ত্বাবধানে সর্বভারতীয় আদমশুমারি শুরু হয়। প্রতিবেদনটিতে নমঃশূদ্র জাতিকে চন্ডাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ১৯০৮ সালে যশোর জেলার Gazatteer এ S.S.O'malley লিখেছেন যে, যশোর জেলার এই জনগোষ্ঠী

স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজেদেরকে 'নমো' পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। অতএব আদমশুমারির প্রতিবেদনে 'চন্ডাল' লেখা থাকায়, নমঃশূদ্র সমাজ থেকে প্রতিবাদ উঠতে শুরু করে। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। ১৮৮১ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুরের সভাপতিত্বে খুলনার দত্তভাঙায় নমঃশূদ্র সম্মেলন থেকে। এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, 'চণ্ডাল' নয়, তাঁরা নমঃশূদ্র নামেই নিজেদের পরিচয় চান।

১৮৮৩ সালে বর্তমান আসামের সিলেট জেলার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ডাবলু.সি. ম্যাকফারসন সিলেট জেলা নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর গণ ডেপুটেশনের পর একটি নোটিশ জারি করেন। এই নোটিশ অনুযায়ী সকল কোর্ট এবং সরকারি কাগজপত্রে 'চন্ডাল' কথাটির পরিবর্তে 'নমঃশূদ্র' লেখার আদেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশের অন্যথা হলে, অমান্য কারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছেলেন।

এরপর ১৮৯১ সালের এপ্রিল ও আগস্ট মাসে ওড়াকান্দি এবং গোপালগঞ্জ এই দুই জায়গা থেকে পরিবর্তনের আর্জি করে, স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ১৮৯৫ সালে আসামের কাছাড় জেলায় আন্দোলনের ফলে, চিফ কমিশনার সকল সরকারি দলিল দস্তাবেজ এবং নথিপত্রে 'নমঃশূদ্র' লেখার নির্দেশ জারি করেন।[৩৩] এছাড়া ১৯১০ সালের নদিয়া জেলার নমঃশূদ্ররা 'চন্ডাল' নামকরণের কারণে বিক্ষোভ দেখিয়ে ছিলেন, তার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৪]

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল কমিটি কর্তৃক দেওয়া স্মারকলিপি, বিক্ষোভ ও আন্দোলন এর ফলে ১৯০১ সালে ২৭৯৬ নং সনদ দ্বারা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি সকল জায়গায়, এই জাতিকে নমঃশূদ্র লেখার আদেশ জারি করে। তবুও ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে নমঃশূদ্র [চন্ডাল] লেখা হয়। অর্থাৎ সরকারিভাবে সনদপত্র পাস হলেও কার্যক্ষেত্রে নমঃশূদ্র লেখার পাশাপাশি বন্ধনীর মধ্যে চন্ডাল বলে উল্লেখ করা হয়। এর পরে ক্রমাগত নমঃশূদ্র আন্দোলনের চাপে, ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার জনগণনার তালিকা থেকে 'চণ্ডাল' শব্দটি বাদদেয়। উচ্চ বর্ণের

দ্বারা ঘৃণার বশত 'চণ্ডাল' নাম আরোপ করা হয় বলে মনেকরা হয়। ঠিক কোন সময় থেকে এই জাতিটিকে চন্ডাল নামকরণ করা হয়, অথবা চন্ডাল শব্দটিকে অবমূল্যায়ন (Defame) করা হয়, তার ঐতিহাসিক তথ্য সুদূর পরাহত।

বর্তমানে নমঃশূদ্র নাম নিয়ে এই জনগোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের মধ্যেই দ্বিধা বিভক্ত। একদিকে শুধুই 'নামঃ' বা 'নমো' অপরদিকে 'নমঃশূদ্র' লেখার পক্ষে যুক্তি উঠে আসতে দেখা যায়। কারণ, নমঃশূদ্র জাতি ছাড়া ভারতের অন্য কোন জাতির নামের সাথে শূদ্র শব্দটি যুক্ত হতে দেখা যায় না।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে চেতনা বৃদ্ধির প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি, ১৯১৫ সালে মুকুন্দ বিহারী মল্লিকের তত্ত্বাবধানে 'নিখিল বঙ্গ নমঃশূদ্র সমিতি' বা অল বেঙ্গল নমঃশূদ্র অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি সংগঠন গড়ে উঠতে দেখা যায়। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিকভাবে নমঃশূদ্র জাতির অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা।[৩৫] ১৯১৭ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কারের প্রস্তাব ঘোষিত হলে সর্বভারতীয় নিষ্পেষিত শ্রেণি অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মুকুন্দ বিহারী মল্লিক বাংলার আইন পরিষদে নিষ্পেষিত শ্রেণীর জন্য ১১টি সংরক্ষিত আসনের দাবি করেন।[৩৬] কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ১৯১৯ সালের আইনে এই দাবিকে অগ্রাহ্য করা হয়।

এর পরিবর্তে একজন মনোনীত নিষ্পেষিত জাতির প্রতিনিধিত্ব করার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর ১৯২১ সালের নির্বাচনে বরিশাল কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন নীরদ বিহারী মল্লিক। ভীষ্মদেব দাস বাংলার আইন সভায় মনোনীত সদস্য হিসেবে স্থান পেয়েছিলেন। অপরদিকে নোয়াখালী কেন্দ্রে বর্ণ হিন্দুদের বিরাগ ভাজন হয়ে রসিকলাল চর্মকারের কাছে পরাজিত হন মুকুন্দ বিহারী মল্লিক।[৩৭] নমঃশূদ্র জাতির চেতনা গঠনে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্যান্য সংগঠনগুলিও ছিল যথেষ্ট ফলপ্রসূ।

১৯২২ সালে পিরোজপুর জেলায় এক বিশাল কৃষক সমাবেশের সভাপতিত্বে গুরুচাঁদ ঠাকুর, আমুল ভূমি সংস্কারের ডাকদেন। নমঃশূদ্র জাতি এম.এল.এ. ভীষ্মদেব দাস কৃষকদের এই দাবি প্রদেশিক সভায় উত্থাপন করেন। যার ফলশ্রুতিতে ১৯২২ সালের প্রজাস্বত্ব আইনে কৃষকদের পক্ষে ভূমি সংস্কার আইন তৈরি করা হয়।[৩৮] উত্তোলনী সভার গ্রামীণ শাখা পরিচালিত সভাগুলিতে মূলত গুরুচাঁদ ঠাকুরের সামাজিক সংস্কারের ভাবধারা ও নীতি সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করতো। এই সাংগঠনিক উদ্যম নমঃশূদ্র জাতি চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সফলভাবে কাজ করে গেছে।

১৯৩০ সালের খুলনা জেলা সম্মেলনে গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর ভাষণে, শিক্ষা-দীক্ষার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনায় পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানান। এই সম্মেলনে, তিনি নমঃশূদ্র জাতি চেতনার সামাজিক সংস্কারের পাশাপাশি রাজনৈতিক অংশীদারিত্বের দ্বার উন্মুক্ত করেন।[৩৯]

ইতিপূর্বে নমঃশূদ্র জাতিকে সকল প্রকার জাতীয় রাজনীতির থেকে দূরে রেখে স্বতন্ত্রভাবে সামাজিক সংস্কারের দিকে অগ্রসর হওয়ার নীতি নিয়ে চলতে দেখা গেলও, এই সময় থেকে পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত নমঃশূদ্র তথা মতুয়া অনুগামীর মধ্যে বাংলা এবং সর্ব ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। ১৯৩২ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুরের উদ্যোগে শ্রীহরি-গুরুচাঁদ মিশন স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে এই মিশন মতুয়া মহাসংঘ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৪০]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের পৌত্র প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর ১৯৩২ সালে সভাপতি হিসেবে মতুয়া মহাসঙ্ঘের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নমঃশূদ্র তথা পিছিয়ে পড়া জাতি সমূহকে ঐক্যবদ্ধ করতে 'ফরিদপুর জেলা নিষ্পেষিত শ্রেণি সমিতি' (Faridpur Depressed Class

Association) গঠন করেন। ইতিমধ্যে 'সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা' ঘোষণা হলে মতুয়া মহাসংঘ জাতি ভিত্তিক পৃথক নির্বাচনের পক্ষ সমর্থন করেন।

মুকুন্দ বিহারী মল্লিক ও রসিকলাল বিশ্বাসের নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাসেস ফেডারেশন মতুয়া মহাসঙ্ঘের থেকে পৃথকভাবে নিষ্পেষিত জাতির রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করতে থাকে। জাতি চেতনা পর্বকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের পাশাপাশি বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলন নমঃশূদ্র জাতি চেতনার ইতিহাসে অনন্য সাফল্য হিসেবে পরিগণিত হয়। ১৯৩৭ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুরের দেহাবসানে নমঃশূদ্র জাতি চেতনায় অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

২.৩.৩ ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত নমঃশূদ্র জাতি রাজনীতির গতি প্রকৃতি।

১৯৩৭ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুরের পর মতুয়া মহাসঙ্ঘেরের নেতৃত্বে মতুয়া তথা নমঃশূদ্র জাতি আন্দোলনের অভিমুখ পরিবর্তিত হতে শুরু করে। গুরুচাঁদ ঠাকুর ভারতীয় রাজনীতি তথা কংগ্রেস রাজনীতির থেকে নমঃশূদ্রদের সমাজ সংস্কার ও জাতি আন্দোলনকে স্বতন্ত্রভাবে রাখার যে নীতি নিয়ে চলতেন, তা অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায়, ঠাকুর পরিবারের মধ্যে জাতি রাজনীতির পাশাপাশি সংসদীয় রাজনীতির সূচনা হয়ে ছিল।

অপরদিকে বরিশালের যুবনেতা যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের উত্থানে নমঃশূদ্র জাতি চেতনার রাজনীতির ভরকেন্দ্র ফরিদপুর থেকে বরিশালের দিকে সরে আসতে শুরু করে ছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে বঙ্গীয় আইন সভায় নিম্নবর্ণের জন্য ৩০ টি আসন সংরক্ষিত হয়।

অতঃপর ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ৩০টি সংরক্ষিত আসন ছাড়াও দুইটি অসংরক্ষিত আসনে তপশিলি প্রার্থী জয়ী হন। এর মধ্যে একজন ছিলেন উত্তরপূর্ব বাখেরগঞ্জের থেকে নির্বাচিত যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল। তিনি কংগ্রেস প্রার্থী সরল দত্তকে পরাজিত করেন। সরল দত্ত ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাতুষ্পুত্র।

১৯৩৭ এর নির্বাচনে মোট ৩২ জন তপশিলি সদস্য নির্বাচিত হয়ে আইনসভায় স্থান পেয়ে ছিলেন। এরমধ্যে ১৩ জন ছিলেন নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ৫৪ টী আসনে জয়ী হয়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। মুসলিম লীগ ৩৯টি এবং কৃষক প্রজা পার্টি ৪০টি আসন দখল করে। এই নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকার গঠনে অস্বীকৃত হয়।

দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি হিসেবে ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রীত্বে কৃষক প্রজা পার্টি মুসলিম লীগ ও নির্দল তপশিলি সদস্যদের নিয়ে সংযুক্ত সরকার বা কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। এই মন্ত্রিসভায় নমঃশূদ্র নেতা মুকুন্দ বিহারী মল্লিক এবং জলপাইগুড়ির রাজবংশী নেতা প্রসন্নদেব রাইকত মন্ত্রি সভায় স্থান পেয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালের জুলাই অধিবেশনে মোহিনী মোহন দাস নিম্নবর্ণের জন্য শিক্ষা খাতে ৫ লক্ষ টাকা বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ করার দাবি তোলেন। এই আর্জি নামঞ্জুর হওয়ার কারণে তপশিলি সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

এই অসন্তোষের ফলে যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল পি.আর. ঠাকুর, হেমচন্দ্র নস্কর প্রমূখ আইনসভার ২০ জন তপশিলি সদস্য নিয়ে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিডিউল কাস্ট পার্টি' গঠিত হয়। এই পার্টির সভাপতি হন পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় নেতা হেমচন্দ্র নস্কর সম্পাদক হন যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল। ১৯৩৮ সালের ৮ই আগস্ট যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের নেতৃত্বে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। এই অনাস্থা প্রস্তাবের ভোটাভুটিতে

২৩ জন ইউরোপীয় সদস্য মন্ত্রিসভার পক্ষে সমর্থন করায় মন্ত্রিসভা পতনের হাত থেকে রক্ষা পায়।

১৯৪০ সালে কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হলে, ১৯৪১ সালে মুসলিম লীগের সদস্য গণ সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে, ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, শরৎচন্দ্র বসু ও তপশিলি সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি। ফজলুল হক ১৯৪১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর প্রগতিশীলজোটদল (Progressive Coalition Party) এর সঙ্গে পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভা শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা নামে পরিচিত। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এই মন্ত্রিসভায়, একমাত্র তপশিলি সদস্য ছিলেন উত্তরবঙ্গের উপেন্দ্রনাথ বর্মণ।

১৯৪৩ সালের ২৪শে মার্চ বঙ্গীয় আইনসভায় যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিডিউল কাস্ট পার্টির তরফ থেকে তিন দফা দাবি উত্থাপন করেন। এগুলি হল- তিনজন তপশিলি মন্ত্রী নিয়োগ করতে হবে, তিনজন পরিষদীয় সচিব নিয়োগ করতে হবে, তপশিলি ছাত্র দের জন্য শিক্ষাখাতে ৫ লক্ষ টাকা বার্ষিক অনুদান মঞ্জুর করতে হবে এবং তপশিলি জাতির জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আইনসভায় এই প্রস্তাব নামঞ্জুর হলে, ফজলুল হক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। যার ফলে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার অবসান ঘটে।

১৯৪৩ সালের ২৪শে এপ্রিল মুসলিম লীগ যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের এই দাবি মেনে নিলে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টির সমর্থনে খাজা মইনুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই নতুন মন্ত্রিসভায় যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল, প্রেমহরি বর্মন এবং পুলিনবিহারী মল্লিক দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালে কৃষি বিল সংক্রান্ত ভোটাভুটিতে নইমুদ্দিন সরকারের পতন ঘটে।

১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক আইন সভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ভারতীয় রাজনীতিতে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। মুসলিম লীগ ১১৪ কেন্দ্রে জয়লাভ করে, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কংগ্রেস তপশিলি সংরক্ষিত প্রার্থীসহ ৮৬ টি আসনে জয়লাভ করে।[৬১] ত্রিশটি তপশিলি আসনের ২৪টি আসনে তপশিলি কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করেন। পি.আর. ঠাকুর এবং প্রসন্নদেব রায়কোট নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন। পরবর্তীতে দুইজনেই কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দেন।

১৯৪২ যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল অল ইন্ডিয়া সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের বঙ্গীয় শাখা স্থাপন করেন। এই সংগঠন থেকে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ফেডারেশনের প্রার্থী হিসেবে একমাত্র তিনি একাই জয়লাভ করেছিলেন। ১৯৪৬ সালের শেখ শাহাবুদ্দিন সুরাবর্দী সোহারাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভায় যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল বিচার আইন ও গৃহনির্মাণ মন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন।

বঙ্গীয় আইন পরিষদে ব্যারিস্টার পি, আর, ঠাকুর ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে MLC নির্বাচিত হন। ওই বৎসর ড. বি.আর. আম্বেদকর বাংলা থেকে চার জন নমঃশূদ্র এম.এল.এ যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল, মুকুন্দ বিহারি মল্লিক, গয়ানাথ বিশ্বাস, দ্বারিকানাথ বারুই ও দুই জন রাজবংশী এম.এল.এ ক্ষেত্রনাথ সিংহ, নগেন্দ্র নারায়ন রায় এর ভোট লাভ করে গণপরিষদে নির্বাচিত হয়ে সদস্য পদ লাভ করেন এবং ভারতের সংবিধান রচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

২.৪ বাংলা বিভাজন (১৯৪৭) ও নমঃশূদ্র জাতি

ঔপনিবেশিক শাসন আমলে বাংলা সহ সমগ্র ভারতে জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি জাতি আন্দোলনের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে ছিল। স্বাধীনতা লাভ তথা দেশ বিভাজন ভারতের এই জাতীয় আন্দোলন এবং জাতি আন্দোলনের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সংগঠিত আজাদহিন্দ বাহিনীর সদস্যদের বিচার প্রক্রিয়া চলাকালে ভারতীয় নৌবিদ্রোহ ও জনমানসের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিফলিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ।

অপরদিকে কংগ্রেস ও অন্যান্য সংগঠন পরিচালিত দীর্ঘকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি, ঔপনিবেশিক শাসকদের গভীরভাবে আন্দোলিত করে ছিল। এসকল কারণে ভারতের স্বাধীনতা প্রদানের বিষয়টিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গুরুত্ব সহকারে দেখা হতে শুরু করে। এমত পরিস্থিতিতে লেবার পার্টি পরিচালিত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ঘোষণা করে যে, ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করা হবে।

তদানুসারে ব্রিটেন থেকে ভারতে প্রেরিত ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ প্রেরন করা হয়। আলোচনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ভারতীয় নেতৃত্বের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। যুক্তরাজ্যের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এট্‌লির উদ্যোগে প্রণীত এই কমিটি ছিল তিন সদস্য বিশিষ্ট। এই কমিটিতে ছিলেন, বৃটেনের ভারত বিষয়ক সেক্রেটারী অব স্টেট লর্ড পেথিক-লোরেন্স, ব্রিটিশ বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রিপ্‌স এবং রাজকীয় নৌ-সেনাবিভাগের প্রথম অধিনায়ক এ.ভি. আলেকজান্ডার।

ক্যাবিনেট মিশনের রিপোর্টের সুপারিশে বলা হয় (১) ব্রিটিশ শাসিত ভারত ও আঞ্চলিক রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে এবং ক্ষমতা বন্টন নীতি গৃহীত হবে। (২) ভারতের হিন্দু অধ্যুষিত প্রদেশগুলি 'ক', মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলি 'খ' এবং বাংলা ও আসাম প্রদেশকে 'গ' শ্রেণিভুক্ত করা হবে। (৩) এই প্রদেশগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে ভারতের সংবিধান রচনার জন্য একটি গণ পরিষদ গঠিত হবে। (৪) সাম্প্রদায়িক নীতির ভিত্তিতে গণ পরিষদ গঠন ও প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন হবে। (৫) কোনো

প্রদেশ ইচ্ছা করলে নতুন সংবিধান রচনা করতে পারবে। (৬) এ ছাড়া নতুন সংবিধান রচনা না হওয়া পর্যন্ত ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল সমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে।

শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতপার্থক্যের কারণে মন্ত্রী মিশন বা ক্রিপস মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। স্বাধীনতা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য ১৯৪৭ সালের ২২শে মার্চ গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন ভারতীয় ভূখণ্ডে পদার্পণ করেন। তিনি প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে, দেশভাগের মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করার প্রয়াস শুরু করেন।

বাংলা ভাগ (১৯৪৭) সম্পর্কে আলোচনায়, ১৯৪৭ সালের ২৩শে এপ্রিল কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় বাংলা বিভাগ পূর্বের একটি জনমত সমীক্ষা থেকে পাওয়া রিপোর্ট (Galloup Poll) প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বাংলা বিভাজন সম্পর্কে বহুবিভক্ত নেতাদের মতামত উঠে আসতে দেখা গেছে।

পত্রিকা কর্তৃক পরিচালিত জনসমীক্ষা বিষয়ক প্রশ্নটি ছিল যে, "আপনি কি বাঙালি হিন্দুদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের পক্ষপাতী?" এই প্রশ্নের উত্তরে ৯৮.৩ শতাংশ মানুষ হিন্দু বাঙ্গালীদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের পক্ষে মত দেন এবং ০.৬ শতাংশ এর বিরুদ্ধে মত দেন।[৪২] যদিও অনেক গবেষক এই সমীক্ষার রায় বাঙালি ভদ্রলোক সমাজের দ্বারা প্রভাবিত একটা মতামত বলে মনে করেন[৪৩] পত্রিকাটির সমীক্ষা সর্বাত্মক ভাবে গ্রহণযোগ্য না হলেও শিক্ষিত বাঙ্গালীদের একাংশের মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তথ্যটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বাংলা ভাগ সম্পর্কে নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধী মতবাদের কথা সামনে আসে। ১৯৪৭ সালের ৬ই মে অমৃতবাজার পত্রিকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পরস্পর বিরোধী মতবাদের একটি কার্টুন চিত্র প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম ছিল "Who is

Right?"[৪৪] এই চিত্রটিতে বাংলার চারটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের মতপার্থক্য তুলে ধরা হয়।

এইচ.এস.সুরাবর্দী, যিনি বিভাজিত ভারতের ঐক্যবদ্ধ বাংলার দাবি করেন, হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বাংলা বিভাজনের পক্ষে মত দেন যে, বাংলার হিন্দুদের জন্য নির্ধারিত অংশটি ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং মুসলিমদের জন্য অংশটি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। মুসলিম লীগের নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বিভাজিত ভারতের বিভাজিত বাংলার পক্ষে মত দেন। অপরদিকে কংগ্রেস নেতা হিসেবে মহাত্মা গান্ধী ছিল ঐক্যবদ্ধ ভারতের ঐক্যবদ্ধ বাংলার পক্ষপাতী।

বাংলার সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের নমঃশূদ্র নেতা যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল ছিলেন, ভারত ও পাকিস্তানের থেকে স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গালীদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে। তিনি মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবকে দাবি আদায়ের কৌশল বলে মনে করতেন। পরবর্তীতে পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে উঠলে দেশ তথা বাংলা ভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। তিনি খন্ডিত বাংলা অপেক্ষা শরৎচন্দ্র বসু, আবুল হাশিম প্রমূখ নেতাদের প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র বাংলা গঠনের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন।

স্বতন্ত্র বাংলা গঠনের পরিকল্পনা কার্যকর করে তুলতে তিনি বাংলার প্রতিটি জেলায় জনসভা করে সমর্থন আদায় করায় প্রয়াসী হন। যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের সহযোগী হিসেবে ছিলেন তৎকালীন বাংলার মন্ত্রী নরেন্দ্র নারায়ণ রায়, জলপাইগুড়ির আইনজীবী গিরিজা কান্ত সিংহ, শ্যামাপ্রসাদ বর্মন, পৌন্ড্রক্ষত্রিয় নেতা রায়বাহাদুর অনুকুল চন্দ্র দাস, ডা.ভোলানাথ বিশ্বাস, তপশিলি ফেডারেশন এর সম্পাদক কামিনী প্রসন্ন মজুমদার, গঙ্গাধর প্রামানিক, ময়মনসিংহের অমৃত মন্ডল, সন্তোষ কুমার মল্লিক, কৈবর্ত নেতা কৃষ্ণচন্দ্র গড়াই প্রমূখ।[৪৫]

অপরদিকে, মতুয়া সংঘাধিপতি প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর সীমানার রদবদল ঘটিয়ে নিম্নবর্ণের একটি বড় অংশকে স্বস্থানে রেখে, বাকিদের জন্য দিল্লির কংগ্রেসী নেতাদের কাছ থেকে পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করার প্রয়াস শুরু করেন। এই প্রয়াস সফল করতে তিনি প্রচারও শুরু করেন।[৪৬] ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে তাঁর নিজের নির্বাচনক্ষেত্র গোপালগঞ্জের সফলাডাঙ্গায় একটি সমাবেশ আহবান করেন। এই সমাবেশে তিনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল থেকে দরিদ্র হিন্দু ও তপশিলি জাতীয় মানুষকে সরিয়ে নিয়ে এসে, পুনর্বাসনের দাবি তোলেন এবং বলেন যতক্ষণ না এই দাবি মানা হয়, ততদিন বাংলা ভাগ কার্যকর করা যাবে না।[৪৭]

বাংলার বিভিন্ন অংশের নেতাদের বিরোধী মতকে অগ্রাহ্য করে, মাউন্টব্যাটেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ এই দুটি দলের সম্মতিক্রমে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ভারত ভাগের পরিকল্পনা নির্ধারণ করেন। অপরদিকে মন্ত্রী মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর বড়লাট ভারতের অঞ্চল বিভক্তিকরণের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রস্তাব দেন।"[৪৮] ৩রা জুন নয়াদিল্লি থেকে বেতার বক্তৃতায় জহরলাল নেহেরু ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের এই প্রস্তাব গ্রহণ করার বিষয়টিকে সমর্থন করেন।[৪৯]

ভারত ভাগের এই ঘোষণা হওয়ার পূর্বে গান্ধীজি বলেছিলেন "আমার মৃতদেহের উপর ভারত বিভক্ত হইবে।" দেশভাগের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে গান্ধীজী আন্দোলন করতে পারেন এরূপ একটি আশঙ্কার থেকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ওই দিনেই প্রার্থনা সভায় যাওয়ার পূর্বে গান্ধীজিকে ভাইসরয় ভবনে আমন্ত্রণ জানান। এই আলোচনায় গান্ধীজীকে বোঝানো হয় যে, এই পরিকল্পনা গান্ধী নীতিকে অনুসরণ করেই অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে কোন অংশকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন অবস্থায় রাজি করার জন্য জোর করা হবে না। গান্ধীজী ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস এর নীতিকে অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। অতঃপর সেই সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী দেশের খন্ডনের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বা

ভাইসরয়কে দায়মুক্ত করেন এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পারস্পরিক সাম্প্রদায়িকসংঘাতকেদায়ীকরেন।[৫০]

১৯৪৭ সালের ৩ রা জুন ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সে এটাই ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষের দুইটি গভর্নমেন্টকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা প্রদান করবে। তিনি আরো বলেন যে, বাংলা ও পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদকে দুটি অংশে ভাগ করা হবে। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলি এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির দুটি আলাদা কমিটি গঠিত হবে। প্রদেশ বিভাগ সম্পর্কে তাঁরা পৃথকভাবে মতামত দেবে। গঠিত কমিটি দুইটির মধ্যে যদি একটি কমিটি ও বাংলা বিভাগের অনুকুলে মত দেয় তবে, প্রদেশটি ভাগ করা হবে।

তদনুসারে ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন বাংলার পরিষদে সদস্যগণ আনুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হলেন। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়ু মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, কলকাতা, ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার হিন্দু ও মুসলমান সদস্যগণ (এম.এল.এ) একটি সভায় মিলিত হলেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করলেন বর্ধমানের মহারাজ স্যার উদয়চাঁদ মহতাব। এই সভায় হিন্দু সদস্যগণ বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদান করলেন।[৫১]

অপরদিকে মুসলমান প্রধান জেলাগুলির হিন্দু-মুসলমান সদস্যগণ নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে ওই একই দিনে একটি পৃথক সভায় মিলিত হন। এই সভায় প্রস্তাব উত্থাপিত হলে মুসলমানগন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এবং কংগ্রেস সদস্যগণ সদস্যগণ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদান করেন। তপশিলি ফেডারেশন ছিল স্বাধীন সার্বভৌম অখন্ডবাংলার পক্ষে। নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে গঠিত সভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধ প্রস্তাব জয়যুক্ত হয়।[৫২] অর্থাৎ অনুষ্ঠিত সভা দুইটির মধ্যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সভায় বাংলা ভাগের পক্ষে এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সভায় অবিভক্ত বাংলা পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে যারা যুক্ত হয়। সভা দুইটি সম্পন্ন হওয়ার পর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৪৭ সালের ১৮ ই জুলাই লেবার পার্টি শাসিত ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ হলে ভারতের স্বাধীনতা প্রক্রিয়ায় সরকারি সিলমোহর পড়ে যায় ফলস্বরূপ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পাশাপাশি দেশ বিভাজনের আবহ প্রস্তুত হয়ে যায়।[৫৩]

এই পরিস্থিতি ভারতের পশ্চিম সীমান্তের পাঞ্জাব, পূর্ব সীমান্তের বাংলা প্রদেশ এবং আসামের কিছু অংশ বিভাজন পরিস্থিতি তৈরি হলে, অঞ্চল গুলিতে অনিশ্চয়তা এবং উদ্বেগের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বঙ্গপ্রদেশের জনবিন্যাস এর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনবিন্যাস এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ছিল। এই জটিল জনবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে দুটি রাষ্ট্রের সীমারেখা তৈরি করা ছিল অত্যন্ত জটিল কাজ। যার সমাধান হয়ে ছিল উদাসীন এবং অপেশাদারী পদ্ধতির মধ্য দিয়ে।

ভারত পাকিস্তানের সীমারেখা তৈরি করার জন্য দায়িত্ব পান ইংল্যান্ডের ব্যারিস্টার স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ। তিনি ৮ই জুলাই ভারতে আসেন এবং ভারতীয় ভৌগলিক বিন্যাস, সংস্কৃতি, জনবিন্যাস প্রভৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ৩৫ দিনের মধ্যে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাজনের খসড়া প্রস্তুত করে ফেলেন। তাঁর সভাপতিত্বে বাংলা ও পাঞ্জাব সীমানা নির্ধারণের জন্য দুইটি পৃথক কমিটি গঠন করা হয়।

বাংলা ভাগের জন্য গঠিত কমিটিতে অপর চারজন সদস্য ছিলেন চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিজন কুমার মুখোপাধ্যায়, আবু সালেহ মোহাম্মদ আক্রম এবং এম.এ. রহমান।[৫৪] র‍্যাডক্লিফের বাংলা ভাগের ফলে খুলনা জেলা বাদে প্রেসিডেন্সি ডিভিশন, বর্ধমান ডিভিশন, দার্জিলিং ও দেশীয় রাজ্য কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয় সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম ডিভিশন, ঢাকা ডিভিশন, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, খুলনা প্রকৃতি জেলা।[৫৫]

বাংলা বিভাজনে নমঃশূদ্র অধ্যুষিত সিংহভাগ অংশ যথা- ঢাকা, পাবনা, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলগুলি পূর্ব পাকিস্তানের অংশে পরিণত হয়। র‍্যাডক্লিফ নির্ধারিত বাংলা বিভাজন রেখাতে

যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল অথবা প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর উভয় নেতার নমঃশূদ্র জাতিকে সংঘবদ্ধ রাখার পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়। এই বাংলা বিভাজন স্বাধীন ভারতীয় উপমহাদেশে নমঃশূদ্র তথা তপশিলি জাতি চেতনাকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতীয় জনমানসের বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতা ও দেশভাগের মত কঠিন অভিঘাত নেমে আসে, ভারতের পশ্চিম প্রান্তের পাঞ্জাব এবং পূর্ব প্রান্তের বাংলা প্রদেশদ্বয়কে কেন্দ্র করে। দেশভাগের আগে ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রতিশ্রুতিদেয় যে, কোন জনগোষ্ঠীকে জোরপূর্বক অন্য সম্প্রদায়ের সরকারের অধীনে বাস করতেন বাধ্য করা হবে না।[৫৬]

বিভিন্ন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব বৃন্দের আশ্বাসবাণী, দেশভাগ পরবর্তী বাস্তুচ্যুতি উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলায় বাস্তবায়িত হয়নি। এই রাজনৈতিক স্বার্থ প্রণোদিত দেশভাগ এবং তৎপরবর্তী সমস্যা মোকাবিলার পরিকল্পনা ছিল হতাশাজনক। একদিকে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক দেশত্যাগের পরিকল্পনাকে দ্রুত রূপান্তরিত করার প্রয়াসে, ব্রিটিশ আইনজীবী সিরিল র‍্যাডক্লিফ মাত্র পাঁচ(৫) সপ্তাহর মধ্যে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্ত রেখা নির্ধারণ করেফেলেন। অপরদিকে ভারতীয় ও পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা দখল পরবর্তী পারস্পরিক অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের ফলস্বরূপ, জন বিনিময়ের সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

বাংলা বিভাজনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের অংশে থেকে যাওয়া অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মত সামাজিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর বর্ণের মানুষজনের একটি বড় অংশ সীমারেখা নির্ধারণ উদ্ভূত পরিস্থিতি জনিত বাস্তুচ্যুতির শিকার হন।

এদের মধ্যে নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পৌন্ড্র জাতিগোষ্ঠী ছিলেন অন্যতম। ১৯৪১ আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুযায়ী অবিভক্ত বঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত আটটি জেলা

ছিল নমঃশূদ্র অধ্যুষিত। এই সকল জেলায় হিন্দুর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে খুলনা ৫০.৫%, যশোর ৩৫%, ফরিদপুর ৩৯%, ঢাকা ৩৬%, বাখরগঞ্জ ২৮%, ও নোয়াখালী ১৯%।[৫৭] তাঁরা ভারতের সঙ্গে থাকতে চেয়ে প্রতিবাদ এর মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।[৫৮] এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে দুর্বল মানবগোষ্ঠীকে অবহেলার শিকার হতে দেখা যায়। অগত্যা পূর্ব পাকিস্তানের অংশে থাকা নমঃশূদ্র জাতির মানুষের কাছে মুসলিম দেশে বসবাস করা অথবা বাস্তু ত্যাগ করে ভারতে উদ্বাস্তু হিসেবে চলে আসা ছাড়া অন্য পথ ছিল না।

সরণি: ২.৪. বাংলা বিভাজনের পূর্বে বিভিন্ন জালায় নমঃশূদ্র জনসংখ্যা।

ক্রমিক নং	জেলা	পুরুষ	মহিলা	মোট
১.	যশোর	১০১,৫২২	৯৩,৩৩২	১৯৪,৮৫৪
২.	খুলনা	১৫৪,৯০৫	১৪১,৯৫৪	২৯৬,৮৯৯
৩.	পাবনা	২৩,৩০৩	২২,০১৫	৪৫,৩১৮
৪.	ঢাকা	১৩৩,৯৩১	১৩৩,৪০৪	২৬৭,৩৩৫
৫.	ময়মনসিংহ	৬৪,৬২৮	৬০,১৫৪	১২৪,৭৮২
৬.	ফরিদপুর	২৩৯,৬৯২	২৩০,৬৪৫	৪৭০,৩৩৭
৭.	বাখেরগঞ্জ	১৯৫,১১৫	১৮৮,৫৪৩	৩৮৩,৬৫৮
৮.	টিপেরা	৬৭,০১০	৬৩,৪২১	১৩০,৪৩১
৯.	আটটি জেলা	৯৮০,১০৬	৯৩৩,৫০৮	১,৯১৩,৬১৪

সুত্র: আদমশুমারি, ১৯৪১; উপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস: নাড়ীর সম্পর্ক, কলকাতা, এন.সি.এম.বি. মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ২০২১, পৃ.৩৫।

এরকম পরিস্থিতিতে নমঃশূদ্র জাতিগোষ্ঠী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি অংশ প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরকে অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে চলে আসেন। অপর একটি অংশ পাকিস্তানের প্রথম আইন ও শ্রমদপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে যোগ দেওয়া যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল

এবং তপশিলি ফেডারেশনের নেতা এবং মতুয়া মহাসঙ্ঘের পূর্ব পাকিস্তানের বা পূর্ব বঙ্গের শাখাকে অনুসরণ করে পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যান। বাংলা বিভাজনের ফলে একদিকে যেমন নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর জাতি আন্দোলনের মূল ভূমি পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এর অন্তর্ভুক্ত হয়। অপরদিকে রাজবংশী এবং পৌন্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনের ভিত্তি ভূমিটিও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ জাতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী তাদের মূল আন্দোলন ক্ষেত্র থেকে উৎখাত হয়ে ছিল। এই পরিস্থিতি বাংলার জাতি আন্দোলনকে সংকটাপন্ন করে তুলেছিল।

বাংলা ভাগের পূর্ব থেকেই রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার কারণে, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর্যায়ে পৌঁছে ছিল।[৫৯] ১৯৪৬ সালের কলকাতার দাঙ্গা এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নোয়াখালী দাঙ্গা প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রভাব বৃদ্ধির হওয়ায়, বঙ্গের পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে হিন্দু অভিবাসনের পটভূমি প্রস্তুত হতে শুরু করে।[৬০] বাংলা বিভাজনের (১৯৪৭) পর হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তু জনশ্রোত পশ্চিমবঙ্গ আসাম প্রভৃতি ভারতীয় রাজ্যগুলোতে আসতে শুরু করে।

এই দীর্ঘ সময় ধরে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বাস্তুচ্যুত মানুষগুলি বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত ও আন্দোলন সংগঠিত করার মাধ্যমে নিজেদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মত প্রাথমিক চাহিদার সংস্থান করার চেষ্টা করে। যার মধ্য দিয়ে উদ্ভব হয় বিভিন্ন উদ্বাস্তু সংগঠন তথা আন্দোলন। আলোচ্য কাল পর্বটিতে অন্যান্য অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ের মত বাস্তুচ্যুত তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের জাতি আন্দোলনের দাবি থেকে সরে এসে উদ্বাস্তু আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই অধ্যায়টি ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু মানুষের সংগ্রামের এক অন্য ইতিহাস। বাধ্য হয়ে ভারত সরকার বাংলায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করে। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কেন্দ্রীয় সরকার ১০ বছর সময় নেয়।[৬১] ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৫৮ সালে দণ্ডকারণ্য প্রকল্প গ্রহণ করেন। এই প্রকল্পটির মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, আন্দামান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রেরণ করেন। পুনর্বাসন সংক্রান্ত এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু নমঃশূদ্র তথা তপশিলি আশ্রয় প্রার্থীদের অভিবাসন ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়।

১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের দিকে বাস্তুচ্যুত মানুষের আগমন হতে শুরু করে। কখনো পাকিস্তান সরকারের আমলাতন্ত্রের বা কখনো মুসলিম মৌলবাদ সৃষ্ট যোগসাজশে উদ্বাস্তুঢেউ ভারতের দিকে আসতে থাকে। একটি উদ্বাস্তুঢেউ স্তিমিত হওয়ার আগেই আরেকটি সাম্প্রদায়িক অশান্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে থাকে, যার ফলে বাংলার উদ্বাস্তু প্রবাহ দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। ১৯৪৬ সালের নোয়াখালী দাঙ্গা ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে বঙ্গের পশ্চিম অংশের দিকে হিন্দু উদ্বাস্তু প্রবাহের প্রস্তুতিপর্ব।[৬২] ১৯৪৭ সালে মতুয়া মহাসংঘাধিপতি প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরকে অনুসরণ করে যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল থেকে মতুয়াভক্ত নমঃশূদ্র মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন।[৬৩] বাংলা ভাগ (১৯৪৭) এর পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের প্রতি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল নেতিবাচক।

তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুকে যে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন তাতে বলা হয়ে ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে আসা শরণার্থীরা দাঙ্গা পরিস্থিতি শান্ত হলে আবার পূর্বপাকিস্তানে ফিরে যাবেন। এই ধারনার বশবর্তী হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন পুনর্বাসন দপ্তর স্থাপন করে নি। তার পরিবর্তে ত্রাণদপ্তর এর

মাধ্যমে সকলের জন্য সকল উদ্বাস্তুদের ত্রাণ সরবরাহ করে ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করেন মাত্র।[৬৪]

পশ্চিমবঙ্গে আসা উদ্বাস্তুদের প্রতি তিনি কেন্দ্রীয় তথা রাজ্য সরকারের নিস্পৃহতার মনোভাব পরিলক্ষিত করে, পশ্চিমবঙ্গে আসা নমঃশূদ্র মানুষজন ১৯৪৭ সালে মতুয়া মহাসঙ্ঘাধিপতি প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের উদ্যোগে উদ্বাস্তু পূর্নবাসনের জন্য ঠাকুর ল্যান্ড এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। উত্তর ২৪ পরগনার চাঁদপাড়া ও গোবরডাঙ্গা স্টেশনের মধ্যবর্তী বিস্তৃর্ণ ফাঁকা মাঠ কিনে নিয়ে নিজেদের উদ্যোগে বসতি স্থাপন করে। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম উদ্বাস্তু উপনিবেশ হিসেবে পরিচিত এই অঞ্চলটি ঠাকুরনগর হিসেবে পরিচিত হয়। এই উদ্যোগে উৎসাহিত হয়ে নদীয়া ও ২৪ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলে বেসরকারি উদ্যোগে নতুন নতুন বেসরকারি কলোনি গড়ে উঠতে শুরু করে।[৬৫]

১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি ড. বিধান চন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলে, উদ্বাস্তু সম্পর্কে সরকারি মনোভাবের পরিবর্তন সূচিত হয়। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের জন্য ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড ডেভলপমেন্ট এন্ড প্ল্যানিং অ্যাক্ট’ (Act XXI of 1948) পাস করা হয়।

উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান কল্পে তিনি ১৯৪৯ সালের জুন মাসে ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ দুইটিকে সংযুক্ত করে একটি দপ্তরের অধীনে নিয়ে আসেন। দপ্তরটিকে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখেন এবং এই বছরেরই ১৫ই জুন হিরণময় বন্দোপাধ্যায়কে পুনর্বাসন অধ্যক্ষ এবং পুনর্বাসন সচিবের পদে নিয়োগ করেন।[৬৬] মূলত ড. রায়ের উদ্যোগেই বাংলার বাস্তুচ্যুত মানুষের প্রতি প্রাথমিকপর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীন মনোভাব থাকা সত্বেও পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের সুপরিকল্পিত প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। তিনি আমৃত্যু (১ জুলাই ১৯৬২ সাল) কাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যার সঙ্গে লড়াই করে গেছেন।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা উদ্বাস্তু সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ। জুন মাসের শেষে এই সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে ১১ লক্ষ।[৬৭] এই সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল। এই পর্বে বাস্তুচ্যুত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসা মানুষের মধ্যে ৩ লাখ ৫০ হাজার ছিল শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। ৫ লাখ ৫০ হাজার গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। ১ এক লাখের বেশি ছিল কৃষক । ১ লাখের অধিক ছিল কৃষির সঙ্গে যুক্ত কারিগর।[৬৮] পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সরকারি প্রচেষ্টা হিসেবে, এই বছরে এপ্রিল মাসে ভারত পাকিস্তান উভয় পক্ষ 'ইন্টার-ডোমিনিয়ন এগ্রিমেন্ট' নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

এর উদ্দেশ্য ছিল উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান করা। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু পর্যবেক্ষণ ও সমস্যা নিরসনের জন্য একজন করে সংখ্যালঘু মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে আরেকটি 'ইন্টার-ডোমিনিয়ন কনফারেন্স স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এই চুক্তির কার্যকরীতা বাস্তব ক্ষেত্রে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রভৃতি নেতার দ্বারা তীব্র সমালোচিত হয়ে এসেছে।[৬৯] কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ চুক্তি বাস্তব সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হওয়ায় উদ্বাস্তু প্রবাহ রোধ করা সম্ভব হয়নি। ক্রমাগত শিয়ালদহ স্টেশনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আশা বাস্তুহারা মানুষের ভির বাড়তে শুরু করে।

এমন পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু মানুষের আশ্রয় প্রদানে সরকারি শিবির অসংকুলান হওয়ায়, আশ্রয়হীন মানুষগুলি কলকাতা শহরতলি এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আপন উদ্যোগে বাসস্থানের অনুসন্ধান করতে শুরু করে। ১৯৪৮ সালের ১১ ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের কায়েদে-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার মৃত্যু পরবর্তী পর্বে পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন আসতে শুরু করে। এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর নীতির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

দেশভাগ কালীন সময়ে জিন্না নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রতি দায়বদ্ধতা স্বরূপ যে ন্যায় বিচারের আশ্বাস দিয়েছিলেন, তা লঙ্ঘিত হতে শুরু করে।[৭০]

পূর্বপাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা বাড়তে শুরু করে। হিন্দুদের প্রতি মুসলিম আচার-আচরণ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। সংখ্যালঘু হিন্দু ডাক্তার, আইনজীবী, দোকানদার সবাইকে বয়কট করা হয়। হিন্দু নারীদের প্রতি নির্যাতন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধর্মীয় ও সামাজিক হেনস্তার ঘটনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। অপরদিকে পাকিস্তান সরকার সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের প্রতি ছিলেন সম্পন্ন উদাসীন। উপরন্তু হিন্দুদের প্রতি আমলাতান্ত্রিক অন্যায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, যাতে করে হিন্দুরা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।[৭১] যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের পদত্যাগ পত্রে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলির বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি প্রশাসনিক পর্যায়ে বিরূপ কর্তব্য পালনের অভিযোগ আরোপ করা, যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।[৭২]

১৯৪৯ সালের প্রথমদিকে বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত পুলিশের অত্যাচার, শ্রীহট্ট জেলার হাবিবগঞ্জ তপশিলি সম্প্রদায়ের উপর পুলিশ ও মিলিটারির অত্যাচার, এই বছরেই ২০ই ডিসেম্বর খুলনা জেলার মোল্লারহাট থানার অন্তর্গত কালশিরা গ্রামে পুলিশ মিলিটারি ও স্থানীয় মুসলমানদের অত্যাচার, এরকম ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৭৩] এই ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের অভিযোগের ভিত্তিকে দৃঢ় করে। খুলনা জেলার কালশিরা গ্রামের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি স্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হলে, পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্রে ঘটনাটিকে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করা হয়।[৭৪] যা ভবিষ্যতের সংঘর্ষের সংকেত বহন করে এনেছিল। একদিকে পূর্বপাকিস্তানে হিন্দুদের প্রতি সাম্প্রদায়িক ক্ষোভ ও আক্রমণ বৃদ্ধি পেতে থাকে, অপরদিকে এর

প্রতিফলন স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুচ্যুত মানুষের আগমন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬ লক্ষ।[৭৫]

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ববঙ্গের ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, বাগেরহাট প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দাঙ্গা শুরু হয়। এই দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পরে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে।[৭৬] এই দাঙ্গাকবলিত অঞ্চল গুলি ছিল মূলত নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য কৃষি নির্ভর নিম্নবর্ণের মানুষের বসত ভূমি। এই ঘটনার পর পূর্ব পাকিস্থানে অমুসলিম ব্যক্তিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার সংকুচিত হয়ে পড়ে। উপরন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে হিন্দু নিপীড়ন শুরু হয়। মূলত ১৯৫০ সালের থেকে পূর্ববঙ্গে আনসার বাহিনীর আক্রমণের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে নমঃশূদ্র তথা সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়।[৭৭] দাঙ্গা বিধ্বস্ত পূর্ববঙ্গ থেকে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় চলে আসা উদ্বাস্তুদের মধ্যে ৭০ শতাংশএর বেশি মানুষ সরকারি রিলিফ ক্যাম্পে শরণ নেন। সরকারি রিলিফ ক্যাম্পে প্রায় গোটাটাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিজীবী নমঃশূদ্র জাতির মানুষ।[৭৮]

দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চল থেকে দলে দলে নমঃশূদ্র পরিবার পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করে। ১৯৫০ সালের পরথেকে নমঃশূদ্র এবং কৃষি নির্ভর উদ্বাস্তু প্রবাহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এই দাঙ্গায় বাস্তুচ্যুত মানুষদের জন্য সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে প্রবেশ সহজ সাধ্য ছিল না। হাজার হাজার উদ্বাস্তু মানুষ পূর্ববঙ্গের রেলস্টেশন স্টিমার ঘাট ঢাকা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতে শুরু করেন। এমন পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ড: বিধান চন্দ্র রায় ঢাকা বিমানবন্দর থেকে উদ্বাস্তুদের নিয়ে আসার জন্য ১৬ টি ভাড়াটে বিমানের ব্যবস্থা করেন। ফরিদপুর বরিশালের স্টিমার ঘাটে ১৫ টি বড় যাত্রীবাহী স্টিমার প্রেরণ করেছিলেন। বনগাঁ থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে আসা ট্রেনের কয়েকটি কামড়া মেয়েদের হাতের শাখা ছিড়ে যাওয়া শাড়ি এবং রক্তাক্ত মৃতদেহ নিয়ে এসে পৌঁছে ছিল, তাঁর বিবরণ পাওয়াযায়।[৭৯]

ইতিপূর্বে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে দেখা করে উদ্বাস্তুদের স্বার্থে কিছু দাবি তুলতে অনুরোধ করেন। এই দাবিগুলোর মধ্যে ছিল-

ক. পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পরিকল্পিত জন বিনিময়,

খ. ফেলে আসা সম্পত্তির উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা,

গ. পাকিস্তানের কাছ থেকে উদ্বাস্তুদের পূনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ভূখন্ড দাবি করা। [৮০]

১৯৫০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় লোকসভা কক্ষে ড. মুখার্জি শরণার্থীদের পক্ষে এই দাবি উত্থাপন করলে, প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু এই প্রস্তাবটিকে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শের পরিপন্থী এই যুক্তি দেখিয়ে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন।[৮১] ২রা মার্চ পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রী মোহনলাল সাক্সেনা কলকাতায় বৈঠক আহবান করেন।

এখানে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, ওড়িশার প্রতিনিধি ও মেঘনাথ সাহার মতন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বৈঠকে সাক্সেনা ঘোষণা করেন নবাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে না। তারা সাময়িকভাবে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় পাবেন।[৮২] পশ্চিমবঙ্গে আসা উদ্বাস্তুদের মধ্যে ত্রিপুরা ও ওড়িশা ২৬০০০, বিহার ৫০০০০ উদ্বাস্তুর দায়িত্ব নেবে। অবশিষ্ট উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব নিতে হবে পশ্চিমবঙ্গকে।[৮৩]

পূর্ববঙ্গের বা পূর্ব পাকিস্তানের অশান্তিকর পরিস্থিতি শান্ত হলে শরণার্থীরা যাতে পুনরায় নিজেদের বাসস্থানের ফিরে যেতে পারে তার জন্য রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে শরণার্থী শিবির স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়ে ছিল।[৮৪] আশা করা হয়ে ছিল যে, শরণার্থী হিন্দুরা আবার পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাবে। ডক্টর মেঘনাদ সাহা, সরকারের প্রস্তাবের তীব্র

বিরোধিতা করে দেশবিভাগের আগে কংগ্রেস নেতাদের পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাদের প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ তোলেন।[৮৫]

এই দাঙ্গা পরিস্থিতি সামলে, উদ্বাস্তু স্রোত কম করতে এবং কাশ্মীরের অশান্তিকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে, ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল দিল্লিতে নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে নির্ধারিত হয় যে, দাঙ্গা কালীন পরিস্থিতি শান্ত হলে, সীমান্তের উভয় প্রান্তের উদ্বাস্তুরা যাতে পুনরায় নিজেদের ঘরে ফিরতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা। এই চুক্তির মাধ্যমে ভারত সরকারের কাশ্মীরের উদ্বেগ কিছুটা স্তিমিত হতে দেখা যায় অক্টোবর মাস থেকে। এই মাসে পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থী ক্যাম্পে আসা উদ্বাস্তু সংখ্যা কমে ৯ হাজারে এসে পৌঁছায়।[৮৬] কিন্তু উদ্বাস্তু প্রবাহের রাশ টানার প্রয়াস বেশিদিন সফল হয়নি। চুক্তির ফলে ভারত থেকে পূর্বপাকিস্তানে আশ্রয় নেওয়া অনেক মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতে ফিরে আসলেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ফিরে গিয়ে নিজেদের সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। ফলস্বরূপ, তারা পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন।[৮৭]

পরিস্থিতি আরো জটিল হওয়া শুরু করে যখন এই বছরের (১৯৫০) অক্টোবর মাসে বরিশালের অবিসংবাদিত নমঃশূদ্র নেতা যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল ভারতে আসেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তান সরকারের আইন এবং শ্রমমন্ত্রী। সংখ্যালঘু হিন্দু এবং নমঃশূদ্রদের প্রতি পাকিস্তানের ন্যায় পরায়ণতা উপর বিশ্বাস হারিয়ে, তিনি ১৯৫০ সালের ৮ই অক্টোবর কলকাতা থেকে ডাকযোগে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলির কাছে প্রায় আট হাজার শব্দের পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন।[৮৮]

পরের দিন ৯ই অক্টোবর কলকাতার আনন্দবাজার, যুগান্তর, স্টেটসম্যান, হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড, অমৃতবাজার, সত্যযুগ, বসুমতি প্রভৃতি পত্রিকায় পদত্যাগ পত্রটি প্রকাশিত হয়।[৮৯] যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের ভারতে চলে আসার ফলে পূর্ব পাকিস্থানে থাকা নমঃশূদ্র জানগোষ্ঠীর

সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বাসকরার চেতনায় ভাঙ্গন ধরতে শুরুকরে। পূর্ব পাকিস্তানের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির কথা সম্পর্কে জহরলাল নেহেরু নিজেও অবগত ছিলেন, এই কথা জানা যায় তাঁর মাউন্টব্যাটেনকে লেখা চিঠির মাধ্যমে। এই চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে নিরাপত্তা হীনতার কারণে প্রায় প্রত্যেক হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করতে চাইছেন।[৯০]

১৯৫১ সালের জনগণনায় এই উদ্বাস্তু প্রবাহের প্রতিফলন দেখা যায়। এই আদমশুমারিতে উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫ লক্ষ।[৯১] ১৯৫২ সালের ১৫ অক্টোবর থেকে পাকিস্তান সরকার এককভাবে পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু করার কথা ঘোষণা করে। এই উদ্যোগে ভারতীয় মুসলমানরা শঙ্কিত না হলেও পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুদের মধ্যে দেশ ত্যাগ করার জোয়ার দেখতে পাওয়া যায়। এই বছরের মে থেকে অক্টোবর, এই ছয় মাসের মধ্যে মোট ১,৯৩,৬৬৮ জন মানুষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন।[৯২]

দেশভাগের ফলে ভারত ও পাকিস্তান মিলিয়ে প্রায় দুই কোটি মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়েন।[৯৩] নবগঠিত ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের উভয় প্রান্ত থেকে শুরু হয় উদ্বাস্তু প্রবাহ। পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গ থেকে নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, মালদা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় ৩২ লাখ, আসামের বরাক ও সুরমা উপত্যকার এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অবস্থিত নিম্ন, উত্তর ও মধ্য আসামের জেলা গুলিতে বসবাসকারী নমঃশূদ্র সংখ্যা ৬৩১৫৪২ জন, এছাড়া ত্রিপুরা (২১৫২৬৭), ওড়িশা (১৫৩০২৬), মেঘালয় (১৫৩০২৬), মিজোরাম (১৩৬)[৯৪] এছাড়া শরণার্থী হিসেবে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, উত্তরাখণ্ড, বিহার, ঝাড়খন্ড বিশাল সংখ্যক নমঃশূদ্র পুনর্বাসিত হয়ে, ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে অবস্থান করে আছেন।

২.৫ সিদ্ধান্ত উপসংহার এবং প্রশ্ন উত্থাপন

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের হাত ধরে পাশ্চাত্যের নবজাগরণের যে প্রবাহ ভারত ভূমিতে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারের সূচনা করে ছিল। তার প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে জাতি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্তভাবে জাতি আন্দোলনের উদ্ভব হলেও, ধীরে ধীরে এই সকল জাতি আন্দোলন পুঞ্জিভূত হয়ে বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের রূপ নিতে থাকে। এই সকল জাতি সংস্কার আন্দোলন ক্রমশ রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিভিন্ন নেতার প্রয়াসে গড়ে উঠা এই সকল আন্দোলনে বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিবাদ সভা এবং বিভিন্ন লেখনি (Writing) জনসংযোগের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অবিভক্ত বাংলায় গড়ে ওঠা জাতি আন্দোলন সমূহ এই প্রক্রিয়ার বাইরে ছিল না। বাংলার উত্তর অংশে রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা এবং উপেন্দ্রনাথ বর্মনের নেতৃত্বে রাজবংশী আন্দোলন। দক্ষিণবঙ্গে হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর, যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের নেতৃত্বের আলোকে নমঃশূদ্র আন্দোলন। বেণীমাধব হালদার, শ্রীমন্ত নস্কর, রাইচরণ সরদারের নেতৃত্বে পৌন্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলন। অদ্বৈত মল্লবর্মণের লেখায় মালো জাতি চেতনার বহিঃপ্রকাশ। বলরাম হাড়ির নেতৃত্বে হাড়ি সমাজের আন্দোলন প্রভৃতি।

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের ফলে সংগঠিত বাংলা বিভাজন এই প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গড়ে ওঠা জাতির, আত্মপরিচয় গঠনের দীর্ঘকালীন সংগ্রামের ইতিহাসকে সংকটের সম্মুখীন করে তোলে। এই বিভাজনের ফলে বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজবংশী, নমঃশূদ্র, পৌন্ড্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতি আন্দোলন সর্বাধিক প্রভাবিত হয়। প্রধানত কৃষিনির্ভর এই জাতিসমূহ বহু অধ্যাবসায়ে বিভিন্ন সংস্কার এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় গড়ে তুলেছিলেন।

অন্য সকল তপশিলি জাতির মত বাংলার নমঃশূদ্র জাতির ক্ষেত্রেও পরিগমন জনিত উদ্বেগ তাদের জাতি আন্দোলনকে প্রভাবিত করে ছিল। হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে শুরু হওয়া নমঃশূদ্র তথা অন্যান্য পশ্চাৎপদ মানুষের গড়েতোলা জাতি চেতনা আন্দোলন তথা সামাজিক অবস্থান এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। গুরুচাঁদ ঠাকুরের দেহত্যাগের (১৯৩৭) পরবর্তী সময়ে সমগ্র জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য নেতৃত্বের অনুপস্থিতি, এই সংকটকে আরো ঘনীভূত করে তোলে। এই সংকট কালীন পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যেতে শুরু করে।

নমঃশূদ্র ঐক্যতা বিভাজিত হয়ে পড়ে। মতুয়া মহাসঙ্ঘের নেতা প্রমথরাঞ্জন ঠাকুরকে অনুসরণ করে মতুয়াপন্থী নমঃশূদ্র মানুষের একটি অংশ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। অন্য একটি মতুয়া পন্থী শাখা পদ্মনাভ ঠাকুরকে অনুসরণ করে বাংলাদেশে থেকে যান। এর পাশাপাশি যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের আশ্বাসে পূর্ব-পাকিস্তানে রয়ে যান, এই জাতিগোষ্ঠীর এক বড়অংশ। নমঃশূদ্র নেতাদের পরিগমন সম্পর্কিত পরস্পর বিরোধী অবস্থানের কারণে ঐক্যবদ্ধ নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর দীর্ঘকালীন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে গড়েতোলা জাতি চেতনার ইতিহাস অজানা ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়।

এমত পরিস্থিতিতে বাংলায় অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মত, নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী ধর্মীয় ভিত্তিতে নবনির্মিত পূর্ব পাকিস্তানে নতুন জাতীয়তাবাদী পরিচয়ে নিজেদেরকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য ধর্ম পরিবর্তন অথবা সাম্প্রদায়িক পরিমণ্ডলে টিকে থাকার জন্য নিজেদেরকে উপযোগী করে তোলা অথবা ভারতীয় হিসেবে জাতীয় পরিচিতি অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনে পিতৃ বসতভূমি ত্যাগ করা, এর মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পথে চলতে বাধ্য হয়েছিলেন। নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করতে

শুরু করে। যা পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠেছে। অপরদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মনিপুর, মিজোরাম প্রভৃতি রাজ্যে বসবাসকারী নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী আশির দশকের 'বাঙাল খেদা' আন্দোলনের পরিমণ্ডলে, তাদের স্বতন্ত্র জাতি পরিচিতি হারিয়ে সকল সঙ্কটাপন্ন বাঙ্গালীর প্রতিভূ হয়ে উঠেছে।

বহুধাবিভক্ত নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর নির্ধারিত তিনটি ভিন্ন স্থান ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতি ও জাতি চেতনার তিনটি ভিন্ন প্রেক্ষিত উঠে এসেছে। এই ভিন্নতাপূর্ণ বিষয় সমুহকে উপজীব্য করে পরবর্তী অধ্যায় সমূহ আলোচিত হয়েছে।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ:

১. World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, Declaration, Durban, South Africa, 31 August to 8 September, 2001. https://www.un.org/WCAR/durban.pdf) date 04.10.2022.

২. Rup Kumar Barman Caste, Class and Culture, (New Delhi, Abhijit Publications, 2020), পৃ.৩০।

৩. রূপ কুমার বর্মণ: জাতি রাজনীতি, জাত পাত ও দলিত প্রতর্ক পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান, (কলকাতা, আলফাবেট বুকস, ২০১৯), পৃ.২২।

৪. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৫. যুথিকা বর্মা: জাতি রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি উপেন্দ্রনাথ বর্মন (১৮৯৮-১৯৮৮) ও তাঁর সমকালীন উত্তরবঙ্গ, (কলকাতা, সোপান, ২০২১), পৃ. ১৮।

৬। কৃষ্ণ কুমার সরকার: জাতি আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ: বাংলার পৌন্ড্রজাতির একটি বিশ্লেষণ, ২০১৮ (অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), পৃ. ৩; কৃষ্ণ কুমার সরকার: পৌন্ড্র জাতির জাতিসংগঠন ও কার্যক্রম একটি আলোচনা (১৯৭২-১৯৪৭), (ঢাকা, ইতিহাস একাডেমী, ২০২২), পৃ.পৃ. ২৭৭-২৯২।

৭. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৮. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

৯. Bernard Cohen: Notes on the history of the study of of Indian society and culture, (New Delhi Oxford University Press, 2004) in the Bernard Cohen omnibus forwarded by Dipesh chakrabarty. পৃ.পৃ. ১৩৬-১৭১.

১০. শ্যামল কুমার প্রামানিক: পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতি ও আদিবাসী, (কলকাতা, ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭), পৃ.পৃ. ১২০-১২৬।

১১. নীতিশ বিশ্বাস, জগদীশ হালদার (সম্পা): শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর স্বর্ণ-সংকলন, (কলকাতা, ঐকতান, ২০১৫), পৃ. ৪০।

১২. তদেব, পৃ. ২২৬।

১৩. তদেব, পৃ. ২২৬।

১৪. তদেব, পৃ. ১১০।

১৫. তদেব, পৃ. ২১।

১৬. মনশান্ত বিশ্বাস: বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি, (কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৬), পৃ.পৃ. ৫০-৫৩।

১৭. নীতিশ বিশ্বাস, জগদীশ হালদার (সম্পা): প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

১৮. তদেব, পৃ. ২৯।

১৯. সন্দীপ দাসগুপ্ত: আনন্দবাজার পত্রিকা, (কলকাতা, রবিবাসরীয় সংখ্যা, ২০০২ সাল, ১৪ এপ্রিল)।

২০. নীতিশ বিশ্বাস, জগদীশ হালদার (সম্পা): প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

২১. চিত্ত মণ্ডল, প্রথমা রায়মণ্ডল (সম্পা): বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, (কলকাতা, একুশশতক, ২০১৬), পৃ. ৩৯২।

২২. Census 1911, vol.V. Part II. Table XVI. পৃ.পৃ. ৩৭০-৩৭৩।

২৩. Census 1931, vol. V, part II, Imperial Table XI, পৃ.পৃ. ১৫৬-১৫৭।

২৪. মনোহর মৌলি বিশ্বাস: দলিত সাহিত্যের রূপরেখা, (কলকাতা, বাণীশিল্প, ২০০৭), পৃ.পৃ. ১৩-১৪।

২৫. তদেব, পৃ.পৃ. ১৩-১৪।

২৬. তদেব, পৃ.পৃ. ১৩-১৪।

২৭. তদেব, পৃ.পৃ. ১৩-১৪।

২৮. নীতিশ বিশ্বাস, জগদীশ হালদার (সম্পা): প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ৩৮৮-৩৯০।

২৯. সাক্ষাতকার: নিরাপদ বিশ্বাস (৬৪), নদীয়া, ২০১৬।

৩০. C.S. Mead: Namasudra and other addresses.1911, পৃ. ৫৯।

৩১. Sekhar Bandyopadhyay: Cast protest and identity in in colonial India the Namo shudras of Bengal 1872-1947, (New Delhi, Oxford, 2011), পৃ. ৩৪।

৩২. Letter no. 87 J.G dated 18 July 1881, Alipore।

৩৩. No. 1147 Misc/450-2ac, 8 August 1895।

৩৪. Nadia Gazatteer, 1910।

৩৫. রমেশ বর্মন: তপশীলি জাতির রাজনীতি: ঔপনিবেশিক বাংলার দৃশ্যপট, International Journal of Humanities & Social Science. Volume-VIII, Issue-I, July 2019, Karimganj, Assam, India, পৃ.পৃ. ৬৬-৭৮।

৩৬. মনোশান্ত বিশ্বাস: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮।

৩৭. রমেশ বর্মন: প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ৬৬-৭৮।

৩৮. নীতিশ বিশ্বাস, জগদীশ হালদার (সম্পা): প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।

৩৯. চিত্ত মণ্ডল, প্রথমা রায়মণ্ডল (সম্পা): প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।

৪০. নীতিশ বিশ্বাস, জগদীশ হালদার (সম্পা): প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।

৪১. যুথিকা বর্মা: প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

৪২. Haimanti Roy: A Partition of Contingency? Public Discourse in Bengal 1946–1947, (USA, Cambridge University Press, 2009).

৪৩. জয়া চ্যাটার্জী: বাংলা ভাগ হল, (কলকাতা, এল অ্যালমা পাবলিকেশনস, ১৯৯৯), পৃ.পৃ. ২৪০-২৪১।

৪৪. হৈমন্তী রায়: প্রাগুক্ত।

৪৫. কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর: বাংলার নমঃশূদ্র, (কলকাতা, কে.এন.টি.এ.এ., ২০২১), পৃ. ২৩।

৪৬. আশিস হীরা (সম্পা): দেশভাগে নিম্নবর্ণ, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২০), পৃ. ২২।

৪৭. অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৭.০৩.১৯৪৭।

৪৮. ৪ ঠা জুন ১৯৪৭ বেতার ভাষণের বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪৯. তদেব।

৫০. অশোক কুমার সরকার, (অনু): ভারতে মাউন্টব্যাটেন, (কলকাতা, আনন্দ-হিন্দুস্তান প্রকাশনী, ১৯৫২), পৃ. ৭৮।

৫১. ১৯৪৭ সালের ২০ জুন তারিখের অ্যাসেম্বলির কার্যবিবরণী।

৫২. তদেব।

৫৩. সুভাষ বিশ্বাস: দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা: প্রসঙ্গ নদীয়া জেলা, (কলকাতা, সোম প্রকাশনী, ২০১৬), পৃ. ১১।

৫৪. তদেব, পৃ. ১৪।

৫৫. তদেব, পৃ. ১৪।

৫৬. আনন্দবাজার পত্রিকা: প্রাগুক্ত।

৫৭. Rup Kumar Barman: Migration, State Policies and Citizenship: A Historical Study on India, Bangladesh and Bhutan, (New Delhi, New Delhi, Aayu Publications, 2021), পৃ. ১৯৭।

৫৮. দেবী চট্টোপাধ্যায়: নিম্ন জাতির মানুষ ও দেশভাগ পৃষ্ঠা ১৮।

৫৯. অর্পিতা বসু: উদ্বাস্তু আন্দোলন ও পুনর্বাসিত সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা, (কলকাতা, গাংচিল, ২০১৩) পৃ. ১১।

৬০. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

৬১. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: প্রান্তিক মানব, (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৯), পৃ. ১২।

৬২. তদেব, পৃ. ১৭।

৬৩. কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৬৪. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: পৃষ্ঠা ২৭।

৬৫. কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৬৬. হিরণময় বন্দোপাধ্যায়: উদ্বাস্তু, (কলকাতা, দীপ প্রকাশনী, ২০১৮), পৃ. পৃ. ৫২-৫৩।

৬৭. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

৬৮. তদেব, পৃ. ১৮।

৬৯. বাবুল কুমার পাল: বরিশাল থেকে দন্ডকারণ্য: পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ইতিহাস, (কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০১০), পৃ. ৬৫।

৭০. জগদীশ চন্দ্র মন্ডল: মহাপ্রাণ যোগেন্দ্র নাথ, চতুর্থ খন্ড, (কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ২০০৪), পৃ. ২০৬।

৭১. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ২১-৩৬।

৭২. জগদীশ চন্দ্র মন্ডল: প্রাগুক্ত,পৃ. ২০৯।

৭৩. তদেব, পৃ.পৃ. ২০৫-২১৯।

৭৪. তদেব, পৃ. ২০৯।

৭৫. প্রফুল্ল চক্রবর্তী: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৭৬. তদেব, পৃ. ১৮।

৭৭. বাবুল কুমার পাল: প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১। (১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের পর ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা বাহিনীর কিছু সদস্য, যারা পরবর্তীতে পাকিস্তানের নাগরিক হয়, তাদের নিয়ে আনসার বাহিনী তৈরি হয়।

১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান আনসার আইন দ্বারা আনসার বাহিনী পূর্ব পাকিস্তান আনসার হিসাবে গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি এই বাহিনী আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে।)

৭৮. তদেব, পৃ. ৬১।

৭৯. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

৮০. আশিস হীরা: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৩।

৮১. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৮২. বাবুল কুমার পাল: প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩ ।

৮৩. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৮৪. হিরণময় বন্দোপাধ্যায়: প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯ ।

৮৫. প্রফুল্ল চক্রবর্তী: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

৮৬. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

৮৭. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮ ।

৮৮. জগদীশ চন্দ্র মন্ডল: প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ১৭২-২২০।

৮৯. তদেব, পৃ. ২২০।

৯০. বাবুল কুমার পাল: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

৯১. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৯২. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৯৩. Population Redistribution and Development in South Asia।

৯৪. আদমশুমারি, ২০১১।

তৃতীয় অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পেক্ষাপটে নমঃশূদ্র ও মতুয়া পরিচিতি দ্বন্দ্ব ও জাতি চেতনার বিবর্তন। (১৯৪৭-২০২১)

৩.১ ভূমিকা:

ভারতীয় গণতন্ত্রে বহুকৌণিক রাজনৈতিক ধারার সমাগম, সমাজ বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায় উল্লেখযোগ্য আলোচনার বিষয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় এখানে শ্রেণি, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতিকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক দল এবং প্রভাবক্ষম অরাজনৈতিক (Influential Non-Political) সংগঠন গড়ে ওঠার নিদর্শন পাওয়া যায়। এর উদাহরণ হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া, [Communist Party of India, (CPI)] শিব সেনা, (Shiv Sena) সর্বভারতীয় মজলিসে-ই-ইত্তেহাদুল মুসলেমীন, [All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen, (AIMEIM)] ভারতীয় জনতা পার্টি, [Bharatiya Janata Party, (BJP)] আসাম গন পরিষদ, [Asom Gana Parishad, (AGP)] ন্যাশনাল পিপলস পার্টি, [National People's Party, (NPP)] প্রভৃতি রাজনৈতিক দল।

অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, [Rashtriya Swayamsevak Sangh, (RSS)] সর্বভারতীয় ইমাম সংগঠন, [All India Imam Organization, (AIIO)] এশিয়া দলিত অধিকার ফোরাম, (Asia Dalit Rights Forum) মতুয়া মহাসঙ্ঘ প্রভৃতি অরাজনৈতিক (Influential Non-Political) সংগঠনের কথা উল্লেখ করা যায়।

এর পাশাপাশি ভারতীয় সামাজে জাতি ও বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বহুজন সামাজ পার্টি, [Bahujan Samaj Party, (BSP)] জনতা পার্টি, (Janata

Party) ভারতীয় জাস্টিস পার্টি, (২০০৩) দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগাম, [Dravida Munnetra Kazhagam, (DMK)] প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের উদাহরণও পাওয়া যায়।

ঔপনিবেশিক আমলে এই জাতি ও বর্ণ ভিত্তিক রাজনীতির গোড়াপত্তন হয়ে ছিল। বিদেশি শাসকদের কৌতূহলপূর্ণ অন্বেষণ ও গবেষনা উদ্ভূত তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভারতীয় সংস্কারমনস্ক ব্যক্তিত্বদের তত্ত্বাবধানে জাতি ও বর্ণ চেতনার উত্থান তথা আন্দোলনের সূচনা হয়ে ছিল। ভারতের বর্ণ ও জাতি বৈষম্য ব্যবস্থার মত সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জ্যোতিবা ফুলে (১১ই এপ্রিল, ১৮২৭-২৮শে নভেম্বর, ১৮৯০), থানান্তে পেরিয়ার ই.ভি. রামস্বামী (১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯-২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩), ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকর (১৪ই এপ্রিল, ১৮৯১-৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬) প্রভৃতি নেতৃত্ব অগ্রগামীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

বিংশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে এই জাতি আন্দোলন রাজনৈতিক পরিসরে আসতে শুরু করে। এই সময় সমগ্র ভারতের পাশাপাশি অবিভক্ত বাংলার রাজবংশী, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র, বাগদি, মালো প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই জাতি চেতনা উদ্ভূত উত্থান বা আন্দোলনের সূচনা হতে দেখা যায়। বাংলার দক্ষিণ পূর্ব অংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সংগঠিত নমঃশূদ্র জাতি আন্দোলনে ছিল এই রকম একটি সামাজিক উত্থান।

এই সংস্কার মূলক আন্দোলনটির নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন মতুয়া ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। এর ফলস্বরূপ এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতি চেতনা পরিবর্ধনের পাশাপাশি রাজনীতির প্রতি অনুরাগ পরিলক্ষিত হতে শুরু করে ছিল। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার ও আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তাদের জাতি ও রাজনৈতিক উত্থান হতে দেখা যায়। এই উত্থান আধুনিক ভারতের জাতি রাজনীতির অন্যতম মাইলফলক হিসেবে পরিচিত।

ঔপনিবেশিক শাসকদের বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ভারতের জাতি আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে তুলতে সহায়ক হয়ে ছিল। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ভারতের সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে সকল নেতাদের নিয়ে ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে তিনবার গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার মধ্য দিয়ে ১৯৩২ সালের গোলটেবিল বৈঠকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড নির্বাচনী ক্ষেত্রে অবদমিত শ্রেণি বা অনুসূচিত জাতি সমূহ এবং সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচন বা সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ঘোষণা করেন।

সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা স্বীকার করে নিলেও, অনুসূচিত জাতির জন্য পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতায় গান্ধীজী মরণপণ অনশন শুরু করেন। এই পরিস্থিতিতে হিন্দু ও অনুসূচিত জাতির পৃথক নির্বাচন সমস্যার সমাধান সূত্র হিসেবে ড. আম্বেদকর এবং গান্ধীজীর মধ্যে পুনা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে শিক্ষা, সরকারী চাকরী এবং নির্বাচনী ক্ষেত্রের অনুসূচিত জাতি বা তপশিলিদের জন্য সংরক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী হিন্দু এবং তপশিলি জাতির যৌথ নির্বাচন স্বীকৃতি লাভ করলে, গান্ধীজি অনশন ত্যাগ করেন।

এই সমাধান সূত্র অনুসারে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে অনুসূচিত জাতির জন্য নির্বাচনী রাজনীতিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আইন কার্যকারী হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলার রাজনীতিতে তপশিলি জাতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে ছিল।[১] অবিভক্ত বাংলার ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই জাতি চেতনা উদ্ভুত রাজনৈতিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।[২] ১৯৩৭ এবং ১৯৪৬ এর নির্বাচনে অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে তপশিলি জাতির জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষিত হয়ে ছিল।

ব্রিটিশ ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তপশিলি জাতির অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে, যে জাতি রাজনীতির অধ্যায় সূচিত হয়ে ছিল। তার সূত্র ধরে ১৯৪২ সালের ১৭-২০ জুলাই ড.

আম্বেদকরের নেতৃত্বে নাগপুরে সারা ভারত তপশিলি ফেডারেশন স্থাপিত হয়। দলটির আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে সংসদীয় রাজনীতিতে জাতি চেতনা প্রতিফলনের সম্ভাবনা জাগ্রত হয়ে ওঠে।

এই পর্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভার পাশাপাশি চতুর্থ বর্ণের রাজনৈতিক দল হিসেবে যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন বাংলার শাখা, রাজনৈতিক সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠতে সক্ষম হয়ে ছিল। এছাড়াও প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের মতুয়া সংঘ জাতি রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ছিল, যা বাংলার রাজনীতি চর্চায় এক উজ্জ্বলতম অধ্যায় হিসেবে পরিচিত।

১৯৪৭ সালে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের উত্থান হয়। ঔপনিবেশিক বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এই রাষ্ট্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা মানসিক অবদমনের বন্ধন থেকে মুক্তির প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। স্বাধীন ভারতে সমাজের সকল অংশের সামাজিক অগ্রগতি এবং সম প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসরণ করে সংবিধানে তপশিলি জাতি এবং বিভিন্ন পশ্চাৎপদ অংশের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এই বিষয়টি ভারতের জাতি আন্দোলনকে এক নতুন দিগন্তের দ্বার প্রান্তে উপস্থিত করে ছিল। এর ফলে ভারতের জাতি আন্দোলন তথা জাতি রাজনীতির চরিত্র পরিবর্তন হতে দেখা যায়। বিভাজিত বাংলার পশ্চিম অংশ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে এই পরিবর্তন ছিল ভারতের অন্য সকল অংশের থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির।

বাংলা খন্ডনের (১৯৪৭) ফলে শুরু হওয়া অভিবাসন অবিভক্ত বাংলার জাতি রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণকারী নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পৌন্ড্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি সংখ্যাগরিষ্ঠ

জনগোষ্ঠীকে সংকটাপন্ন করে তুলেছিল। রাজবংশী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত কোচবিহার, রংপুর অঞ্চলটি ভারত এবং পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এর মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। পৌন্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত ২৪ পরগনা, খুলনা, যশোর অঞ্চলটি দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। অপরদিকে নমঃশূদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলটির বেশিরভাগ অংশই থেকে যায় তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ)। এই জনবিন্যাসগত পরিবর্তন বাংলার জাতি আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে ছিল।

দেশভাগের পর ১৯৫১ সালের জনগণনার সমীকরণে এই উদ্বাস্তু প্রবাহের প্রতিফলন দেখা যায়। এই সময় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫ লাখ।[৩] পরবর্তীতে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই হিন্দু উদ্বাস্তুদের একটি বড় অংশ ছিল তপশিলি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষ। এদের মধ্যে নমঃশূদ্র জাতি ছিল অন্যতন। বাস্তুচ্যুত (Uprooted) নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি তাদের নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি বর্গের একটি বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসিত হয়ে পড়েছিলেন।

বাস্তুচ্যুত নমঃশূদ্র জাতির মানুষজন নদীয়া, ২৪ পরগনা এবং এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকেন। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সংখ্যা ৩২ লাখেরও বেশী ছিল।[৪] এই ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা তথা জাতি রাজনীতির ভরকেন্দ্র পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হতে দেখা যায়। অপরদিকে এই অভিবাসিত নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায় তাদের আগেকার পরিচিতির সঙ্গে বাঙাল বা পূর্ববঙ্গীয় উপাধিতে ভূষিত হয়ে পরিচিতির বিবর্তনের সম্মুখীন হয়ে পড়েন।

পশ্চিমবঙ্গের পেক্ষাপটে রাজনীতির বিভিন্ন পর্বে নমঃশূদ্র এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের সমীকরণ ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন আঙ্গিকের সূচনা করেছে।

স্বাধীন ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন শুরু হয় ১৯৫১-৫২ সাল থেকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাসন পর্বে নমঃশূদ্র এবং মতুয়া রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায় উঠে আসে। প্রথম পর্যায়ে কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের সময় শরণার্থী সম্পর্কিত নীতির কারণে সকল উদ্বাস্তু মানুষের মত নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য তপশিলি জাতি অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মত প্রাথমিক চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করে ছিল। এই ঘটনা পর্বে অন্যান্য হিন্দু উদ্বাস্তুর মতো নমঃশূদ্র জাতি চেতনা রূপান্তরিত হয়ে ছিল উদ্বাস্তু আন্দোলনে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বামপন্থী শাসনপর্বে সরকারকে রাজনৈতিক সমর্থনের মধ্য দিয়ে জাতি রাজনীতি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে দেখা যায়। এই পর্বে বর্ণ ও জাতি বৈষম্যের সমীকরণ মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামের ধারায় আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল।

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে নতুন রাজনৈতিক দল ক্ষমতার উঠে আসলে তপশিলি তথা নমঃশূদ্র জাতি চেতনার তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়। এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বামপন্থী শাসনের পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র জাতি ও মতুয়া সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অংশীদারিত্বের সমীকরণ জনসমক্ষে উঠে এসেছিল। আবার জাতি রাজনীতিতে উত্থানের এই অভিলাস পূর্ণ না হওয়ার কারণে তৈরি হওয়া ক্ষোভের আংশিক প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় ২০২১ সালের বিধান সভা নির্বাচনে। এই ঘটনাক্রমকে প্রাথমিক বাস্তুচ্যুতি জনিত আঘাত সামলে নিয়ে নমঃশূদ্রদের জাতি চেতনার পুনরুত্থান হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়।

২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার ১৬.৬ মানুষ শতাংশ তপশিলি জাতি এবং ৮.৬ শতাংশ মানুষ তপশিলি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম তপশিলি জাতি অধ্যুষিত রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ৯,১২,৭৬,১১৫ জন। তপশিলি

জনসংখ্যা ২,১৪,৬৩,২৭০ জন, যা এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৩.৫১ শতাংশ দখল করে আছে।[৫]

ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি অনুসরণ করে, সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশের সমঅংশীদারিত্ব এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ইতিবাচক পদক্ষেপ (Affirmative Action's) হিসেবে তপশিলি জাতির জন্য ১৫ শতাংশ এবং তপশিলি উপজাতিদের জন্য ৭.৫ শতাংশ সংরক্ষণ বলবৎ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ৬০টি কৌম গোষ্ঠীতে (Sub-Caste) বিভক্ত তপশিলি জাতির সমূহের মধ্যে রাজবংশী, নমঃশূদ্র, বাগদি, পৌন্ড্র এবং বাউরি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। অবশিষ্ট ৫৫ টি তপশিলি কৌম জনগোষ্ঠীর (Sub-Caste) মানুষের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম।[৬] পশ্চিমবঙ্গের জেলা ভিত্তিক রাজনৈতিক সমীকরণের নিরিখে তপশিলি জাতির মানুষের শতাংশে কোচবিহার (৫০.১০%), জলপাইগুড়ি (৩৭.৬৮%), বাঁকুড়া (৩২.৬৫%), দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৩০.২২%), নদীয়া (২৯.৯২%), বীরভূম (২৯.৪৯%), দক্ষিণ দিনাজপুর (২৮.৮৯%), বর্ধমান (২৭.৩৯%), উত্তর দিনাজপুর (২৬.৯২%), হুগলি (২৪.৩৪%) প্রভৃতি জেলা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।[৭] অতএব দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় রাজনীতিতে তপশিলি জাতির উপস্থিতি অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে।

মতুয়া সাম্প্রদায় এবং নমঃশূদ্র তথা অন্যান্য তপশিলি জাতির রাজনীতি লিপ্ততা পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন আঙ্গিকের সূচনা করেছে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশের বিভিন্ন জেলায় নমঃশূদ্র, পৌন্ড্রক্ষত্রিয়, বাগদি এবং অন্যান্য জাতি গোষ্ঠী। অপরদিকে উত্তর অংশের জেলাগুলিতে রাজবংশী, নমঃশূদ্র, মালো প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে সমাজের পিছিয়ে পড়া জাতি সমূহ ভারতীয় রাজনৈতিক পেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবস্থান করে আছে। এই প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের বাংলা বিভাজন পরবর্তী সময় থেকে ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গের

বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় রাজনীতিতে মতুয়া ও নমঃশূদ্র জাতির সম্পৃক্ততা আলোচনার পর্যায়ক্রমে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

যেমন বাংলা বিভাজন পরবর্তী অভিবাসন পর্বে উদ্বাস্তু আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মতুয়া সম্প্রদায় ও নমঃশূদ্র জাতি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় রাজনীতিতে কীভাবে অংশীদার হয়ে উঠতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস শাসন আমলে বাস্তুচ্যুতির সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে গিয়ে মতুয়া সম্প্রদায় ও নমঃশূদ্ররা জাতি রাজনীতির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, কীভাবে উদ্বাস্তু আন্দোলনর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তীতে কংগ্রেস শাসনের অবসানে মধ্য দিয়ে বাংলা কংগ্রেসের দোদুল্যমান রাজনীতিতে তাঁরা কীভাবে অবস্থান করে ছিল। পরবর্তীতে বামপন্থী আদর্শের দিকে ঝুঁকেপড়া এবং তার ফলে জাতি আন্দোলন কীভাবে শ্রেণী সংগ্রামের ধারায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

২০১১ সালের পরে তাঁরা বামপন্থী ভাবধারার থেকে বেরিয়ে কীভাবে নতুন জাতি রাজনীতির সমীকরণে নিজেদেরকে অভ্যস্ত করে তোলার প্রক্রিয়ায় অংশ হয়ে উঠে। পশ্চিমবঙ্গের জাতি রাজনীতিতে নমঃশূদ্র জাতির প্রতিভূ হয়ে ওঠায় মতুয়া মহাসঙ্ঘের রাজনীতি কীভাবে নির্বাচনী আলোচ্যসূচি (Agenda) হয়ে ওঠে।

এই সকল বিষয় ছাড়াও অধ্যায়টি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে দুইটি প্রধান দৃষ্টিকোন প্রতিপাদ্য গবেষণাটি আলোচনার ক্ষেত্রে নতুন আঙ্গিক উদ্ভাসিত করেছে। একদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে জাতি চেতনাকে প্রচ্ছন্ন করে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভাবাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে, এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার প্রয়াস। অপরদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাবাদর্শের প্রভাবকে ছিন্ন করে জাতি রাজনীতির উত্থানের প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা। এই দুইরকম পরস্পর বিরোধী টানাপোড়েনের চিত্র বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রতিপাদ্য অধ্যায়ের আলোচনা আগ্রসর হয়েছে।

৩.২ পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে তপশিলি জাতি, নমঃশূদ্র জাতি ও মতুয়া সম্প্রদায়ের জাতি চেতনার স্বরূপ (১৯৪৭-২০২১)

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ তপশিলি জাতি অন্তর্ভুক্ত মানুষ। ভারতীয় সংবিধানে সমাজের প্রতিটি অংশের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বর নীতি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি জনপ্রতিনিধিত্ব বিশিষ্ট বিধানসভায় ২৩ শতাংশ অর্থাৎ ৬৮টি (২০২১ বিধানসভা নির্বাচন) আসন তপশিলিদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করে লোকসভা নির্বাচন, সর্বক্ষেত্রেই এই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সংখ্যা এবং রাজনৈতিক চেতনার নিরিখে কেন্দ্র ও রাজ্যের সংসদীয় শাসনতন্ত্রে তপশিলি জাতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সরণি: ৩.২. ২০০১ এবং ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সংখ্যা।

ক্রমিক নং	জেলা	২০০১	২০১১
১.	নাদিয়া	৮,১০,৬১২	৯,০৩,১৮৬
২.	উত্তর ২৪ পরগনা	৭,৯৮,৭০৪	৮,৫৬,৩৭১
৩.	জলপাইগুড়ি	২,৮৬,৭০৮	৩,৪১,২৬১
৪.	বর্ধমান	২,২৪,৬৩৩	২,৪৬,৫৮৬
৫.	কোচবিহার	১,৬৫,৫১৪	১,৭৮,৩৯৩
৬.	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	১,৪৭,৪৯০	১,৪৭,৬০০
৭.	হুগলি	১,১১,৭৪১	১,২৫,১৯৪
৮.	উত্তর দিনাজপুর	৯৯,২৩৭	১,১৪,৭৫০
৯.	মালদহ	১,০১,৪৪৪	১,০৮,৭৮১
১০.	পূর্ব মেদিনীপুর	-	৯৩,৮২৩

সুত্র: আদমশুমারি, ২০০১ এবং ২০১১; Barman, Rup Kumar: *Caste, Politics, Casteism and Dalit Discourse: The Scheduled Castes of West Bengal,* New Delhi, Abhijit Publications, 2020, p.p. 303-304.

পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জনবিন্যাস পর্যালোচনা করলে কিছু বিষয় উঠে আসে। এই রাজ্যের দক্ষিন ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, বর্ধমান, নদীয়া, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, হুগলী, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় মোট তপশিলি জাতির ৬৯.০২ শতাংশ মানুষ বসবাস করেন।[৮] এর মধ্যে উত্তর অংশের জেলা সমুহে রাজবংশী। দক্ষিন ও উত্তর ২৪ পরগনায় পৌণ্ড্র জাতির মানুষের সংখ্যা বেশি। বাগদি ও বাউরি জাতির ঘনবসতি দেখতে পাওয়া যায়, বর্ধমান, হুগলি, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর প্রভৃতির জেলাসমূহে।[৯]

অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া (৯,০৩,১৮৬) এবং উত্তর ২৪ পরগনা (৮,৫৬,৩৭১) জেলা দুইটিতে মিলিতভাবে মোট নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর ৫৮.৩৮ শতাংশ মানুষ বসবাস করেন।[১০] জেলা দুইটি ছাড়াও বর্ধমান, হুগলি, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর, প্রভৃতি জেলায় নমঃশূদ্র জাতির বসবাস পরিলক্ষিত হয়। এই সমীকরণটি নির্বাচনী রাজনীতির ক্ষেত্রে তপশিলি জাতির সমধিক গুরুত্ব তুলে ধরে। এই জাতি রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম তপশিলি জাতি হিসেবে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের উপস্থিতি সমুজ্জ্বল।

১৯৪৭ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশের জাতি রাজনীতি চর্চায় নমঃশূদ্র জাতি এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের সমীকরণ ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন সংযোজন। একদিকে নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একদল মানুষকে বোঝায়, যারা তাঁদের সাধারণ রীতিনীতি, ধর্ম, ভাষা, উৎস, উৎপত্তি বা ইতিহাস পরস্পরের সাথে বিনিময় করে। এ ক্ষেত্রে তাদের উৎপত্তিগত ইতিহাস বা পরিচিতি জন্মগতভাবে আরোপ করা হয়ে থাকে। অপরদিকে মতুয়া সম্প্রদায় একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে নির্মিত সম্প্রদায়। এই ধর্মীয় মতাদর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতি এবং বর্ণের কোন বিধি-নিষেধ না থাকলেও তাদের সিংহভাগ মানুষ নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

অবিভক্ত বঙ্গের নমঃশূদ্র তথা তপশিলি রাজনীতির উত্থানের ক্ষেত্রে এই মতুয়া সম্প্রদায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে ছিল। এর পাশাপাশি স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে সম্প্রদায়টি প্রভাবক্ষম সংগঠন হিসেবেও সক্রিয়। এই ভাবে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী এবং মতুয়া সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যা নির্বাচনী রাজনীতিতে বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশের জাতি রাজনৈতিক সমীকরণে নমঃশূদ্র এবং মতুয়া সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

২০১১ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় রাজনীতিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রভাব উঠে আসতে দেখা যায়। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক শাসক দলের পরিবর্তনে অন্যতম কারণ হিসেবে নমঃশূদ্র এবং তপশিলি ভোট ব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে। ২০১১ সাল থেকে ২০২১ সালের অন্তর্বর্তী সময়ে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচারে নমঃশূদ্র তথা মতুয়া (মতুয়া ধর্মাবলম্বী মানুষের সিংহভাগ মানুষ নমঃশূদ্র জাতির) এবং অন্যান্য তপশিলি জাতির ভোটব্যাঙ্ক জয় করার প্রচেষ্টা তথাকথিত নিম্নবর্ণের জাতি চেতনা প্রসূত রাজনৈতির সমীকরণ হিসেবেই প্রতিভাত হয়।

১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগ পরবর্তী পরিস্থিতি থেকে দীর্ঘকালীন সংঘর্ষের ফলশ্রুতি হিসেবে গড়ে ওঠা জাতি চেতনা, পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে তপশিলি জাতিসমূহের উত্থানের সহায়ক হয়েছে। বিভাজিত বাংলায় দেশভাগ জনিত অভিঘাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত তপশিলি জাতির মধ্যে নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পৌন্ড্র জাতি অন্যতম। অবিভক্ত বাংলায় নমঃশূদ্র জাতি ছিল বৃহত্তম তপশিলি জনগোষ্ঠী। মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান এবং হিন্দু অধ্যুষিত জেলা গুলো নিয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ গঠন হওয়ার কালে নমঃশূদ্র বসতির প্রায় ৯০ শতাংশ পূর্ববঙ্গের অংশে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা ডিভিশনে রয়ে যায়।

যুক্তবঙ্গে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে নমঃশূদ্র, রাজবংশী ও পৌন্ড্র জাতি পরিচালিত অল বেঙ্গল ডিপ্রেসড ক্লাস লীগ এবং সিডিউল কাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি তৎকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বাইরে ব্রিটিশ শক্তির সমার্থক অমুসলিম সম্প্রদায়ের সহযোগী হিসেবে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হয়ে ছিল। বাংলা বিভাজনের (১৯৪৭) পর এই রাজনৈতিক ক্ষেত্রটির বেশির ভাগ অংশ এবং তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মধ্যে ১৬টি আসন পূর্বপাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গে রয়ে যায়।[১১]

অপরদিকে নমঃশূদ্র জাতির বৃহত্তম একটি মতুয়া ধর্মানুসারী অংশ প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের নেতৃত্বে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।[১২] ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর এই অংশটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বনগাঁর কাছে চিকন পাড়ায় প্রথম বেসরকারি উদ্বাস্তু কলোণীর প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানটি বর্তমানে ভারতের মতুয়া ধর্মের পীঠস্থান ঠাকুরনগর নামে পরিচিত।

নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসলেও, অপর অংশটি যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল সমর্থিত সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের প্রভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অংশে থেকে যায়। এমত পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত পূর্ব বাংলা থেকে চলে আসা উদ্বাস্তু মানুষের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন স্বচ্ছল এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বর্গের মানুষ। এর ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গে থেকে যাওয়া অবশিষ্ট হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নমঃশূদ্ররা ছিলেন সংখ্যায় অধিক পরিমাণ।

১৯৫০ এরপর পরিবর্তিত রাজনৈতিক সামাজিক এবং ধর্মীয় পরিস্থিতির কারণে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাঁরা সর্বস্ব হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে আসতে থাকে অথবা অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পূর্বপাকিস্তানে স্বল্প সংখ্যক নমঃশূদ্র জাতির মানুষ অবশিষ্ট থেকে যায়। এমত পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন, তাঁরা আদি বাসভূমিতে তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং জাতি

রাজনীতির শক্তি হারিয়ে ফেলেন। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় ভূখণ্ডে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী হিসেবে মানুষের প্রাথমিক চাহিদা অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের তাগিদে জীবন সংঘর্ষে অবতীর্ণ হন। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা পূর্ববর্তী জাতি চেতনার আন্দোলন এবং জাতি রাজনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে, অপেক্ষাকৃত প্রান্তিক ভূমিকায় চলে আসতে থাকেন। তাঁরা হয়ে ওঠেন উদ্বাস্তু বাঙাল জনগোষ্ঠীর অংশ।

স্বাধীনতা (১৯৪৭) পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের ২২ জন কংগ্রেস বিধায়ক এবং ৮ জন মন্ত্রী বিশিষ্ট সভায় ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ প্রথম মুখ্যমন্ত্রী (৪ঠা জুলাই) মনোনীত হন। এই মন্ত্রিসভায় অবিভক্ত বাংলার যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের তিনজন তপশিলি মন্ত্রীত্বের নীতি বজায় রেখে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি কেন্দ্রের মোহিনী মোহন বর্মন (রাজবংশী), দক্ষিণ-পূর্ব ২৪ পরগনার বিধায়ক হেমচন্দ্র নস্কর (পৌন্ড্র), হুগলির রাধানাথ দাসকে মন্ত্রীত্ব পদে বহাল করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, মন্ত্রিসভায় তিনজন তপশিলি মন্ত্রী নিয়োগ করায় প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালিনী দ্বারা সমালোচিত হয়েছিলেন।[১৩]

পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালের ২৩শে জানুয়ারি ড: বিধান চন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯৬২) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর ১২ সদস্য যুক্ত মন্ত্রিসভায় প্রতিনিধি হিসেবে মোহিনী মোহন বর্মন (রাজবংশী) ও হেমচন্দ্র নস্কর (পৌন্ড্র) এই দুইজন তপশিলি জাতির মানুষ স্থান পেয়েছিলেন। এছাড়া ১৩ জন তপশিলি বিধায়কের মধ্যে ১২ জন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন।[১৪]

১৯৫২ সালে ভারতে সংসদীয় নির্বাচন শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় নির্বাচনে ১৯৫২ থেকে ২০২১ সালের সমগ্র নির্বাচনী পর্বকে আলোচনার সুবিধার্থে ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত কংগ্রেস পরিচালিত শাসন আমল, ১৯৬৭-১৯৭৭ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ও রাজনৈতিক দোলাচল পর্ব। ১৯৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত সি.পি.আই(এম) তথা বামপন্থী

মতাদর্শের অনুসারিত শাসক আমল এবং ২০১১ থেকে ২০২১ সময়কালে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত শাসন পর্ব।[১৫] এই চারটি পর্বে ভাগ করে নমঃশূদ্র জাতির রাজনীতি এবং জাতি চেতনার বিবর্তন আলোচনা করা হয়েছে।

৩.২.২ ১৯৫২ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস শাসন পর্বে নমঃশূদ্র জাতি চেতনার রূপান্তর

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের সংবিধান কার্যকরী (Effective) হয়। সংবিধানের আইন অনুসারে ১৯৫১ সালের ২৫শে অক্টোবর থেকে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মধ্যবর্তী সময়ে ভারতের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় সংবিধানের ১৫তম অংশে ৩২৪ নং থেকে ৩২৯ নং ধারার নির্দেশাবলী অনুসারে নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেনের তত্ত্বাবধানে সর্বভারতীয় নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ভারতের সাংবিধান স্বীকৃত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাজনীতির সূত্রপাত হয়।

১৯৩২ সালে মহাত্মা গান্ধী ও ড. বি.আর. আম্বেদকরের মধ্যে স্বাক্ষরিত পুনা চুক্তি এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসরণ করে ভারতীয় সংবিধানে সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা জাতি এবং উপজাতিদের সামাজিক অন্যায় ও বৈষম্য থেকে রক্ষা করার জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। (Article 46) এই সাংবিধানিক ধারা (Article) এর অনুসরন করে ১৯৫০ সালের সাংবিধানিক আদেশ[১৬] (The Constitution (Scheduled Caste) Order, 19501. C.O.19) অনুযায়ী প্রথম তফসিল বা সরণিতে সামাজিক ভাবে অবদমিত জাতি সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তাঁদের জন্য সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই নির্দেশ অনুযায়ী রাজনৈতিক নির্বাচনী অংশে তফসিল অন্তর্ভুক্ত জাতি এবং জনজাতির জন সংখ্যার সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

সরণি: ৩.২.২. ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা নির্বাচনে তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব

সাল	মোট আসন	তপশিলি আসন	মোট ভোটার	ভোট শতাংশ
১৯৫১	২৩৮	৪০	১,২৪,৮৯,২৭০	৪২.২৩
১৯৫৭	২৫২	৪২	১৫২১৫৩০	৪৭.৬৪
১৯৬২	২৫২	৪২	১,৮০,০৫,৬৩৫	৫৫.৫৬

সুত্র: Statistical Report on General Election, The Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi, 1952 to 1962; রূপ কুমার বর্মণ: জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক: পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান, কলকাতা, আলফাবেট বুকস, ২০১৯, পৃ. ৮৭।

১৯৫২ সালের স্বাধীন ভারতে প্রথম নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ২৩৮টি আসনের মধ্যে তপশিলি জাতির জন্য ৪০টি এবং তপশিলি উপজাতির জন্য ১২ আসন সংরক্ষিত করা হয়।[১৭] নির্বাচনে তপশিলি জাতির জন্য নির্ধারিত আসনের মধ্যে ২৭টি আসনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী জয় লাভ করেন। বামপন্থী দল গুলি (সি.পি.আই., আর.এস.পি., মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, ফরওয়ার্ড ব্লক, প্রজা সোশালিস্ট পার্টি) ১১ আসনে জয়ী হয়। অন্যান্যরা অবশিষ্ট দুইটি আসনে জয় লাভ করেন। এছাড়া অন্যান্য সাধারণ নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে ৬ জন তপশিলি প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন।[১৮]

এই নির্বাচনের সময়পর্বে নমঃশূদ্র জাতি ছিল উদ্বাস্তু সমস্যায় জর্জরিত। তাৎকালীন পরিস্থিতি থেকে দ্রুত সমাধান সূত্র অর্জন করা ছিল তাঁদের প্রাথমিক দাবি। এমত পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া এবং ২৪ পরগনার নমঃশূদ্র বসতি অঞ্চলসহ বিভিন্ন জেলা থেকে বিধান সভায় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে দেখতে পাওয়া যায়। মতুয়া মহাসঙ্ঘের সংঘাধিপতি প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর ২৪ পরগনার গাইঘাটা কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস প্রার্থী জিয়াউল হকের কাছে পরাজিত হন। এই নির্বাচনে তিনি সর্বমোট ২৬৪২ (১১.২৪ %) ভোট পেয়েছিলেন।[১৯]

কলকাতায় বেনিয়াপুকুর বালিগঞ্জ কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র গুপ্তে জয় লাভ করেছিলেন। এই কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন অবিভক্ত বাংলার তপশিলি ফেডারেশনের নমঃশূদ্র নেতা যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল। ১৪ জন প্রার্থীর মধ্যে তাঁর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ১,৬৪৪ যা ছিল ওই কেন্দ্রে মোট বৈধ ভোটের ২.৭৬ শতাংশ মাত্র।[২০]

১৯৫২ সালের নির্বাচনী রাজনীতিতে অবিভক্ত বাংলার নমঃশূদ্র জাতি রাজনীতির নিষ্প্রভ চিত্র ফুটে উঠেছে। এর কারণ হিসেবে বাস্তুচ্যুত নমঃশূদ্র কথা তপশিলি জাতির সঙ্ঘবদ্ধতা এবং স্থিতিশীলতার অভাবকে দায়ী করা যেতে পারে। একদিকে ১৯৫০ পরবর্তী সাম্প্রদায়িক হিংসা কবলিত হয়ে নমঃশূদ্র জাতি দলে দলে আদি বাসভূমি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে অথবা বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ভাবে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। অপরদিকে পরপর আসতে থাকা উদ্বাস্তু প্রবাহ ক্রমাগত শরণার্থী সমস্যা বৃদ্ধি করে চলেছিল। এরকম পরিস্থিতিতে বাংলা ভাগ পূর্ববর্তী জাতি রাজনীতির পরিমণ্ডল পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠেনি।

এই সময় একদিকে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর মতুয়া মহাসঙ্ঘের ছত্রছায়ায় নমঃশূদ্র জাতিকে একত্রিত করার প্রয়াসে ব্রতী হন। তাঁর উদ্যোগে ২৪ পরগনার হাবরা, হাড়োয়া, স্বরূপনগর, গোবরডাঙ্গা, বনগাঁ, দেগঙ্গা, বাগদা, হরিণঘাটা, গাইঘাটা এবং নদীয়ার বগুলা, কৃষ্ণনগর, হাঁসখালি, মাজদিয়া, নবদ্বীপ, রানাঘাট প্রভৃতি এলাকার নমঃশূদ্র জাতির মানুষ মতুয়া মহাসংঘের ছত্রছায়ায় আসতে থাকেন। এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতীহয়ে তিনি বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে, পুনরায় জাতীয় কংগ্রেস যোগদান করেন।[২১]

অপরদিকে যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল উদ্বাস্তু আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর নেতৃত্বে বিভিন্ন কলোনি, শরণার্থী শিবির এবং পুনর্বাসিত নমঃশূদ্রদের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধী উদ্বাস্তু রাজনৈতিক ধরার বিকাশ হতে দেখা যায়। অর্থাৎ এক দিকে কেবল মাত্র জাতি চেতনাকে

অবলম্বন করে রাজনীতিতে অংশীদারিত্ব আদায় করার প্রয়াস। অপর দিকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় জাতি চেতনাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা দেখা যায়। এই উভয় মুখী রাজনৈতিক কর্ম প্রক্রিয়ার প্রতিফলন দেখা যায় পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন গুলিতে।

১৯৫৭ এর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে মোট আসন সংখ্যা ছিল ২৫২টি এরমধ্যে তপশিলি জাতির জন্য ৪২টি এবং তপশিলি উপজাতিদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত হয়। এই নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৩৪ টি, বামফ্রন্ট ৮টি আসন এবং অন্যান্যরা একটি আসন জয় করতে সক্ষম হন।[২২]

নির্বাচনে নমঃশূদ্র জাতির প্রার্থীরা ছিলেন, ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেসের মনিন্দ্র ভূষন বিশ্বাস। তিনি ৩০,৬৩৩ ভোট পেয়ে জয় লাভ করেন। এই কেন্দ্রের অপর দুজন স্বতন্ত্র নমঃশূদ্র জাতির স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ছিলেন যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল (IND)। তিনি পেয়েছিলেন সর্বমোট ১৫,৮৫২টি ভোট। মুকুন্দ বিহারী মল্লিক (IND) পেয়েছিলেন ২,০৭২টি ভোট।[২৩] হাওড়ার সাঁকরাইল কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লক দলের থেকে জয়লাভ করেছিলেন নমঃশূদ্র জাতির প্রার্থী অপূর্বলাল মজুমদার (৩৩,৪৯৮ ভোট)। তিনি কেন্দ্রটিতে ২৭.৪৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন।

নদীয়ার হরিণঘাটা কেন্দ্র থেকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর ৪০,৭৯৭ ভোট পেয়ে জয় লাভ করেন। এই কেন্দ্রে অপর নমঃশূদ্র প্রার্থী ছিলেন সি.পি.আই. দলের প্রভাস চন্দ্র বিশ্বাস। তিনি ৩৪,৬৭৭ ভোট পেয়েছিলেন। নদীয়ার নাকাশিপাড়া সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে মতুয়া ভক্ত তথা গুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থের রচয়িতা মহানন্দ হালদার। তিনি ৪২,৫৮৫ ভোট পেয়ে জয়ী হন। এ ছাড়া নওদা কেন্দ্র থেকে নমঃশূদ্র জাতির নির্দল প্রার্থী হিসেবে শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ৭,৬২৮ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়ে ছিলেন।

১৯৫৭ সালের নির্বাচন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে নমঃশূদ্র জাতির প্রার্থী অংশগ্রহণে উৎসাহী হয়েও জাতি রাজনীতির পূর্ববর্তী ধারা পুনরুজ্জীবিত করতে অসক্ষম হয়েছিলেন। একদিকে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর এবং মহানন্দ হালদারের মত মতুয়া পন্থী নেতারা কয়েকটি কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতিতে নমঃশূদ্রদের আস্থা পুঞ্জিভূত করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন। অপূর্ব লাল মজুমদার জাতি রাজনীতির আবেগের পাশাপাশি ফরওয়ার্ড ব্লক দলের সমর্থনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অপরদিকে যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল এবং মুকুন্দ বিহারী মল্লিকের মতন জাতি রাজনীতি পন্থীনেতা নির্বাচনী রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ছাপ ফেলতে অসমর্থ হয়েছিলেন।

১৯৬২ নির্বাচনে তপশিলিদের জন্য সংরক্ষিত ৪২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৩১টি আসন, সি.পি.আই. ৫টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ৩টি, রিভলিউশনারি সোশালিস্ট পার্টি, একটি, পি.এস.পি. ২টি, এস.বি.পি. একটি, এল.এস.এস. একটি এবং অন্যান্যরা একটি আসনে জয়লাভ করেন।[২৪]

এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারি নমঃশূদ্র জাতির প্রার্থীদের বিবরণ পাওয়া যায়। নদীয়ার চাপরা সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে সংযুক্ত বিপ্লবী পরিসহ (Sanjukta Biplabi Parisaha) দলের প্রার্থী হিসেবে মহানন্দ হালদার ১৬,০৭৫ ভোট পেয়ে জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে (১৫,২৫৪ ভোট) পরাজিত করেন।[২৫] হাঁসখালি সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে মতুয়া মহাসঙ্ঘের সংঘাধিপতি প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর। তিনি ১৬,৯১৯ ভোট পেয়ে সি.পি.আই. প্রার্থী জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে (১৩,১৫৭ ভোট) পরাজিত করেন। এই কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হিসেবে যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল ১১,৮৭৮ ভোট পেয়েছিলেন, যা ছিল ওই কেন্দ্রের মোট বৈধ ভটের ২৭.২৮ শতাংশ।

২৪ পরগনার বাগদা সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী মনিন্দ্র ভূষণ বিশ্বাস (২১,১৫১ভোট) জয় লাভ করেন। দ্বিতীয় কেন্দ্রে থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে নমঃশূদ্র নেতা যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল ১১,১৫৩ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করেন। যা ছিল মোট ভোটের ২৪.০৮ শতাংশ। কেন্দ্রটিতে সি.পি.আই. প্রার্থী ছিলেন সুশান্ত কুমার হালদার (৮,৮৭০ ভোট), হিন্দু মহাসভা দলের হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন অনিল কুমার বিশ্বাস। এছাড়া নির্দল প্রার্থী ছিলেন মাদার চন্দ্র মন্ডল।[২৬]

হাওড়ার পাঁচলা অসংরক্ষিত কেন্দ্রে থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী অপূর্ব লাল মজুমদার ১৭,৮৮৬ ভোট পেয়ে জাতীয় কংগ্রেসের মনিলাল বসুকে (১৭,৮৬৭ ভোট) পরাজিত করেন। এছাড়া বিভিন্ন কেন্দ্রে নমঃশূদ্র প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পরাজিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপারা সংরক্ষিত কেন্দ্রে পি.এস.পি. প্রার্থী সমীর বিশ্বাস (১,২১৭ ভোট), রানাঘাট সাধারণ বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রে থেকে পি.এস.পি. দলের নমঃশূদ্র প্রার্থী অসীম কুমার মজুমদার এবং নির্দল প্রার্থী রামপদ বিশ্বাস উল্লেখ যোগ্য।

১৯৫২ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে নমঃশূদ্র নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল, প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, অপূর্ব লাল মজুমদার, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব। প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর ১৯৫১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে গাইঘাটা কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে সর্বমোট ২,৬৪২টি ভোট পেয়েছিলেন, যা ছিল মোট ভোটের ১১.২৪ শতাংশ মাত্র।

পরবর্তী নির্বাচনে অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে কংগ্রেস প্রার্থী রূপে নদীয়ার হরিণঘাটা কেন্দ্রে ৪০,৭৯৭ ভোট অর্থাৎ সর্বমোট ভোটের ২৫.৮৮ শতাংশ এবং ১৯৬২ সালের নির্বাচনে নদীয়ার হাঁসখালি কেন্দ্র থেকে ১৬,৯১৯ ভোট অর্থাৎ মোট ভোটের ৩৮.৮৬ শতাংশ পেয়ে

সাংসদ নির্বাচিত হন। এই সময় তিনি বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় তপশিলি ও আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২৭]

১৯৬২ সালে ড. বিধান চন্দ্র রায়ের মৃত্যু পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। ১৯৬৩ সালে কাশ্মীরের হযরতবাল কাণ্ডে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, এই পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বাস্তুদের উপর পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৯৬৪ সালের ৬ই মার্চ তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন।[২৮]

অবিভক্ত বাংলায় নমঃশূদ্র তথা তপশিলি জাতি রাজনীতির অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল। তিনি ১৯৫১ সালের নির্বাচনে বেনিয়াপুকুর বালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে ২.৭৬ শতাংশ ভোট পেয়ে দশমতম স্থান লাভ করেছিলেন। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে, তিনি বনগাঁ কেন্দ্রের থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে ১০.১৩ শতাংশ ভোট পেয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৯৬২ এর নির্বাচনে তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে দুইটি কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। হাঁসখালি কেন্দ্রে ২৭.২৮ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান এবং বাগদা কেন্দ্রে ২৪.০৮ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৭ পরবর্তী ভারতে তিনি উদ্বাস্তু রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

পশ্চিম বঙ্গের উদ্বাস্তু আন্দোলনের নবীন নমঃশূদ্র নেতা অপূর্বলাল মজুমদারকে নির্বাচনে ফরওয়ার্ড ব্লক দলের হয়ে প্রার্থী হতে দেখা যায়। ১৯৫৭ সালে তিনি হাওড়ার সাঁকরাইল কেন্দ্রে থেকে ২৭.৪৬ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন। ১৯৬২ সালে হাওড়ার পাঁচলা অসংরক্ষিত কেন্দ্রে থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী হয়ে ৪৮.৩৩% ভোট পেয়ে জয়ী হন।

এখানে দেখা যাচ্ছে যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল, প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, অপূর্ব লাল মজুমদার, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক প্রভৃতি রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবশালী মতুয়া এবং নমঃশূদ্র তথা

তপশিলি নেতাদের পারস্পরিক মতাদর্শগত পার্থক্যর কারণে জাতি রাজনীতির জন্য প্রয়োজনীয় জাতি চেতনার মঞ্চ গড়ে উঠেনি।

অপরদিকে ১৯৬২ সালের নির্বাচনে সংযুক্ত বিপ্লবী পরিসহ (এস.বি.পি) নামক একটি নতুন দল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে ১৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই দলটি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রতিনিধিদের সংখ্যাগুরু ছিলেন মতুয়া পন্থী নমঃশূদ্র নেতা। একমাত্র নদীয়ার চাপরা সংরক্ষিত আসনটিতে দলের প্রার্থী হিসেবে মহানন্দ হালদার জয়লাভ করতে সক্ষম হয়। দলটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী আসনে গড়ে ৮.৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিল।[২৯] পরবর্তী নির্বাচনে রাজনীতিক দলটিকে গুরুত্ব হারাতে দেখা যায়। ১৯৫৬ সালে ড. বি.আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে গঠিত রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া জাতি রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়।

৩.২.৩ ১৯৬৭-১৯৭৬ যুক্তফ্রন্টের আমলে জাতি রাজনীতিতে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা

১৯৬২ সালের নির্বাচনের পর থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে ভারত-চীন যুদ্ধ (১৯৬২), কাশ্মীরের হযরতবাল (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩) ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে ভারত পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ও উদ্বাস্তু প্রবাহের বৃদ্ধি হতে দেখা যায়। অপরদিকে ড: বিধান চন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পরে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক শূন্যতা ও অস্থিরতা পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। এই সময় কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক ক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় এবং কংগ্রেস বিভাজিত হয়ে নতুন দল হিসেবে বাংলা-কংগ্রেস অপরদিকে সি.পি.আই. দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, বিক্ষুব্ধ নেতারা সি.পি.আই.(এম) নামক নতুন দল গঠন করেন।[৩০] রাজনৈতিক দলগুলি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পরস্পর দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি ছিল ইউনাইটেড লেফটিস্ট ফ্রন্ট এবং অপরটি ছিল পিপলস ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট। এমতো পরিস্থিতিতে ১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচন উপস্থিত

হয়। এই বিধানসভায় মোট আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮০টি। তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা হয় ৫৪টি। এর মধ্যে কংগ্রেস ২৩টি আসন, ইউনাইটেড লেফটিস্ট ফ্রন্ট (সি.পি.আই.এম. ৮টি, এস.এস.পি. ৩টি, এস.ইউ.সি.আই. ১টি ও এম.এফ.বি.) জোট সর্বমোট ১২টি আসনে জয়ী হয়। অপরদিকে পিপলস ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট (বাংলা কংগ্রেস ১০, সি.পি.আই. ১ ও ফরওয়ার্ড ব্লক ৬) জোট ১৭টি আসনে জয় লাভ করতে সক্ষম হন। জনসংঘ একটি আসন এবং পি.এস.পি একটি আসন দখল করে।[৩১]

সরণি: ৩.২.৩. ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা নির্বাচনে তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব

সাল	মোট আসন	তপশিলি আসন	মোট ভোটার	ভোট শতাংশ
১৯৬৭	২৮০	৫৪	২০২৪০০৯৮	৬৬.১০
১৯৬৯	২৮০	৫৩	২০৬৮৫১১০	৬৬.৫৭
১৯৭১	২৭৯	৫৫	২২৬৪৭৭৮	৬২.০৩
১৯৭২	২৮০	৫৫	২২৫৫৪৫৪৫	৬০.৮২

সুত্র: Statistical Report on General Election, The Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi, 1967 to 1972; রূপ কুমার বর্মণ: জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক: পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান, কলকাতা, আলফাবেট বুকস, ২০১৯, পৃ. ৮৭।

১৯৬৭ এর বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারি নমঃশূদ্র জাতির প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন হাঁসখালি সংরক্ষিত কেন্দ্রে বাংলা কংগ্রেসের চারুমিহির সরকার। তিনি ৩৩,২৯৮ ভোট পেয়ে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী আর.কে. মল্লিককে পরাজিত করেছিলেন। ২৪ পরগনার বাগদা সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্রে থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী অপূর্বলাল মজুমদার ৩২,২৬৩ ভোট পেয়ে, জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী এম.বি. বিশ্বাসকে (১৩,১২৪ ভোট) পরাজিত করেন। দ্বিতীয় নির্বাচনী কেন্দ্র হিসেবে হাওড়া উত্তর উলুবেড়িয়া কেন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে অপূর্বলাল মজুমদার ১৯,৮১২ ভোট পেয়েছিলেন। এখানে সি.পি.এম. প্রার্থী ছিলেন আর.কে. মন্ডল (১৭,৫৭৪ ভোট)।

এই নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী ইউনাইটেড লেফটিস্ট ফ্রন্ট এবং পিপলস ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট সংযুক্ত হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন অজয় মুখার্জি, উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু [সি.পি.আই.(এম.)], ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী হন হরেকৃষ্ণ কোঙার [সি.পি.আই.(এম.)] পূর্তমন্ত্রী ছিলেন হেমন্ত কুমার বসু (ফরওয়ার্ড ব্লক), প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের (২২শে মার্চ-২০শে নভেম্বর, ১৯৬৭) সময়কালে তপশিলি জাতির থেকে মন্ত্রিসভায় মাত্র ৫ শতাংশ অংশীদারিত্ব ছিল।

বাংলা কংগ্রেসের হাঁসখালি বিধানসভার নমঃশূদ্র জাতির বিধায়ক চারুমিহির সরকার ছিলেন অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বধীন সরকারে একমাত্র তপশিলি জাতির মন্ত্রী। তিনি সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছিলেন।[৩২] এই মন্ত্রীসভায় ফালাকাটা কেন্দ্রের রাজবংশী এস.এস.পি. প্রার্থী জগদানন্দ রায় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রীসভায় স্থান পেয়েছিলেন।

নির্বাচনে বামফ্রন্ট দলের দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কারের সম্পর্কিত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধ শুরু হয়। যার ফলস্বরূপ ১৯৬৭ সালের ২রা নভেম্বর ১৭ জন বিধায়ক নিয়ে ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ সরকার ত্যাগ করে প্রগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন করেন। ড. ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত সরকার, বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত করতে না পারায়, ১৯৬৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি বিধানসভা স্থগিত রেখে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী কালীন নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।[৩৩]

১৯৬৯ এর নির্বাচনে তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১২টি, সি.পি.আই. ২টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ৮টি, সি.পি.আই.(এম.) ১৫টি, বাংলা কংগ্রেস ১০টি, এস.ইউ.সি.আই. ৩টি, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি ৩টি এবং আর.এস.পি. ২টি আসন দখল করতে সক্ষম হয়।[৩৪]

এই নির্বাচনে হাঁসখালি সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্রেটিতে বাংলা কংগ্রেসের নমঃশূদ্র প্রার্থী ছিলেন চারুমিহির সরকার। তিনি ২৫,৯৫৭ ভোট পেয়ে জয় লাভ করেছিলেন। এছাড়া এই কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন, আনন্দ মোহন বিশ্বাস (২২,৯১৭ ভোট), ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন মতুয়া মহাসঙ্ঘের সংঘাধিপতি কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর (৯৯৫ ভোট) এবং পি.বি.আই. প্রার্থী ছিলেন দেবাশীষ মন্ডল।[৩৫]

২৪ পরগনার বাগদা সংরক্ষিত বিধানসভা কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লকের নমঃশূদ্র প্রার্থী অপূর্ব লাল মজুমদার (২৩৮৮৫ ভোট) তাঁর নিকটতম জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী চিত্ত রঞ্জন রায় (১৭,৭৪৬ ভোট)কে পরাজিত করেছিলেন। কেন্দ্রটিতে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার প্রার্থী ছিলেন খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (৩,৩৮২ ভোট)।[৩৬]

অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারে (১৯৬৯) মন্ত্রিসভায় প্রথম যুক্তফ্রন্টের পুনরাবৃত্তি ঘটে। চারুমিহির সরকারকে পুনরায় সমষ্টি উন্নয়নের দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৩৭] যুক্তফ্রন্টে সরকারের সহযোগী হিসেবে ১৯৬৭-৭০ এর মধ্যবর্তী কালীন সময়ে সি.পি.আই. (এম.) তাদের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী প্রায় ১০ লক্ষ একর জমি খাসজমি হিসেবে ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে দাবী করা হয়।[৩৮] সি.পি.এম. দলের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত উদ্বাস্তু এবং ভূমিহীনদের জমির অধিকার দেওয়ার, এই রাজনৈতিক প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে ছিল। এই উদ্যোগ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চিত্রকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে ছিল।

১৯৭০ সালের ১৬ই মার্চ অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন। এই অচল পরিস্থিতিতে ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী, ১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি ছিল।[৩৯]

১৯৭১ সালের নির্বাচনে তপশিলি জাতির জন্য ৫৫টি এবং তপশিলি উপজাতিদের জন্য ১৬টি আসন সংরক্ষিত ছিল। এ নির্বাচনে তপশিলি জাতির সংরক্ষিত আসনের মধ্যে সি.পি.এম. ২৩টি, জাতীয় কংগ্রেস ১৯টি, সি.পি.আই. ২টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ২টি, এস.ইউ.সি. ৩টি, বাংলা কংগ্রেস ১টি, আর.এস.পি. ১টি, এবং অন্যান্যরা ৪টি আসনে জয়লাভ করে।[৪০]

২৪ পরগনার বাগদা সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী অপূর্ব লাল মজুমদার ১৯,৮৫১ ভোট পেয়ে জয়ী হন। এই কেন্দ্রের অপর নমঃশূদ্র জাতির প্রার্থী ছিলেন সি.পি.এম. এর কান্তি চন্দ্র বিশ্বাস ১৪,৫৮১ ভোট, বাংলা কংগ্রেসের মৃণালিনী বিশ্বাস ৫,৬০৮ ভোট এবং ভারতীয় জনসংঘের শশধর বিশ্বাস ৫৬৫ ভোট পয়েছিলেন।[৪১]

এই নির্বাচনে হাঁসখালি সংরক্ষিত কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী আনন্দ মোহন বিশ্বাস, ২৩,৬৫৮ ভোট পেয়ে জয় লাভ করেছিলেন। সি.পি.এম প্রার্থী ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (১৮,৬৩৮ ভোট), বাংলা কংগ্রেসের চারুমিহির সরকার পেয়েছিলেন ৪,৫৭৪ ভোট।[৪২]

এই নির্বাচনে হাঁসখালি কেন্দ্রের বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী চারুমিহির সরকার জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী আনন্দ মোহন বিশ্বাসের কাছে পরাজিত হন। ইতিপূর্বে তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে দুইবার মন্ত্রীত্ব পেয়েছিলেন। তৃতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারে ফালাকাটার রাজবংশী জাতির বিধায়ক জগদানন্দ রায় এবং ক্যানিং এর পৌণ্ড্র বিধায়ক গোবিন্দচন্দ্র নস্কর মন্ত্রীসভায় স্থান পয়েছিলেন। মন্ত্রীসভা গঠন হওয়ার তিন মাসের মধ্যে (২রা এপ্রিল, ১৯৭১ থেকে ২৯শে জুন, ১৯৭১) অজয় মুখার্জী পদত্যাগ করেন। অতঃপর ১৯৭২ সালে পশ্চিম বঙ্গে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৪৩]

১৯৭২ সালের নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত হয়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে জাতীয় কংগ্রেস শক্তিশালি দলে পরিণত হয়। এই নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস ৪৬ টি আসনে এবং তার সহযোগী হিসেবে সি.পি.আই. ৫টি

আসনে জয় লাভ করে ছিল। বিরোধী হিসেবে সি.পি.এম. ৩ টি আসনে এবং একজন নির্দল প্রার্থী জয়লাভ করতে সক্ষম হয়।[৪৪]

হাঁসখালি সংরক্ষিত কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেসের নমঃশূদ্র প্রার্থী আনন্দ মোহন বিশ্বাস ৩৩,৮২৯ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। সি.পি.এম. প্রার্থী মুকুন্দ বিশ্বাস পেয়েছিলেন ১৫,৫৬৯ টি ভোট।[৪৫] ২৪ পরগনার বাগদা সংরক্ষিত কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হিসেবে অপূর্ব মজুমদার ২৪,৭৬৯ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। এই কেন্দ্রে সি.পি.এম. প্রার্থী কান্তিচন্দ্র বিশ্বাস ১৪,৩৪৭ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছিলেন।[৪৬]

১৯৭২ বিধান সভায় সিদ্ধার্থশংকর রায়ের নেতৃত্বে পশিমবঙ্গে কংগ্রেসের স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত ২৯ সদস্যের মন্ত্রিসভায় কেবলমাত্র নমঃশূদ্র জাতির আনন্দমোহন বিশ্বাস কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ও পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর শিক্ষাদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন।[৪৭]

এছাড়া লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্র জাতির অংশীদারিত্ব ছিল নগণ্য। ড. বিধান চন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের লোকসভা ভোটে তিনি নবদ্বীপ থেকে বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছিলেন। তিনি ২,১৫,৪৬৩ ভোট পেয়ে জয়লাভ করে ছিলেন। কেন্দ্রটিতে কংগ্রেসের প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস ১,৩৬,৩৬৭ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছিলেন।[৪৮]

পরের বার ১৯৭১ সালে নবদ্বীপ থেকে লোকসভা ভোটে দাঁড়ান প্রমথ রঞ্জন। এই বার তিনি কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়িয়ে পরাজিত হন। সি.পি.এম.এর বিভা ঘোষ গোস্বামী পেয়েছিলেন ১,৭৬,৫৪৩ (৪৬.৮৮ শতাংশ) ভোট। পি.আর. ঠাকুর পেয়েছিলেন ১,৬৫,৯৪৩ (৪৪.০৬ শতাংশ) ভোট। ১৯৭৭ সালে নবদ্বীপ থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন। এবার তিনি ১৪.৬৮ শতাংশ ভোট পেয়ে ছিলেন।

১৯৩৭ সালে গুরুচাঁদের মৃত্যুর পর প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর (১৯০২-১৯৯০) এর নেতৃত্বে অনেক নমঃশূদ্র নেতা কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি আবার ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দলের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি জাতি রাজনীতির উত্থানের জন্য জাতীয় রাজনীতির শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রচেষ্টা তপশিলি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু জাতীয় রাজনীতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, নমঃশূদ্র তথা তপশিলি জাতি রাজনীতির উত্থানে সক্ষম হননি।

অপরদিকে ড. বি.আর. আম্বেদকর (৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৬) এর মৃত্যুর পর ভারতীয় জাতি রাজনীতির নেতৃত্ব প্রদানের, যে শূন্যতা তৈরি হয়ে ছিল। পশ্চিমবঙ্গের পেক্ষাপটে, তা পূরণ করার জন্য যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল অগ্রসর হয়েছিলেন। জাতিপন্থী রাজনীতির পথ অনুসরণ করে যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল পশ্চিমবঙ্গে স্বতন্ত্র জাতি রাজনীতির প্রেক্ষাপট তৈরি করার প্রয়াসে ব্রতী হন। তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেকিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সফল হলেও, স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচিতি গঠন করতে সক্ষম হননি।

১৯৬৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল বারাসাত কেন্দ্র থেকে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (RPI) এর প্রার্থী হয়ে ৮৪,৬৪৪ ভোট (২৪.০২ শতাংশ) পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন।[৪৯] ড. বি.আর. আম্বেদকরের অনুপ্রেরণায় গঠিত রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (১৯৫৭ সালের ৩রা অক্টোবর, নাগপুর) ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে জাতি রাজনীতির সম্ভাবনাকে উজ্জীবিত করে ছিল। কিন্তু গুরুচাঁদ ঠাকুর পরবর্তী যুগসন্ধিক্ষণের উঠে আসা নমঃশূদ্র জাতি চেতনা সম্পন্ন নেতা যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের ৫ই অক্টোবর ১৯৬৮ সালে বনগাঁর জনসভায় আকস্মিকভাবে মৃত্যুঘটে। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গের জাতি আন্দোলন আবার সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।

নমঃশূদ্র জাতি চেতনা উত্থানে অপর গুরুত্বপূর্ণ নেতা প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর ড. বিধান চন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি বাংলা কংগ্রেসের হয়ে নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন। ১৯৭১ সালে বাংলা কংগ্রেস পুনরায় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হলে, তিনি একই কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। এই নির্বাচনে তিনি ৪৪.০৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনে অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে নবদ্বীপ কেন্দ্রটি থেকেই নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে মাত্র ১৪.৬৮ শতাংশ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছিলেন।

পরবর্তীতে তিনি সরাসরি রাজনৈতিক সংসর্গ পরিত্যাগ করে মতুয়া মহাসঙ্ঘের মাধ্যমে জাতি চেতনা বৃদ্ধির প্রয়াসে ব্রতী হন। এমত পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বামপন্থী নেতৃত্বের হাতে হস্তান্তর হলে, নতুন নমঃশূদ্র নেতৃত্বের উত্থান ঘটতে শুরু করে। যা ছিল নমঃশূদ্র তথা তপশিলি জাতি রাজনীতির এক নতুন অধ্যায়।

৩.২.৪ ১৯৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত বামপন্থী রাজনীতিতে জাতি চেতনা ও নমঃশূদ্র জাতি

১৯৭৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মোট ২৯৪টি আসনের মধ্যে তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫৯টি। তপশিলি উপজাতির জন্য ১৭টি আসন। এই বছর নির্বাচনী রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। নির্বাচনে তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের মধ্যে সি.পি.এম. ৩৯টি, এস.ইউ.সি.আই. তিনটি, আর.এস.পি. ৩টি, কংগ্রেস সর্বমোট তিনটি আসন, ফরওয়ার্ড ব্লক পাঁচটি, জনতা পার্টি ৪টি, রিভলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (আর.সি.পি) ৩টি আসনে জয়লাভ করে।[৫০]

এ নির্বাচনে গাইঘাটা সাধারণ নির্বাচন ক্ষেত্রে সি.পি.এম. প্রার্থী কান্তিচন্দ্র বিশ্বাস ৩২,৬২০ ভোট পেয়ে জয়ী হন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন রাধাপদ বিশ্বাস (২৪,৫৬২ ভোট) এবং জনতা দলের প্রার্থী ছিলেন প্রবীর কুমার মজুমদার (৮৩৭৬ ভোট)।[৫১] তালতলা

সংরক্ষিত কেন্দ্রে থেকে সি.পি.এম. এর নমঃশূদ্র প্রার্থী ছিলেন সুমন্ত কুমার হীরা (১৮১১৪ ভোট)।[৫২]

বাগদা সংরক্ষিত কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী কমলাক্ষি বিশ্বাস ২৫০৪৯ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। এই কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী ছিলেন অপূর্ব লাল মজুমদার (২৪৯৬৬ ভোট), জনতা দল প্রার্থী ছিলেন সুনীল কুমার মন্ডল (৫৬১৯ ভোট)।[৫৩]

এই নির্বাচনে তপশিলি জাতির সকল আসনেই বামফ্রন্টের অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ হলেও একমাত্র সাধারণ নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে নমঃশূদ্র জাতির বিধায়ক কান্তি বিশ্বাস যুব ও পাসপোর্ট মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ছাড়া আর কোন তপশিলি জাতির বিধায়ককে মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হয়নি।[৫৪]

সরণি: ৩.২.৪. ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা নির্বাচনে তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব

সাল	মোট আসন	তপশিলি আসন	মোট ভোটার	ভোট শতাংশ
১৯৭৭	২৯৪	৫৯	২৫৯৮৪৪৭৪	৫৬.১৫
১৯৮২	২৯৪	৫৯	২৯৮৯৮০০৬	৭৬.৯৬
১৯৮৭	২৯৪	৫৯	৩৫৩৪৪২৫০	৭৫.৬৬
১৯৯১	২৯৪	৫৯	৪১৩৮৬৬২৭	৭৬.৮০
১৯৯৬	২৯৪	৫৯	৪৫৬১৯১৩২	৮২.৯৪
২০০১	২৯৪	৫৯	৪৮৬৮২৮৯৫	৭৫.২৯
২০০৬	২৯৪	৫৯	৪৮১৬৫২০১	৮১.৯৭

সুত্র: Statistical Report on General Election, The Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi, 1977 to 2006; রূপ কুমার বর্মণ: জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক: পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান, কলকাতা, আলফাবেট বুকস, ২০১৯, পৃ. ৮৭।

১৯৮২ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৪ টি আসনের মধ্যে তপশিলি জাতির জন্য ৫৯টি এবং তপশিলি উপজাতি জন্য ১৭ টি আসন সংরক্ষিত হয়। এই নির্বাচনে

সি.পি.এম. ৪২টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ৫টি, আর.এস.পি. ৩টি, সি.পি.আই. ১টি এবং এম. এফ. বি ২টি আসন লাভ করে।[৫৫]

এই নির্বাচনে গাইঘাটা সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে সি.পি.আই.(এম.) এর নমঃশূদ্র প্রার্থী ছিলেন কান্তি বিশ্বাস। তিনি মোট ভোটের ৫৫.৪৮ শতাংশ ভোট পেয়ে জয় লাভ করে ছিলেন।[৫৬] বাগদা সংরক্ষিত কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী কমলাক্ষি বিশ্বাস ৪১,৯৭৩ ভোট পেয়ে জয় লাভ করেন। এই কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেস থেকে দাঁড়িয়ে অপূর্ব লাল মজুমদার ৪০,০৭০ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছিলেন।[৫৭] তালতলা সংরক্ষিত কেন্দ্রে সি.পি.এম. এর জয় লাভকারী প্রার্থী ছিলেন সুমন্ত কুমার হীরা (৩৪৩৫৮ ভোট), এই কেন্দ্রের অপর একজন নমঃশূদ্র নির্দল প্রার্থী ছিলেন গঙ্গানাথ বিশ্বাস (১০১৫ ভোট)।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভাতেও (১৯৮২-৮৭) তপশিলি জাতির অবস্থানের আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। যদিও ১৯৮২ এর নির্বাচন তপশিলি জাতির সংরক্ষিত আসনের ৯১.৫২% দখল করে ছিল বামফ্রন্ট। কিন্তু মন্ত্রিসভায় তাঁরা মাত্র ৪.৪৪% পদ পেয়েছিলেন, যা তাঁদের আসন বা জনসংখ্যার তুলনায় অনেক কম। তবে এই মন্ত্রিসভায় নমঃশূদ্র জাতির কান্তি বিশ্বাস প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছিলেন আর রাজবংশী জাতির বনমালী রায় পেয়েছিলেন তপশিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রক।[৫৮]

১৯৮৭ সালের নির্বাচনে তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ছিল ৫৯টি। এরমধ্যে সি.পি.এম ৪৩টি., ফরওয়ার্ড ব্লক ৪ টি, আর. এস. পি. ৫ টি, জাতীয় কংগ্রেস ৩টি, এস. ইউ. সি. ১টি, সি.পি.আই. ১টি এবং নির্দল ২টি আসনে জয় লাভ করে।[৫৯]

এই নির্বাচনে নমঃশূদ্র জাতির প্রার্থীরা ছিলেন, গাইঘাটা সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে সি.পি.এম. প্রার্থী হিসেবে কান্তি বিশ্বাস। তিনি মোট ভোটের ৫৩.৩৭ শতাংশ ভোট পেয়ে জয় লাভ করেছিলেন।[৬০]

বাগদা সংরক্ষিত কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে অপূর্ব লাল মজুমদার ৪৪,৫১৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী কমলাক্ষি বিশ্বাস ৪৩,৯৩১ ভোট দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। এছাড়া নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রদ্যুৎ বিশ্বাস ৯২৬ ভোট এবং আশুতোষ মজুমদার ৭৪০ ভোট পেয়েছিলেন। ইতিপূর্বে অপূর্ব লাল মজুমদার ১৯৭৭ সালে নির্দল প্রার্থী হিসেবে পরাজিত হওয়ারপর ১৯৮২ সালে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে পরাজিত হলেও, এই বার তিনি জয়লাভ করেন।

তৃতীয় মন্ত্রিসভায় (১৯৮৭-৯১) নমঃশূদ্র জাতির কান্তি বিশ্বাস এবং রাজবংশী জাতির বনমালী রায় ছাড়াও রাজবংশী জাতির বিধায়ক শ্রীদীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া মন্ত্রিসভার স্থান পেয়েছিলেন।[৬১]

১৯৯১ সালে সর্বমোট আসন ছিল ২৯৪টি, তপশিলি জাতিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল ৫৯টি তপশিলি উপজাতির জন্য ১৭টি। এই নির্বাচনে সি.পি.এম. ৪৮টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ৫টি, আর.এস.পি. ৪টি, আর.সি.পি.আই.(আর.বি.) ১টি এবং নির্দল ১ আসনে জয়ী হয়। এই নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস কোন সংরক্ষিত আসনে জয়ী হতে পারেনি।[৬২]

এই নির্বাচনে বাগদা সংরক্ষিত নির্বাচন ক্ষেত্রে ফরওয়ার্ড ব্লকের কমলাক্ষি বিশ্বাস ৪৯,৫৪৮ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। জাতীয় কংগ্রেসের রামচন্দ্র বোস পেয়েছিলেন ৪২৭৬৫ ভোট, বিজেপির শশধর বিশ্বাস পেয়েছিলেন ১৪৪৯৬ ভোট, আই.পি.এফ. দলের রমেন বিশ্বাস ২৫৪৮ ভোট পেয়েছিলেন। বি.এস.পি. দলের হরিশ চন্দ্র মন্ডল ৯২৬ ভোট পেয়েছিলেন এবং নির্দল প্রার্থী অসীম বিশ্বাস ১৬৫ ভোট পেতে সক্ষম হন।[৬৩]

গাইঘাটা সাধারণ নির্বাচন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন সি.পি.এম. প্রার্থী কান্তি বিশ্বাস (৫৮,৬১৪ ভোট), তৃতীয় স্থানে বিজেপির সুধীর বিশ্বাস (১২৯৭৯ ভোট), চতুর্থ স্থানে মহেন্দ্র

বিশ্বাস (২৬০২ ভোট), পঞ্চম স্থানে আই.পি.এফ. দলের কেশবলাল বিশ্বাস (১৭৫০ ভোট), সপ্তম স্থানে নির্দল প্রার্থী ছিলেন বিকাশ বিশ্বাস (৩৯৭ ভোট)।[৬৪]

চতুর্থ বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় (১৯৯১ -১৯৯৬) কান্তি বিশ্বাস (নমঃশূদ্র) এবং দুজন রাজবংশী জাতির মন্ত্রী ছাড়াও প্রথম বারের জন্য ১ জন বাউড়ি ও ১ জন বাগদি জাতির বিধায়ক মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছিলেন। ফলত মন্ত্রী সভায় তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্বের হার সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৬৫]

অপরদিকে ১৯৮৪ সালে কাশীরাম তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক সশক্তিকরণের উদ্দেশ্যে বহুজন সমাজ পার্টি গঠন করেন। ১৯৯১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে বহুজন সমাজ পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা শুরু করে। এই বছর বি.এস.পি. পশ্চিমবঙ্গের ৯৭টি আসনের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী আসন গুলিতে দলটি গড়ে ০.৮৯ শতাংশ ভোট পেতে সক্ষম হয়ে ছিল।[৬৬]

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বমোট আসন ছিল ২৯৪ তপশিলি জাতি ৫৯ তপশিলি উপজাতি ১৭। নির্বাচনে সি.পি.এম. ৪০টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ৫টি, জাতীয় কংগ্রেস ৮টি, আর.এস.পি ৪, সি.পি.আই. একটি এবং নির্দল একটি আসনে জয়লাভ করেন।[৬৭]

এই নির্বাচনে বাগদা সংরক্ষিত কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লক দলের থেকে জয় লাভ করেন কমলাক্ষি বিশ্বাস (৫৯৫৮৮ ভোট)। তৃতীয় স্থানে ছিলেন বি.জে.পি প্রার্থী কিশোর বিশ্বাস (৭১৬৬ ভোট), চতুর্থ স্থানে বি.এস.পি.এর প্রার্থী গৌরাঙ্গ বালা (১,৮৮৩ ভোট), এ.এম.বি. প্রার্থী ছিলেন অসীম বিশ্বাস এবং নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, তারাশঙ্কর কীর্তনীয়া এবং অসীম বিশ্বাস।[৬৮]

সন্দেশখালি সংরক্ষিত নির্বাচন ক্ষেত্রে সি.পি.এম.এর বিজয়ী প্রার্থী ছিলেন কান্তি বিশ্বাস। তিনি ৬৫,৪৬৭ ভোট পেয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী রঞ্জিত কুমার দাস পেয়েছিলেন ৪৩,৫৮৯ ভোট। বিজেপি প্রার্থী ছিলেন দীনবন্ধু গায়েন (৮২০৫ ভোট)।[৬৯] হাঁসখালি সংরক্ষিত কেন্দ্রে বি.এস.পি.এর প্রার্থী ছিলেন সমর চন্দ্র রায় (২৫৮৫ ভোট)। রানাঘাট পূর্ব সংরক্ষিত কেন্দ্রে বি.এস.পি. প্রার্থী ছিলেন ধীমান বিশ্বাস (২৪৬৫ ভোট)।

পঞ্চম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় (১৯৯৬–২০০১) যেখানে তপশিলি জাতির উপস্থিতির হার ছিল ১০%। কান্তি বিশ্বাস (নমঃশূদ্র), দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া ও যোগেন চন্দ্র বর্মন (রাজবংশী), নিমাই চন্দ্র মাল (মাল), ও বিলাশি বালা সহিস]। মন্ত্রিসভায় তপশিলি জাতির এই অবস্থান বজায় ছিল মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে জ্যোতি বসুর পদত্যাগের (২০০০) পরও।[৭০] অপর দিকে এই নির্বাচন বি.এস.পি. দল ৪৮টি কেন্দ্রে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী কেন্দ্রে তাদের গড় প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ ছিল ১ শতাংশ।[৭১]

২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক নতুন রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটে। ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিধান সভায় নির্বাচনে তপশিলি জাতির জন্য ৫৯টি আসন সংরক্ষিত ছিল এবং তপশিলি উপজাতি জন্য ১৭ টি আসন। এই নির্বাচনে মোট তপশিলি আসনের মধ্যে সিপিএম ৩৭টি, আর এস পি ৪টি, ডাবলু.বি.এস.পি. ১টি, সি.পি.আই. ১টি, জাতীয় কংগ্রেস ৩টি, তৃণমূল কংগ্রেস ৭টি এবং নির্দল প্রার্থী একটি আসনে জয়লাভ করে।[৭২]

এই নির্বাচনে সন্দেশখালি সংরক্ষিত কেন্দ্রে জয় লাভ করেন সি.পি.এম. প্রার্থী কান্তি বিশ্বাস (৬৫২১৪ ভোট)। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন রঞ্জিত কুমার দাস (৩৮১১০ ভোট)।[৭৩] রানাঘাট সংরক্ষিত কেন্দ্রে সি.পি.এম. প্রার্থী ছিলেন অসীম বালা (৭৫,৯৭৩ ভোট)।

তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ড. রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (৭১,৬৩০ ভোট), চতুর্থ স্থানে বি.এস.পি. প্রার্থী মন্মথ বিশ্বাস (২,৪৬৬ ভোট)।

বাগদা সংরক্ষিত কেন্দ্রে জয়ীহন ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী কমলাক্ষি বিশ্বাস (৬১৯৩৬ ভোট)। তৃতীয় স্থানে ছিলেন বি.জে.পি. প্রার্থী অরবিন্দ বিশ্বাস (৮২৮৮ ভোট), চতুর্থ স্থানে ছিলেন বি.এস.পি. প্রার্থী চন্দন মল্লিক (১৭১৫ ভোট), পঞ্চম স্থানে এন.সি.পি. প্রার্থী বিশ্বপতি বিশ্বাস (৮১৩ ভোট)। কৃষ্ণগঞ্জ সংরক্ষিত নির্বাচনী ক্ষেত্রে চতুর্থ স্থানে বি.এস.পি. প্রার্থী অখিল বৈদ্য (২৬৫৪ ভোট), জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হারাধন শিকদার (২২৫৩ ভোট)।

পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক তপশিলি জাতির সমীকরণে ষষ্ঠ (২০০১-২০০৬) বাম মন্ত্রিসভায় (২০০৬-২০১১) তপশিলিদের অংশগ্রহণের হার ছিল ১৬.৬৬%। এরমধ্যে পাঁচ জন পূর্ণমন্ত্রী ও ৩ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কার্যনির্বাহের দায়িত্ব পেয়েছিলেন।[৭৪]

২০০৬ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বমোট আসন ছিল ২৯৪টি। তপশিলি জাতি জন্য ৫৯টি এবং তপশিলি উপজাতির জন্য ১৭টি আসন সংরক্ষিত হয়। তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের সি.পি.এম. ৪৪টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ৫টি, আরএসপি ৪টি ডব্লিউ বি.এস.পি. ১টি, এস.ইউ.সি. ১টি জাতীয় কংগ্রেস ২টি এবং তৃণমূল কংগ্রেস ২টি আসন দখল করতে সক্ষম হয়।[৭৫]

এই নির্বাচনে বাগদা সংরক্ষিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের কমলাক্ষি বিশ্বাস (৭৪,৯৯১ ভোট), এই কেন্দ্রে বি.এস.পি প্রার্থী ছিলেন চন্দন মল্লিক (৩১২১ ভোট)। বনগাঁ সাধারণ নির্বাচন ক্ষেত্রে পঞ্চম স্থানে আর.পি.আই.(এ.) প্রার্থী ছিলেন সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস। তিনি ১,২৯৮ ভোট পেয়েছিলেন।[৭৬]

এছাড়া বিভিন্ন কেন্দ্রে বি.এস.পি প্রার্থী ছিলেন যেমন নাটাবাড়ি কেন্দ্রে সুভাষ ব্যাপারী (১৭১৭ ভোট), গোয়ালপুকুর কেন্দ্রে নীরদ বিশ্বাস (৩১৩৫ ভোট), হরিশ্চন্দ্রপুরে ক্ষিতীশ বিশ্বাস (২৫৮৫ ভোট), আড়িয়াদহে ননীগোপাল টিকাদার (৩৩৭৮ ভোট), লালগোলায় ভরতচন্দ্র বিশ্বাস (১৯৪১ ভোট), পলাশীপাড়া কেন্দ্রে সুমিত্রা মন্ডল (২৪০৭ ভোট), রানাঘাট পূর্ব সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্রে চতুর্থ স্থানে বি.এস.পি. এর প্রার্থী মন্মথ বিশ্বাস (২,৫৩৪ ভোট)।[৭৭]

পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক তপশিলি জাতির সমীকরণে সপ্তম বাম মন্ত্রিসভায় (২০০৬-২০১১) তপশিলিদের অংশগ্রহণের হার ছিল ১৬.৬৬ শতাংশ। এরমধ্যে পাঁচ জন পূর্ণমন্ত্রী ও ৩ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কার্যনির্বাহের দায়িত্ব পেয়েছিলেন।[৭৮] নমঃশূদ্র জাতি চেতনার নিরিখে, ১৯৭৭ থেকে ২০১০ পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকারের সমকালীন নির্বাচনী রাজনৈতিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই কালপর্বে নবীন নমঃশূদ্র রাজনৈতিক নেতৃত্বের উত্থান পরিলক্ষিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কান্তি বিশ্বাস। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার গঠিত হলে, ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত 'যুব কল্যাণ' ও 'স্বরাষ্ট্র পাসপোর্ট' এই দুইটি দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৮২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব নির্বাহ করেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন অপূর্বলাল মজুমদার, ডক্টর সুমন্ত হীরা প্রভৃতি ব্যক্তিত্বগন।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নমঃশূদ্র তথা তপশিলি জাতি চেতনা নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। মার্কসবাদের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতাদর্শে সকল তপশিলি জাতি হয়ে পড়েছিল অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বিবেচিত হওয়া সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীর একটি অংশ। সামাজিক বৈষম্যের শিকার তপশিলি জাতি চেতনা মার্কসবাদী মতাদর্শের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে অর্থনৈতিক ভাবে শোষিত শ্রেণীর একটি

অংশে পরিণত হয়। এই মতাদর্শ নমঃশূদ্র জাতি চেতনাকে সমগ্রভাবে আচ্ছন্ন করে দেওয়ার প্রয়াস শুরু করে। এই পদ্ধতিতে জাতি বৈষম্যকে চোখের আড়াল করে অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাজনের উপর জোর দেওয়া হয়। জাতি চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে, এই প্রবণতাটি ছিল নেতিবাচক প্রক্রিয়া। যেখানে শ্রেণী-সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে জাতি চেতনাকে ব্যবহার করা শুরু হয়ে ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থা রাজনীতির প্রভাবে তপশিলি জাতি ও উপজাতির চেতনার পথ অবরুদ্ধ হয়ে ছিল। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, এ রাজ্যে বহু জন সমাজ পার্টির চরম ব্যর্থতা। ১৯৮৪ সালে কাশীরাম বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে বহুজন সমাজ পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আসছে। ১৯৯১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ৯৭টি আসনে বি.এস.পি প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এই বছর নির্বাচিত কেন্দ্রগুলিতে দলটি গড়ে ০.৮৩ শতাংশ ভোট পায়। ১৯৯৬ সালে ৪৮টি আসনে অংশগ্রহণ করেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী আসনগুলিতে গড়ে ১.০০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। ২০০১ সালের নির্বাচনে বি.এস.পি. ৩৮টি কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী কেন্দ্রে দলটি গড়ে ১.৩৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। ২০০৬ সালের নির্বাচনে ১২৮টি আসনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে গড়ে ১.৫৩ শতাংশ ভোট পায়। সর্বমোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ২৭৬২১৪। বহু জন সমাজ পার্টির নির্বাচনী পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী শাসন আমলে জাতি চেতনার অগ্রগতি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

এই পর্বে মতুয়া মহাসংঘ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছিল। ১৯৭৭ সালে যুক্ত সরকারের পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৯ সালের ১৬ই মে মরিচঝাঁপি গণসংহার সংগঠিত হয়। এই ঘটনাটি তৎকালীন রাজ্য সরকারের সন্ত্রাসের অভূতপূর্ব পদক্ষেপ। সরকারের এই ভূমিকা ছিল নমঃশূদ্র তথা উদ্বাস্তু

মানুষের কাছে অনভিপ্রেত আঘাত। কংগ্রেস শাসন আমলে, যে উদ্বাস্তুদের নিয়ে বামপন্থী দলের আন্দোলনের অভিমুখ শাসকের পদের দিকে ত্বরান্বিত করে ছিল। সরকারে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই বামপন্থী শাসকদের চারিত্রিক পরিবর্তন ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের বিস্মিত করে।

মরিচঝাঁপি গণসংহারে উদ্বাস্তু নমঃশূদ্র তথা তপশিলিদের জীবন সংগ্রামকে আরও দীর্ঘায়িত করে ছিল। এই রকম ঘটনা প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর এবং কয়েকটি নমঃশূদ্র সংগঠনকে রাজ্য এবং জাতীয় রাজনৈতিক দলের বাইরে গিয়ে মতুয়া আন্দোলন ও উদ্বাস্তু আন্দোলনের উপর গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টিতে উৎসাহিত করে। এই সময় থেকে নমঃশূদ্র তথা তপশিলি জাতির প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জাতি চেতনা ও জনমত গড়ে তোলায় উদ্যমী হতে দেখা যায়।

১৯৯০ সালে তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর স্ত্রী বীণাপানি ঠাকুর মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতির পদে আসীন হন। তাঁর নেতৃত্বে উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রসার ঘটে। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৯৪ সালের ২রা মার্চ কলকাতার শহীদ মিনারের পাদদেশে উদ্বাস্তুদের সমস্যার কথা তুলেধরা হয়।[৭৯]

২০০৩ সালে দেশভাগের বলি (Victim) উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নাগরিকত্ব সংশোধন আইন পাস করে। এই আইন অনুসারে ১৯৪৮ সালের ১৯ জুলাইয়ের পর, যারা পূর্ববঙ্গ এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন, তাদের বৈধ কাগজসহ প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে, নাগরিকত্ব পাওয়ার বিধান দেওয়া হয়। তৎকালীন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে এই আইন পাস করার ক্ষেত্রে সমর্থন করে ছিল, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস।

এই আইনের বিরুদ্ধে বাঙালি উদ্বাস্তু এবং মতুয়া মহাসংঘ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। ২০০৪ সালে মতুয়াধাম ঠাকুরনগরে অনশনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের সূচনা হয়। অনশনে নেতৃত্বদেন সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস। দিল্লি থেকে আম্বেদকরের গড়া সংগঠন আর.পি.আই.-এর লোকসভা সদস্য রামদাস আঠাবলে ঠাকুরনগরে উপস্থিত হন। তিনি অনশনকারীদের অনশন ভঙ্গ করান। ইতিমধ্যে কেন্দ্রে পুনরায় কংগ্রেস দলের সরকার গঠিত হয়। বীণাপাণি ঠাকুরের বড় ছেলে কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নাগরিকত্ব আইন পুনর্বিবেচনা করার আশ্বাস আদায় করতে সক্ষম হন।[৮০]

প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস সত্ত্বেও নাগরিকত্ব সমস্যা অধরা থেকে যায়। উদ্বাস্তুদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে মতুয়া মহাসংঘের অনুপ্রেরণায় গড়ে ওঠে 'নিখিল ভারত বাঙালি উদ্বাস্তু সমন্বয় সমিতি'। সুদীর্ঘ আন্দোলনের পর সংগঠনটি ২০২০ সালে সরকারি ভাবে নথিভূক্ত হয়।[৮১]

৩.২.৫. ২০১১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত নমঃশূদ্র জাতি চেতনার ধারা

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বৃহৎ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই বছর জাতীয় কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিষ্ঠিত তৃণমূল কংগ্রেস (১৯৯৮ সালের ১লা জানুয়ারি) দল পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘকালীন বামপন্থী শাসনের অবসান ঘটিয়ে এই নতুন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে নমঃশূদ্র তথা তপশিলি জাতি রাজনীতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছিল।

সরণি: ৩.২.৫. ২০১১ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা নির্বাচনে তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব

সাল	মোট আসন	তপশিলি আসন	মোট ভোটার	ভোট শতাংশ
২০১১	২৯৪	৬৮	৫৬২৮৩৪৫৭	৮৪.৩৩
২০১৬	২৯৪	৬৮	৬৫৯৩৯০০৬	৮২.৬৬
২০২১	২৯৪	৬৮	৭২৯২৪১০৬	৮১.৫৭

সুত্র: Statistical Report on General Election, The Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi, 2011 to 2021; রূপ কুমার বর্মণ: জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক: পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান, কলকাতা, আলফাবেট বুকস, ২০১৯, পৃ. ৮৭।

২০১০ সালে মতুয়া মহাসংঘ ও উদ্বাস্তু সংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগে উদ্বাস্তুদের জন্য নাগরিকত্বেরআন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। নাগরিকত্বের দাবিতে এই বছরের ২৮শে ডিসেম্বর কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে বীণাপাণি ঠাকুরের সভাপতিত্বে বিশাল সমাবেশ আয়োজিত হয়। এই সমাবেশে উদ্বাস্তু নমঃশূদ্রদের দাবির সমর্থনে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন শাসক দলের মন্ত্রী গৌতম দেব, কংগ্রেসের ড. মানস ভুঁইয়া, বিজেপির তথাগত রায়, এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মুকুল রায় প্রভৃতি নেতা।[৮২]

অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ বামপন্থী সরকার ২০১০ সালে মতুয়া ভক্তদের প্রসন্ন করার জন্য হরিচাঁদ গুরুচাঁদের কর্মধারা প্রসারের কৃতিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে ‘হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ পুরস্কার’ প্রদান শুরু করে।[৮৩] অর্থাৎ মতুয়া ও নমঃশূদ্র ভোট তহবিল নিজেদের দিকে রাখার প্রয়োজনে তৎকালীন পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলের উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

মতুয়া ও নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের দাবিকে সমর্থন করায়, তৎকালীন বিরোধী রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস সংসদীয় রাজনীতিতে মতুয়া মহাসঙ্ঘের সমর্থন লাভ করে ছিল। পরবর্তী ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দেখা যায় বীণাপাণি ঠাকুরের ছোট ছেলে

মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর, ড. উপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, রমেন বিশ্বাস প্রভৃতি নেতা তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ছিলেন।

২০১১ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বমোট আসন ছিল ২৯৪ তপশিলি জাতি জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬৮টি। নির্বাচন কংগ্রেস ৯টি, সি.পি.এম. ১০টি, আর.এস.পি. ২টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ৪টি, সি.পি.আই ১টি, এস ইউ.সি. ১টি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ৪১টি তপশিলি আসনে জয়ী হয়।[৮৪]

এই নির্বাচনে বাগদা সংরক্ষিত নির্বাচনক্ষেত্র তৃণমূল কংগ্রেসের নমঃশূদ্র জাতির প্রার্থী উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ৯১,৮২১ ভোট পেয়ে জয়ীহন। কেন্দ্রটিতে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী ছিলেন মৃণাল কান্তি শিকদার (৭০,৮৬৫ ভোট), বি.এস.পি এর চন্দন মল্লিক ৪,৪১৪ ভোট, বি.জে.পি. এর অরবিন্দ বিশ্বাস পেয়েছিলেন ৪,৩০৬ ভোট।[৮৫]

গাইঘাটা সংরক্ষিত নির্বাচন ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর ৯১,৪৮৭ ভোট পেয়ে জয় লাভ করেছিলেন। সি.পি.এম. প্রার্থী মনোজ কান্তি বিশ্বাস পেয়েছিলেন ৬৬০৪০ ভোট, বি.জে.পি. প্রার্থী ছিলেন সুখরঞ্জন ব্যাপারী (৩৪৪০ ভোট), বি.এস.পি. প্রার্থী মহেন্দ্র গায়েন (১৪৩৬ ভোট)। এছাড়া স্বরূপনগর সংরক্ষিত ক্ষেত্রে আর.পি.আই.(এ.) প্রার্থী সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস (৪০৬৯ ভোট), এবং বি.এস.পি. প্রার্থী রেনুকা সরকার (১২৮৬ ভোট) নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে পরাজিত হয়েছিলেন।[৮৬]

এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র জাতি তথা তপশিলি জাতির অকুণ্ঠ সমর্থনে ক্ষমতায় আসীন হয়। এই সরকারে গঠিত মন্ত্রিসভায় বাগদা কেন্দ্রের নমঃশূদ্র বিধায়ক উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। গাইঘাটা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের পুত্র মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর শরণার্থী, ত্রাণ ও পুনর্বাসন

বিভাগে স্বাধীন প্রতিমন্ত্রী এবং ক্ষুদ্র, কুটির শিল্প, এবং বস্ত্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তথাপি প্রথম তৃণমূল মন্ত্রিসভায় তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র ৬ শতাংশ।[৮৭]

২০১৬ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বমোট আসন ছিল ২৯৪টি। তপশিলি জাতি জন্য ৬৮টি আসন সংরক্ষিত ছিল। এই নির্বাচনে মোট তপশিলি আসনের মধ্যে টি.এম.সি. ৫০টি, জাতীয় কংগ্রেস ৮টি, সি.পি.এম. ৯টি, এবং ফরওয়ার্ড ব্লক একটি আসন পেতে সক্ষম হয়।[৮৮]

এই নির্বাচনে গাইঘাটা সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্র তৃণমূলের তপশিলি প্রার্থী ছিলেন পুলিন বিহারী রায়। তিনি ৯৩,৮১২ ভোট পেয়ে জয় লাভ করেন। এই কেন্দ্রে সি.পি.এম. প্রার্থী ছিলেন কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর। তিনি ৬৪,২৪০ ভোট পেয়েছিলেন। বি.জে.পি. এর শংকর ঠাকুর ২৮,৭৯৬ ভোট পেয়েছিলেন। এই কেন্দ্রে বি.এস.পি. প্রার্থী ছিলেন অনিল বৈরাগী (১৫০২ ভোট)।[৮৯]

বাগদা সংরক্ষিত আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ৮৯,৭৯০ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। বি.জে.পি. এর বিভা মজুমদার ৮,৯৯৬ ভোট এবং বিকাশ বিশ্বাস ১,৫৩৮ ভোট পেয়েছিলেন।[৯০]

বনগাঁ দক্ষিণ সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস ছিলেন সুরজিৎ বিশ্বাস (৯২৩৭৯ ভোট), এছাড়া বি.জে.পি. এর স্বপন মজুমদার (২৪৩৮৪ভোট), এবং বি.এস.পি প্রার্থী ছিলেন প্রদীপ কুমার সরকার (১৬১৬ ভোট)।[৯১]

এ ছাড়া কালনা সংরক্ষিত নির্বাচন ক্ষেত্র দ্বিতীয়তম স্থানে ছিলেন সি.পি.এম. প্রার্থী মুকুলচন্দ্র শিকদার (৭২১৬৯ ভোট), বি.এস.পি প্রার্থী ছিলেন রাধে শ্যাম মন্ডল (১৯৭৬ ভোট)। হরিণঘাটা সংরক্ষিত নির্বাচন ক্ষেত্রে তৃতীয় স্থানে বি.জে.পি. এর প্রার্থী সুরেশ

সিকদার (১৪৭৯৩ ভোট), ষষ্ঠ স্থানে বি.এস.পি. প্রার্থী ছিলেন বিদ্যুৎ মল্লিক (১৫৮৮ ভোট), পি.ডি.এস. প্রার্থী ছিলেন মাধব বিশ্বাস (১৫৭০ ভোট)।

২০১১ সালের নির্বাচনে নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে মতুয়া ও নমঃশূদ্র নেতাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার সমীকরণ চোখে পড়ার মতো হলেও, ২০১৬ সালের নির্বাচনে তা ছিল আগের তুলনায় দুর্বল। যদিও এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি থেকে তপশিলিদের জন্য সংরক্ষিত আসন সহ মোট আসনের যথাক্রমে ৭০টি ও ৮৪টি আসনে তপশিলি প্রার্থী মনোনয়ন পেয়েছিলেন।[৯২] সামগ্রিকভাবে তপশিলি আসনে জয় লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে ছিল। তথাপি মন্ত্রী সভায় নমঃশূদ্র, মতুয়া তথা তপশিলি নেতাদের অংশীদারিত্ব লক্ষণীয়ভাবে কম হতে দেখা যায়। দ্বিতীয় তৃণমূল মন্ত্রিসভায় তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র ১০ শতাংশ।[৯৩]

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বীণাপাণি দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে বনগাঁ কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে, উপনির্বাচনে ওই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুরের মতপার্থক্য দেখাদেয়। এই ঘটনার পর তিনি দল পরিবর্তন করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। এই সংঘাত বীণাপাণি দেবীর পরিবারের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের বিষয়টি সর্বসমক্ষে নিয়ে আসে। ২০১৯ সালের লোকসভায় নির্বাচনে মতুয়া প্রধান দুই লোকসভা কেন্দ্র বনগাঁয় শান্তনু ঠাকুর ও রানাঘাটে জগন্নাথ সরকার বিজেপির হয়ে বড় ব্যবধানে জয় করে ছিলেন।

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই নির্বাচনে অসংরক্ষিত আসনে তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায় থেকে তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থী

চয়নের মানসিকতা দেখা যায়। পৌণ্ড্র, রাজবংশী ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রার্থী অসংরক্ষিত আসন থেকে জয়ী হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় প্রবেশ করেন।[৯৪]

এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বমোট আসন ছিল ২৯৪টি। তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ছিল ৬৮টি। এরমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ৩৪টি এবং বি.জে.পি ৩২টি আসনে জয় লাভ করে। এইবার তৃণমূল থেকে ৭১ জন এবং বিজপি থেকে ৮৮ জন তপশিলি প্রার্থী মনোনয়ন পেয়েছিলেন।[৯৫] এই নির্বাচনে রাজবংশী জাতি থেকে ১৭ জন, পৌণ্ড্র জাতি থেকে ১৩ জন, নমঃশূদ্র জাতি থেকে ১৩ জন এবং, বাগদি জাতি থেকে ১০ জন প্রার্থী জয় লাভ করেন।[৯৬]

বলাগর সংরক্ষিত নির্বাচনক্ষেত্র তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন দলিত সাহিত্যের লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। তিনি ১,০০,৩৬৪ ভোট পেয়ে নিকটতম বিজেপি প্রার্থী সুভাষ চন্দ্র হালদার (৯৪,৫৮০ ভোট) কে পরাজিত করেন। এই কেন্দ্রে সি.পি.এম প্রার্থী ছিলেন মহামায়া মন্ডল (১৯,৭৬৬ ভোট), এস.ইউ.সি.আই. প্রার্থী ছিলেন সুকদেব বিশ্বাস।[৯৭]

কেশপুর সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের নমঃশূদ্র জাতির প্রার্থী ছিলেন শিউলি সাহা। তিনি ১,১৬,৯৯২ ভোট পেয়ে জয় লাভ করেন।[৯৮]বনগাঁ উত্তর সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়া ৯৭৭৬১ ভোট পেয়ে জয়ী ঘোষিত হন।

গাইঘাটা সংরক্ষিত নির্বাচনক্ষেত্র বি.জে.পি.এর প্রার্থী ছিলেন সুব্রত ঠাকুর। তিনি ১,০০,৮০৮ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন নরোত্তম সরকার (৯১,২৩০ ভোট), সি.পি.এম. প্রার্থী কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর পেয়েছিলেন ১৪,৮৩৮ ভোট, নির্দল প্রার্থী ছিলেন ড. সজল বিশ্বাস (১৫২৬ ভোট)।[৯৯]

হরিণঘাটা সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্র বি.জে.পি. এর জয়ী প্রার্থী ছিলেন কবিয়াল অসীম কুমার সরকার (৯৭,৬৬৬ ভোট)। সি.পি.এম. প্রার্থী অলকেশ দাস পেয়েছিলেন ২৪,৮০০ ভোট, বি.এস.পি. প্রার্থী সমীর বিশ্বাস পেয়েছিলেন ১,১৫৩ ভোট।[১০০]

২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে টি.এম.সি. ২১৩ টি আসনে জয় লাভ করে সরকার গঠন করে। বিজেপি ৭৭টি আসনে জয় লাভ করে বিধানসভায় বিরোধী দল হিসেবে নির্বাচিত হয়। সেকুলার ফ্রন্ট একটি এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা একটি আসনে জয়লাভ করে। সি.পি.এম. এবং জাতীয় কংগ্রেস কোন আসনে জয়ী হতে পারেনি। নির্বাচনে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলি জাতি সমূহ পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরে বিভাজিত হয় যায়। একটি অংশ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং অপর অংশটি কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপিকে সমর্থন করে।

অপরদিকে ২০১১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত নির্বাচনে জাতিপন্থী রাজনৈতিক দল বহু জন সমাজ পার্টি পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে নিজেদের অস্থিত্ব প্রকট করতে পারেনি। ২০১১ সালে ১৫০ টি আসনে ভোটে অংশগ্রহণ করেন। এই বছর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী আসনে গড়ে ১.২২ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। সর্বমোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ২,৯১,৬০২। অনুরূপভাবে ২০১৬ এবং ২০২১ সালেও বহু জন সমাজ পার্টির নির্বাচনী প্রভাব ছিল নিরাশা জনক।

তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রিসভায় তপশিলি জাতির অংশীদারিত্ব ছিল, মাত্র ৬ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ।[১০১] তবে ২০২১ সরকারে সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত ৮৪ জন বিধায়ক থেকে মাত্র ছয় জন মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন। এই ছয় জনের মধ্যে মাত্র তিন জন মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন। তাঁরা হলেন নমঃশূদ্র জাতির বিধায়ক শিউলি সাহা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, রাজবংশী জাতির পরেশ চন্দ্র অধিকারী বিদ্যালয় শিক্ষা ও পৌন্ড্র জাতির দিলিপ মণ্ডল পরিবহন দপ্তরে রাষ্ট্রমন্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছেন।[১০২]

২০২১ সালের নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় রাজনীতিকে এক অভূতপূর্ব সমীকরণের দোরগোড়ায় নিয়ে এসেছে। এই সমীকরণ নমঃশূদ্র তথা তপশিলি জাতি রাজনীতিকে খুবই প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। কারণ এই নির্বাচনে দুইটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের মেরুকরণের সমীকরণের অন্যতম মূল উপজীব্য বিষয় ছিল নাগরিকত্ব আইন।

এই আইনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ওতপ্রোতভাবে নমঃশূদ্র জাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগের ফলে ভারতের বাংলা প্রেসিডেন্সিতে বসবাসকারী নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ, মুসলিম শাসিত পূর্ব পাকিস্তানের অংশে পড়ে যায়। এমত পরিস্থিতিতে নমঃশূদ্র জাতির মানুষ দলে দলে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রবেশ করলে, তাদের উদ্বাস্তু পরিচিতি নিয়ে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হতে হয়।

স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও, এই সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধান না হওয়ার পেক্ষাপটে, এক সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাস বর্তমান। ১৯৫৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন পাশ হয়। এর পর ১৯৮৬, ১৯৯২, ২০০৩, ২০০৫ এবং ২০১৯ সালে সংশোধিত হয়। ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বরে ভারতের সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) পাস হয়। নাগরিকত্বের আইনি জটিলতার প্রসঙ্গে উদ্বাস্তু নমঃশূদ্র তথা মতুয়া সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি অংশ তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে চলে আসে, আরেকটি অংশ বিজেপি দলের পাশে দাঁড়ায়।

যার ফলশ্রুতি স্বরূপ ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে দ্বিমেরুকরণ ভোটের রাজনীতি দেখতে পাওয়া যায়। এর একদিকে ছিল ভারতীয় জনতা পার্টি এবং অপরদিকে, এই আইনের বিরোধীতায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেন। ফলত এই নির্বাচন দ্বিদলীয় নির্বাচনে পর্যবসিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের এই ঘটনা ছিল বহু দল বিশিষ্ট ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক সমীকরণ।

৩.৩. সিদ্ধান্ত উপসংহার এবং প্রশ্ন উত্থাপন:

আলোচিত অধ্যায়টিতে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা ও রাজনৈতিক পরিচিতির ক্রমবিবর্তনের কিছু চিত্র উঠে আসে। বাংলা বিভাজন (১৯৪৭) পরবর্তী পর্বে নমঃশূদ্র জাতির একটি বৃহৎ অংশ বাস্তুচ্যুত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিবাসিত হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সাংগঠনিক জাতি চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়ে আত্ম পরিচিতির বিবর্তনের সম্মুখীন হয়ে পড়ে ছিলেন।

বঙ্গের পূর্ব অংশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা নমঃশূদ্র জাতির মানুষজন সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে, নিজেদেরকে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অভিযোজিত করতে থাকেন। এর ফলস্বরূপ স্বাধীনতা উত্তর তপশিলি তথা নমঃশূদ্র জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভরকেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হয়ে ছিল। এই বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় ভূখণ্ডে এক নতুন জাতি চেতনা তথা জাতি রাজনীতির অধ্যায়ের সূচনা করে ছিল।

উদবাস্তুতার প্রাথমিক অবস্থা সামলে নেওয়ার পর এই জনগোষ্ঠীর মানুষ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করেন। এই বসতি সমূহের গঠন (Structure) অনুধাবন করলে, তাঁদের চিরাচরিত ঐক্যবদ্ধ ভাবে বসবাস করার ধারা পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের সঙ্গবদ্ধ ভাবে বসবাস করার এই প্রবণতা রাজ্যের বিভিন্ন জেলার জনবিন্যাসের সমীকরণ পরিবর্তন করে দিয়েছিল। ফলত নমঃশূদ্র জাতির এই জনবিন্যাস তাঁদের বিভিন্ন নির্বাচনী ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমীকরণ প্রভাবিত করতে সক্ষম করে তুলেছিল।

এই রকম কয়েকটি নমঃশূদ্র অধ্যুষিত নির্বাচনী ক্ষেত্রের মধ্যে, নাদিয়া জেলার নাকাশিপাড়া, রানাঘাট, তেহট্ট, হরিণঘাটা, চাপরা, হাঁসখালি, কৃষ্ণগঞ্জ, কৃষ্ণনগর, কল্যাণী, শান্তিপুর, নবদ্বীপ। মুর্শিদাবাদের নওদা, জঙ্গিপারা, খরগ্রাম, সাগরদিঘী, নবগ্রাম।

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা, গাইঘাটা, হাসনাবাদ, দেগঙ্গা, বনগাঁ, বারুইপুর, বাগদা, সন্দেশখালি, কালিনগর, হাড়োয়া, মগরাহাট, রাজারহাট, হিঙ্গলগঞ্জ, ক্যানিং, মন্দিরবাজার, সোনারপুর, জগদ্দল, বীজপুর, বারাসাত, মিনাখাঁ। কলকাতার বেহালা, বালিগঞ্জ, দমদম, জোড়াবাগান, তালতলা।

বর্ধমানের কাটোয়া, কালনা, মেমারি, দাঁইহাট, গুসকরা, কালনা। মালদার গাজল, মালদা, জলপাইগুড়ির ধুপগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের রায়গঞ্জ, গঙ্গারামপুর। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, পূর্ব বিষ্ণুপুর। হাওড়ার সাঁকরাইল, পাঁচলা, উত্তর উলুবেরিয়া, হুগলীর গোঘাট, বলাগর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নমঃশূদ্র ছাড়াও রাজবংশী এবং পৌণ্ড্র জাতির মধ্যেও এই সঙ্গবদ্ধতার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই বিষয়টি মাথায় রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনে ওই নির্বাচন ক্ষেত্রের সংখ্যা গরিষ্ঠ জাতির প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করে থাকে।[১০৩] একই রকম ভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নমঃশূদ্র অধ্যুষিত নির্বাচনী এলাকাতে প্রার্থী হিসেবে নমঃশূদ্র প্রার্থীদের মনোনীত করে অথবা নির্বাচনী প্রচারে তাদের স্বার্থ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ১৯৫১ সাল পরবর্তী নির্বাচন গুলিতে সংখ্যা গরিষ্ঠ তপিশিলি তথা নমঃশূদ্র জাতির ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি ক্রমাগত প্রকট হয়ে উঠেছে। বিষয়টিকে নমঃশূদ্র জাতি চেতনার শক্তিকে স্বীকৃতি প্রদানের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা যায়।

বাংলা বিভাজন পরবর্তী কংগ্রেস শাসন আমলে উদ্বাস্তু সমস্যা জর্জরিত জাতিটির মূল অভীষ্ট ছিল অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মত প্রাথমিক বিষয়। এই চাহিদা পূরণের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁরা উদ্বাস্তু রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছিল। এই পর্বের নেতাদের মধ্যে ছিলেন যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল, প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক প্রভৃতি। তাঁদের নেতৃত্বে উদ্বাস্তু তপশিলি তথা নমঃশূদ্র জাতির একটি অংশ কংগ্রেস রাজনীতির শরণাপন্ন হয়। অপর

অংশটি কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী ধারায় যুক্ত হয়ে পড়ে। সংযুক্ত সরকারের কালপর্বে এই রাজনৈতিক ধারার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র তথা তপশিলি জাতি চেতনা নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। মার্কসবাদের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতাদর্শে তপশিলি জাতি হয়ে পড়েছিল, অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বিবেচিত হওয়া সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীর একটি অংশ। এই পদ্ধতিতে জাতি বৈষম্যের বিষয়টিকে উপেক্ষা করে অর্থনীতি ভিত্তিক শ্রেণী বিভাজনের উপর জোর দেওয়া হয়। জাতি চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে এই প্রবণতাটি ছিল নেতিবাচক প্রক্রিয়া।

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শাসন আমলে নমঃশূদ্র নেতৃত্বের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কান্তি বিশ্বাস, অপূর্ব লাল মজুমদার, ডক্টর সুমন্ত হীরা প্রমূখ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কান্তি বিশ্বাস। তিনি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত 'যুব কল্যাণ' ও 'স্বরাষ্ট্র পাসপোর্ট' এবং ১৯৮২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব নির্বাহ করেছিলেন।

২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এই আমলে নমঃশূদ্র নেতৃত্বের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর, মমতা বালা ঠাকুর, ড. উপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, রমেন বিশ্বাস প্রভৃতি। উপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়ে ছিলেন। মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর শরণার্থী, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগে স্বাধীন প্রতিমন্ত্রী এবং ক্ষুদ্র, কুটির শিল্প, এবং বস্ত্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে ছিলেন।

২০১৯ সালে নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এই জটিলতার ফলে উদ্বাস্তু নমঃশূদ্র তথা মতুয়া সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। তাঁদের একটি অংশ তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করে, আরেকটি অংশ বিজেপি দলের পাশে দাঁড়ায়। এই পর্বে নমঃশূদ্র নেতৃত্বের

মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুব্রত ঠাকুর, মনোরঞ্জন ব্যাপারী, কবিয়াল অসীম কুমার সরকার, সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস প্রভৃতি।

ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে সুবিধা প্রদান এবং তার পরিবর্তে ভোট ব্যাংকের সমীকরণ বিষয়টি পারস্পরিক পরিপূরক হয়ে উঠে আসতে দেখা যায়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অন্যান্য তপশিলি জাতির পাশাপাশি নমঃশূদ্র জাতির একটি অংশের মতুয়া আনুগত্য বা সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

এর উদাহরণ হিসেবে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কর্তৃক ওই মন্ত্রী সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠ জাতির সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা বা বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প ঘোষণা করার কৌশল অবলম্বন করা হয়। ২০১১ সালের পর তৃণমূল সরকার মতুয়া ও নমঃশূদ্র ভোটারদের সন্তুষ্টি বিধানে রাজারহাটে হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর রিসার্চ ফাউন্ডেশন, নমঃশূদ্র উন্নয়ন পর্ষদ, হরি চাঁদ -গুরু চাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা হরিচাঁদের জন্মদিনে ছুটি ঘোষণা করার বিষয় উঠে আসে।[১০৪]

অপরদিকে বিজেপি এর তরফ থেকে সুব্রত ঠাকুরকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী করা বা ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে যখন ২৭ মার্চ ২০২১ পশ্চিমবঙ্গে ভোট শুরু। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একই দিনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের পৈতৃক বাড়ি দেখতে যাওয়ার পাশাপাশি, এই একই সফরে মতুয়া ধর্মের আদি কেন্দ্র গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দি ঠাকুরবাড়ি পরিদর্শন করেন, এই সকল ঘটনা রাজনৈতিক ভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।[১০৫]

এর পাশাপাশি ২০২০ সালের ২১ নভেম্বর কলকাতার শিশির মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য আকাদেমির প্রথম সাহিত্য সভা। ২০২১ সালের তেশরা জানুয়ারি বনগাঁর নীলদর্পণ

মঞ্চে অনুষ্ঠিত দলিত সাহিত্য একাডেমীর দ্বিতীয় অধিবেশন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ২০২২ সালের ১৪ই এপ্রিল ড. বি.আর. আম্বেদকরের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতার রবীন্দ্র সদন ও নন্দন প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য উৎসব পালন। এই সকল ঘটনা বাংলার তপশিলি জাতি চেতনার উত্থান এবং রাজনীতির সংমিশ্রণের এক অভূতপূর্ব নিদর্শন।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ:

১. রূপ কুমার বর্মণ: জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক: পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান, (কলকাতা, আলফাবেট বুকস, ২০১৯) পৃ.৩৮।

২. আশিস হীরা (সম্পা): দেশভাগে নিম্নবর্ণ, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২০) পৃ. ৩১।

৩. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: প্রান্তিক মানব, (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৯), পৃ. ১৮।

8. Indian census, 2011।

৫. তদেব।

৬. Rup Kumar Barman: Right-Left-Right: The Scheduled Castes in the Legislative Assembly Elections in West Bengal from 1952 to 2016, The Mirror, Vol-III, Assam, ISSN – 2348-9596, পৃ. ২১।

৭. তদেব।

৮. রূপ কুমার বর্মণ: সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ জাত পাত জাতি রাজনীতি ও তপশিলি সমাজ (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২) পৃ. ৬০।

৯. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

১০. তদেব, পৃ. ২৩।

১১. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

১২. মনশান্ত বিশ্বাস: বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি, (কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৬), পৃ. ২৬২।

১৩. তদেব, পৃ. ২৮৭।

১৪. তদেব, পৃ. ২৮৭।

১৫. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

১৬. The Constitution (Scheduled Caste) Order, 19501. C.O.19।

১৭. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

১৮. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

১৯. Statistical Report on General Election, 1951 to the Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi. পৃ. ২২৩।

২০. তদেব, পৃ. ২৩৪।

২১. মনোশান্ত বিশ্বাস: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।

২২. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

২৩. Statistical Report on General Election, 1957 to the Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi।

২৪. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

২৫. Election Commission of India- State Election, 1962 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India New Delhi।
২৬. তদেব, পৃ.।
২৭. মন শান্ত বিশ্বাস: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১।
২৮. তদেব, পৃ. ২৯৪।
২৯. Election Commission of India- State Election, 1962 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India New Delhi।
৩০. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।
৩১. তদেব, পৃ. ২৮।
৩২. রূপ কুমার বর্মণ: পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব, (বার্তা ২৪, বুধবার, ৩০ মার্চ ২০২২, ১৬ চৈত্র ১৪২৮)।
৩৩. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।
৩৪. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।
৩৫. Statistical Report on General Election, 1969 to the Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi
৩৬. তদেব।
৩৭. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত।
৩৮. জ্যোতি বসু: যতদূর মনে পড়ে, (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০১৫), পৃ. ২৬৬।
৩৯. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।
৪০. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।
৪১. Statistical Report on General Election, 1971 to the Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi
৪২. তদেব।
৪৩. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।
৪৪. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।
৪৫. Statistical Report on General Election, 1972 to the Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi
৪৬. তদেব।
৪৭. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত।
৪৮. Statistical Report on General Election, 1967 to the Fourth Lok Sabha Volume I (National and State Abstracts & Detailed Results) p. 69।
৪৯. তদেব, পৃ. ৬৯।
৫০. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
৫৩. Statistical Report on General Election, 1977 to the Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi, পৃ. ১০১।

৫২. সুমন্ত কুমার হীরা: কান্তি বিশ্বাস এক অতুলনীয় প্রতিভা, (কলকাতা, বইমেলা, ২০২১) পৃ. ১৭।

৫১. Statistical Report on General Election, 1977: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

৫৪. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত।

৫৫. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৫৬. Statistical Report on General Election, 1982 to the Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi. পৃ. ১০০।

৫৭. তদেব, পৃ. ৯৮।

৫৮. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত।

৫৯. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৬০. Statistical Report on General Election, 1987 to the Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi. পৃ. ৯০।

৬১. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত।

৬২. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৬৩. Statistical Report on General Election, 1991 to the Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi. পৃ. ৩২৮।

৬৪. তদেব, পৃ. ৩২৯।

৬৫. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত।

৬৬. Statistical Report on General Election, 1991 to the Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi.

৬৭. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৬৮. Statistical Report on General Election, 1996 to the Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi. পৃ. ৩৩২।

৬৯. তদেব, পৃ. ১১৮।

৭০. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত।

৭১. Statistical Report on General Election, 1996: প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৭২. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৭৩. Statistical Report on General Election, 2001 to the Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi. পৃ. ১১৯।

৭৪. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত।

৭৫. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৭৬. Statistical Report on General Election, 2006 to the Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi পৃ. ৯৯

৭৭. তদেব।

৭৮. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত।

৭৯. উত্তম সরকার: মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের উত্তরসূরী, (উত্তর ২৪ পরগনা, মতুয়া মহাসংঘ পত্রিকা, অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ), পৃ. ৮৯।

৮০. উৎপল বিশ্বাস: পশ্চিমবঙ্গে মতুয়া রাজনীতি, সমকাল, (২৫শে এপ্রিল, ২০২২)

৮১. নিখিল ভারত বাঙালি সমন্বয় সমিতি । Reg No, IV-190200734/ 2020 NiBBSS)।

৮২. নীতিশ বিশ্বাস, জগদীশ হালদার (সম্পা): শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর স্বর্ণ-সংকলন, (কলকাতা, ঐকতান, ২০১৫), পৃ. ৬৭।

৮৩. তদেব, পৃ. ৪৪।

৮৪. Statistical Report on General Election, 2011 to the Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi.

৮৫. তদেব, পৃ. ৩৪৪।

৮৬. তদেব, পৃ. ৩৪৫।

৮৭. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত।

৮৮. Election Commission of India- State Election, 2016 to the Legislative Assembly of West Bengal.

৮৯. তদেব, পৃ. ২৮।

৯০. তদেব, পৃ. ২৯।

৯১. তদেব, পৃ. ৩০।

৯২. তদেব।

৯৩. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত।

৯৪. রূপ কুমার বর্মণ: পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব, (বার্তা ২৪, বুধবার, ৩০ মার্চ, ২০২২, ১৬ চৈত্র ১৪২৮)।

৯৫. Election Commission of India, State Election, 2021 to the legislative assembly of West Bengal।

৯৬. রূপ কুমার বর্মণ: সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ জাত পাত জাতি রাজনীতি ও তপশিলি সমাজ (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২) পৃ.৭৫।

৯৭. Election Commission of India, 2021: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৯৮. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত।

৯৯. Election Commission of India, State Election, 2021: প্রাগুক্ত।

১০০. তদেব।

১০১. রূপ কুমার বর্মণ: প্রাগুক্ত।

১০২. তদেব, পৃ পৃ. ৫৩।

১০৩. তদেব, পৃ. ৭৬।

১০৪. তদেব, পৃ. ৭৩।

১০৫. রূপ কুমার বর্মণ: মহাপুরুষের নির্মাণ, (বার্তা ২৪, সোমবার, ১৬ ই মে, ২০২১)।

চতুর্থ অধ্যায়

উত্তর-পূর্ব ভারতে ভূমিপুত্র ও বহিরাগত দ্বন্দ্বে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা। (১৯৪৭-২০২১)

৪.১ ভূমিকা:

ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশের ২,৬২,২৩০ বর্গ কি.মি. অঞ্চল বিস্তৃত আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচল প্রদেশকে একত্রে সপ্তকন্যা বা Seven Sisters রাজ্য বলা হয়ে থাকে। ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিতে অঞ্চলটি চীনের তিব্বত অঞ্চল, মায়ানমার, নেপাল এবং বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্র দ্বারা পরিমণ্ডিত। আবার বিভিন্ন জাতি, জনজাতি, ভাষা এবং সংস্কৃতির সমাহারে অঞ্চলটি ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের অন্যান্য অংশের থেকে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে পরিচিত।

প্রাচীন কালে থেকে এই অংশের রাজ্য সমূহ ভারতের মূল ভু-খণ্ডের শাসন থেকে মুক্ত ছিল। বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই আর্যাবর্তের সংস্কৃতি বা পরবর্তী মুসলিম সংস্কৃতির থেকে তাঁদের নিজেদেরকে পৃথক রাখতে সহায়ক হয়ে ছিল। এছাড়া বিভিন্ন জনজাতি (Tribes) এবং তাঁদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই সমাজে, বর্ণ বা জাতি-ভেদের ধারনাও ছিল ভারতের অন্য অংশের তুলনায় দুর্বল।[১]

ইউরোপীয় শক্তির অধীনস্থ হওয়ার পর থেকে আসাম, ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য গুলিতে মূল ভূখণ্ডের পাশ্চাত্য আদর্শ সমন্বিত সংস্কৃতির প্রবেশ শুরু হয়ে ছিল। এই সকল সংস্কৃতির মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালি সংস্কৃতি সবথেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করে আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্য দুইটিতে। এই ভাষা সংস্কৃতির প্রভাবই স্বাধীনতা পরবর্তী

ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশের আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যর ইতিহাসে সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে।

আসাম প্রাচীন কালে প্রাকজ্যোতিষপুর (City of Eastern Astrology) নামে পরিচিত ছিল। মহাভারতের বর্ণনায় একে কিরাত ভূমি (Land of Yellow-Skinned People) বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[২] ক্ষেত্রটি ১৮২৪ সালের প্রথম ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধের পর, ১৮২৬ সালে এয়ান্দাবুর সন্ধির (Treaty of Yandabo) মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময় থেকে ভূখণ্ডটি ক্রমশ ইংরেজ সরকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার এবং খনিজ তেল, চা প্রভৃতি কাঁচা মাল বা প্রয়োজনীয় উপাদানের সরবরহকারি ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। অঞ্চলটি দখল করার পর, প্রাথমিকভাবে অংশটিকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি সঙ্গে যুক্ত করা হয়ে ছিল।

ইংরেজ শাসনাধীনে আসার পর প্রশাসনিক সুবিধার্থে পার্শ্ববর্তী বঙ্গ প্রদেশ থেকে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিত বাঙালি কর্মচারীদের আসামের শাসন কার্য পরিচালনার প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করা শুরু হয়। এই সময় থেকে আসামে শিক্ষিত বাঙালি এবং শ্রমিক শ্রেণীর জন্য এক নতুন সুযোগ তৈরি হয়।[৩] এই নীতি অনুসারে ১৮৩৬ সালে আসাম আদালতে বাংলা ভাষা চালু করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে সচল রাখার জন্য এখানকার স্কুল গুলিতে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান করা শুরু হয়ে ছিল।[৪] পরবর্তীকালে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুক্কন, নেথাম ব্রাউন প্রভৃতি ব্যক্তির উদ্যোগে কামরূপ, দরং, নওগাঁ, শিবসাগর, লাখিমপুর প্রভৃতি জেলায় অসমিয়া ভাষায় শিক্ষাদান শুরু হয়ে ছিল।

এছাড়া ১৯৩০ এর দশক থেকে আসামে চা বাগান গড়ে তোলার জন্য ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে কর্মচারী এবং শ্রমিক নিয়ে আসা শুরু হয়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁদের লভ্যাংশ বৃদ্ধি করার জন্য আসামের প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনের পাশাপাশি ব্যপক আকারে চা বাগান তৈরি করা শুরু করে।[৫] তথ্য অনুযায়ী ১৮৭৩ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল

সময় পর্বে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসামে ৩২,৭২,৮০০ জন চা শ্রমিক নিয়ে আসা হয়ে ছিল।[৬] ১৮৭৪ সালে আসামের সঙ্গে সিলেট অঞ্চলটিকে যুক্ত করে চিফ কমিশনের প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর পর থেকে ইংরেজ সরকারের বিভিন্ন নীতির প্রভাবে ব্রহ্মপুত্রের চর অঞ্চল গুলিতে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু এবং মুসলিম বাঙালি কৃষকদের আগমন শুরু হয়। এই হিন্দু কৃষকদের একটি অংশ ছিল নমঃশূদ্র জাতির মানুষ।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় বেঙ্গল প্রদেশের পূর্ব অংশটিকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়ে ছিল। ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রোধ করা হলে, পুনরায় বাংলার পূর্ব অংশটিকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে বঙ্গ প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। কিন্তু এর পর আর বাঙালি কৃষকদের আগমন থেমে থাকেনি। ১৯২১ সালের মধ্যে দেখা যায় আসামে বাঙালির সংখ্যা পূর্বের থেকে কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বাঙালি জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিল পূর্ব বঙ্গীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। এর ফলস্বরূপ আসাম এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে ছিল।

স্বাধীনতার পরেও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে এই জনপ্রবাহ অব্যাহত ছিল। এই অভিবাসনের ধারা অব্যাহত থাকলেও সময়ের সঙ্গে তার প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে থাকে। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে দীর্ঘকাল ধরে পূর্ব পাকিস্থানের রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার কারণে বাঙালি অভিবাসন অব্যাহত ছিল। একদিকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে আসামে আগত বাঙ্গালী কৃষকের মধ্যে অধিকাংশ ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের আগমনের ধারা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫০ সাল পরবর্তী পূর্ব বঙ্গীয় হিন্দু শরণার্থীদের মধ্যে একটি বড় অংশ ছিল কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত নমঃশূদ্র জাতির মানুষ।

১৯৭১ পরবর্তী সময়ের নাবগঠিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য হিন্দুর পাশাপাশি মুসলিম বাঙালি অনুপ্রবেশও বৃদ্ধি পেয়ে ছিল। আশ্রয় হিসেবে তাঁরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গছাড়াও আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মনিপুর, মিজোরাম প্রভৃতি উত্তর পূর্ব সীমান্তের ভারতীয় রাজ্যগুলিকে বেছে নিয়েছিলেন। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে ১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান এবং ১৯৭১ পরবর্তী বাংলাদেশে হিন্দু তথা নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত কমতে থাকে। এই সকল পরিস্থিতি আসামের ভাষা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

সরণি: ৪.১. ১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বের পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্থান থেকে আসাম ও ত্রিপুরায় আসা উদ্বাস্তুদের পরিসংখ্যান

রাজ্য	রিলিফ ক্যাম্প	মোট পরিবার	উদ্বাস্তু সংখ্যা
আসাম	৩০	২৮,৭৫০	১,২০,৭৫০
ত্রিপুরা	২১	৯৩০	৩,৯১৮

সুত্র: Estimates Committee (1964-65), Ministry of Rehabilitation, New Delhi, 1965.

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে আসামের ভাষা সংস্কৃতিগত এবং নৃতত্ত্বগত সাংস্কৃতিক (Ethno Cultural) জনবিন্যাসের পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা যেতে থাকে। এর পাশাপাশি এই ভাষা-সংস্কৃতিগত সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংগঠন এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সম্পাদ্য কার্যাবলী (Agenda) গড়ে উঠতে শুরু করে ছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে আসামের বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপর বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হতে থাকে। এখানে বাংলা ভাষী জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নমঃশূদ্র জাতির প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি উঠে আসে।

অপরদিকে ত্রিপুরার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সময় রাজ্যের সীমানা পরিবর্তিত হলেও রাজ্যটি প্রাচীনকাল থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে স্থানীয় রাজতন্ত্রের অধীনে ছিল। উপনিবেশিক শক্তির আগমনের পর, ১৮০৯ সালে রাজ্যটি ব্রিটিশ করদ রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৪৭ এর স্বাধীনতার সময় রাজ্যটি ভারতের সঙ্গে যোগদান করে। ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারি প্রদেশটি ভারতের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায়।

১৮৭২ সাল থেকে ত্রিপুরার আদমশুমারি শুরু হয়। এই তথ্য অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী ৯০.০৪ শতাংশ মানুষ ছিলেন জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত।[৭] ত্রিপুরার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সময়ের প্রবাহে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে বাঙালি জনগোষ্ঠী ছিল অন্যতম। স্বাধীনতার আগে থেকেই ত্রিপুরায় বাঙালি আগমন শুরু হয়ে ছিল। ১৯৪৭ এর দেশ ভাগের কারণে এই প্রবাহ কয়েক গুন বৃদ্ধি পেয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর সাম্প্রদায়িক নির্যাতন এবং দাঙ্গা ছিল এর অন্যতম কারণ। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের থেকে ত্রিপুরায় অভিবাসিত বাঙালি জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ ছিল নমঃশূদ্র জাতির মানুষ।

এইভাবে ১৯৫১ সালের আদমশুমারির পরিসংখ্যানে দেখা যায়, যে ত্রিপুরায় আদি নিবাসীদের তুলনায় বহিরাগত বাঙালির সংখ্যা বেশি।[৮] পরবর্তী সময়ে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়, ত্রিপুরা আদিবাসীদের সংখ্যা ৩১.৭৮ শতাংশ অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের আদি বাসভূমিতে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। বহিরাগত বাঙালি হয়ে উঠেছে সংখ্যাগুরু।

বাংলা বিভাজন (১৯৪৭) পরবর্তী নমঃশূদ্র জাতির বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে উঠে এসেছে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী আসামের মোট জনসংখ্যা ৩,১২,০৫,৫৭৬ জন।[৯] এর

মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যা ৬১.৪৭ শতাংশ এবং মুসলিম জনসংখ্যা ৩৪.২২ শতাংশ এছাড়া বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, শিখ প্রভৃতি ধর্মের মানুষ বাস করেন। এদের মধ্যে ৪৮.৩৮ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা অসমিয়া এবং ২৮.৯২ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। এই বাংলাভাষী হিন্দু সম্প্রদায়ের তপশিলি জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে ৬,৩১,৫৪২ জন নমঃশূদ্র জাতির অন্তর্গত।[১০] অনেক ক্ষেত্রে এই সকল জনগোষ্ঠীর মানুষ মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি অসমিয়া ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এসকল বিষয় সত্ত্বেও আসামে সংঘটিত ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলন এক জটিল সামাজিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে।

অপরদিকে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যা ৩৬,৭৩,৯১৭ জন। তার মধ্যে হিন্দু ৮৩.৪০ শতাংশ, মুসলিম ৮.৬০ শতাংশ এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষ বসবাস করেন। এর মধ্যে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা ৬৫.৭৩ শতাংশ। তপশিলি উপজাতি মানুষের সংখ্যা ৩১.৭৮ শতাংশ, তপশিলি জাতির মানুষ ১৭.৮৩ শতাংশ। ত্রিপুরা ২,১৫,২৬৭ জন নমঃশূদ্র জাতির মানুষের আবাস ভূমি।[১১] এই জনগোষ্ঠীটি এ রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলি জাতি। ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম রাজ্যে বাঙালি ভাষা সংস্কৃতির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠলেও ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এই আন্দোলন অনেকটাই দুর্বল। এছাড়া মনিপুর (৩,৭৪৭), মেঘালয় (৩,৩৭৬) মিজোরাম (১৩৬) প্রভৃতি রাজ্যেও নমঃশূদ্র জাতির বসতি পরিলক্ষিত হয়।[১২]এই পরিপেক্ষিতে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাক্রমে আসাম এবং ত্রিপুরায় ভাষা-সংস্কৃতি দ্বন্দ্বে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অংশহিসেবে নমঃশূদ্র জাতির পরিচিতি অন্বেষণ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ঔপনিবেশিক নীতির কারণে আসামে এবং ত্রিপুরায় যে, সংস্কৃতিগত সংমিশ্রণের সূত্রপাত হয়ে ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বে এই বিষয়টি এক অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং

জাতিগত-সাংস্কৃতিক (Ethno-Cultural) জটিলতার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। এই পরিস্থিতির ফলস্বরূপ একদিকে যেমন ত্রিপুরায় ভাষা-সাংস্কৃতিক জনবিন্যাসের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। অপরদিকে আসামে এই ভাষা সাংস্কৃতিক সঙ্কট এক গণবিক্ষোভের উত্থান ঘটিয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী আসাম এবং বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) এর সীমান্ত নির্ধারণ, বাঙালি অভিবাসন এবং বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীর জনবিন্যাসগত ব্যাপক পরিবর্তনের বিষয় সমূহ, এই অঞ্চলের এক অমীমাংসিত সমস্যা হিসেবে উঠে এসেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী আসাম, ত্রিপুরা, মনিপুর, মেঘালয় প্রভৃতি পূর্ব ভারতের রাজ্যের ভাষা-সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে নমঃশূদ্র জাতি কীভাবে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে ভাষা সংস্কৃতিগত এই বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

এছাড়া এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া ক্ষোভ এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক প্রভাবের ফলশ্রুতিতে পূর্ব ভারতের আলফার মতো বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিত উঠে আসতে দেখা যায়।[১৩] স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্র ও রাজ্য কর্তৃক এই ভাষা সংস্কৃতিগত ক্ষোভকে প্রশমনের প্রয়াস দেখা গেছে। আবার এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে রাজনীতি কেন্দ্রিক উপপাদ্য (Agenda) উদ্ভব হতেও দেখা গেছে। এই আবহে নমঃশূদ্র জাতি চেতনার বিষয়টি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাঁদের নিজেদের পরিচিতি সংরক্ষণের প্রচেষ্ঠায় আন্দোলন সংগঠিত করেছে। অপরদিকে বহিরাগত উপাধি দিয়ে নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য বাঙালি জনগোষ্ঠীর পরিচিতি ধ্বংস করার প্রয়াসে অগ্রসর হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ন্যায় বিচারের নিরিখে একই রাষ্ট্রের সীমানার ভেতর ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির এই দ্বন্দ্ব উঠে আসে। আলোচ্য অধ্যায়ে এক দিকে জাতীয়তাবাদ

অপরদিকে খিলিঞ্জিয়া[১৪] (Indigenous People) এবং বহিরাগত দ্বন্দ্বে, আঞ্চলিকতাবাদের মত পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে এই আলোচনা অগ্রসর হয়েছে।

৪.২ উত্তর-পূর্ব ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের প্রেক্ষাপটে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা

ভারতীয় ভুখণ্ডের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারি নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস আলোচনায় আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পশ্চিমবঙ্গের পর সর্বাধিক নমঃশূদ্র অধ্যুষিত রাজ্য হিসেবে আসাম উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যে তপশিলি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই জাতিটি দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যা গরিষ্ঠতার স্থান দখল করে আছে। অপরদিকে ত্রিপুরা রাজ্যের তপশিলিদের মধ্যে নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সংখ্যা সর্বাধিক।[১৫]

আসাম এবং ত্রিপুরা এই দুইটি রাজ্যের বসবাসকারী নমঃশূদ্র জাতির সামাজিক অবস্থানগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এক দিকে আসামের ‘বাঙাল খেদা’ আন্দোলন থেকে বহিরাগত পরিচিতি আরোপের আবহে, তাঁরা হয়ে উঠেছে বাঙালি সমাজের অংশ। অপরদিকে ত্রিপুরায় সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঙালি সংস্কৃতিতে তাঁরা হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি। এর কারণ অনুসন্ধান করার প্রয়োজনে ক্ষেত্রে দুইটির ভূ-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুধাবন করা প্রয়োজন। আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়টিকে আসাম এবং ত্রিপুরা এই দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

৪.২.২ আসাম রাজ্যে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ব্রহ্মপুত্র বিধৌত আসাম রাজ্যটি ২৪^{0}৫'-২৮^{0}০' উত্তর অক্ষরেখা ও ৮৯^{0}৪২'-৯৬^{0}০' পূর্ব দ্রাঘিমা মধ্যবর্তী ৭৮৪৩৮ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত। আসাম মূলত চারটি ভিন্ন প্রকৃতির ভৌগোলিক ভূমিরূপের সমন্বয়। ১. পার্বত্য

জেলা, যেখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনজাতির মানুষের বাস। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের কোনো লিখিত ভাষা ছিল না। ২. ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পাঁচটি পাশাপাশি জেলা। এই অঞ্চলটিই মূল আসাম হিসেবে পরিচিত। ৩. ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গোয়ালপাড়া যেখানে বাঙালি এবং অসমিয়া সংস্কৃতি সমানুপাত দেখা যায়। ৪ সুরমা উপত্যকায় বাংলাভাষী করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও কাছার।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী আসামের জনসংখ্যা ১,৩২,৫৭,২৭২ জন। এর মধ্যে ৬.৯ শতাংশ তপশিলি জাতি ও ১২.৪৫ শতাংশ তপশিলি উপজাতির মানুষ।[১৬] অর্থাৎ তপশিলি জনগোষ্ঠীর তুলনায় তপশিলি জনজাতির গুরুত্ব সমধিক। তাঁদের এই ভাষা-সাংস্কৃতি রক্ষার তাগিদ পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অপরদিকে নমঃশূদ্র (৬,৩১,৫৪২ জন) জনগোষ্ঠী আসামের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলি জাতি, যা মোট তপশিলি জনসংখ্যার ৩০.৪ শতাংশ। নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীকে আসামের সকল অংশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করতে দেখা গেলেও বরাক ও সুরমা উপত্যকার করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও কাছার এই তিনটি জেলায় তাঁদের সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অবস্থিত নিম্ন, উত্তর ও মধ্য আসামের কামরূপ, বরপেটা, নলবাড়ি, দারং, উদালগুরি, শোণিতপুর, ধুবরি, গোয়ালপাড়া, গোয়াহাটি, উপর অসমের শিবসাগর, উত্তর লাখিমপুরের জেলাগুলিতে এই মানুষজনের বসতি দেখা যায়।

বরাক ও তাঁর শাখানদী পার্শ্ববর্তী পললভূমি, নওগাঁ জেলায় কোঙ নদী উপত্যকা, ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর দিকে অবস্থিত বরপেটা জেলা, নলবারী জেলার রঙিয়া, নাগরীজুলি, বাকসার বিষ্ণুপুর, কামরূপ জেলার ছয়গাঁও, পানিখাইতি, চামরিয়া সাঁতরা, মালিবাড়ী, নাগাবেরা, বোক্, পলাশবাড়ী, দরং জেলা, উদালগুরি জেলার কালায় গাঁও, শোনিতপুর জেলার ঢেকীয়াজুলি, তেজপুর, লাখিমপুর জেলার উত্তর লাখিম পুর, ধুবরি জেলা, চিরাং

জেলার বিজনি, বঙ্গাইগাও জেলার অভায়াপুরি, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার মানকাচর, তিনসুকিয়া জেলার তিনসুকিয়া ও মাঘেরিটা মহকুমা প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে নমঃশূদ্র বসতি দেখা যায়।

২০১১ আদমশুমারি প্রতিবেদন অনুযায়ী আসামে বসবাস কারি নমঃশূদ্রদের ৮৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন।[১৭] এই অঞ্চলগুলির ভূমিরূপ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, বরাক-সুরমা নদীর উপত্যকা এবং ব্রহ্মপুত্র ও তার শাখা নদী পার্শ্ববর্তী প্লাবন ভুমি গুলিতে এই জনগোষ্ঠীর বসবাসের প্রবণতা বেশি। যা থেকে এদের জীবিকা সংস্কৃতির আভাস পাওয়া যায়। আসামের ব্রহ্মপুত্র ও তার শাখা নদী পার্শ্ববর্তী বসবাসকারী অধিকাংশ নমঃশূদ্র জাতির মানুষ মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।[১৮] অপরদিকে বরাক-সুরমা নদীর উপত্যকার নমঃশূদ্রদের অধিকাংশ মানুষ কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত।[১৯] এখানকার মোট নমঃশূদ্র মানুষজনের মধ্যে ৪১ শতাংশ কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত। এই সকল নমঃশূদ্র জাতির মানুষ বিভিন্ন সময়ে অবিভক্ত এবং বিভাজিত বঙ্গ থেকে এসে আসামের বসবাস শুরু করে ছিলেন।

ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যকায় বসবাসকারী এবং বরাক-সুরমা উপত্যকায় বসবাসকারী নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তর সাংস্কৃতিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী অসমিয়া ভাষা এবং সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে তাঁরা অসমিয়া ভাষার ব্যবহার করেন যদিও নিজেদের বার্তালাপের মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা বলেন। জীবিকা হিসেবে তাদের অধিকাংশ মানুষ মৎস্য শিকারকে বেছে নিয়েছেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁরা অসমীয় বৈষ্ণব সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক।[২০]

অপরদিকে বরাক-সুরমা উপত্যকায় বসবাসকারী নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব বেশি দেখা যায়। ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে বেশি গুরুত্ব দেন। জীবিকার

ক্ষেত্রে কৃষি কার্যকে অগ্রাধিকার দান করেন, মৎস্য শিকার তাদের কাছে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁরা কালী, দুর্গা প্রভৃতি শাক্ত সাংস্কৃতিক রীতিনীতি অনুসরণ করেন।[২১] এছাড়া বিবাহ রীতি এবং শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।[২২] একদিকে বৈষ্ণব সংস্কৃতি অনুসরণকারী নমঃশূদ্ররা নিজেদেরকে উচ্চবর্ণের সমকক্ষ মনে করেন। অপরদিকে বরাক-সুরমা উপত্যকায় তাঁরা নিম্ন বর্ণের সামাজিক অবস্থান বহন করেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক-সুরমা উপত্যকায় বসবাসকারী নমঃশূদ্রদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাবে একটি দূরত্ব অনুধাবন করা যায়।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রেক্ষাপটে আসামের 'বাঙাল খেদা' আন্দোলনে আগ্রাসনের শিকার বাঙালি হিন্দু তথা নমঃশূদ্র জাতির কথা উঠে আসতে দেখা যায়। ৩০শে জুন ২০১৮ আসামে জাতীয় নাগারিকপঞ্জী প্রকাশিত হওয়ার পর, এই মাসের ১লা নভেম্বর আসামের তিনসুকিয়া জেলার বিসনিমুখ গ্রামে পাঁচজন বাংলাভাষী মানুষকে গ্রাম থেকে উঠিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী এদের নাম শ্যামল বিশ্বাস(৬০), অনন্ত বিশ্বাস (১৮), অবিনাশ বিশ্বাস, সুবল দাস (৬০) এবং ধনঞ্জয় নমঃশূদ্র (২৩)। এদের মধ্যে চারজন নমঃশূদ্র জাতির এবং একজন জালিয়া কৈবর্ত জাতির মানুষ।[২৩] এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে আলফা স্বতন্ত্র শাখা [ULFA(I)] এর দিকে সন্দেহের তীর থাকলেও, ২রা নভেম্বর আলফার জনসংযোগ শাখার একটি বয়ানে, এই ঘটনার দায় নিতে অস্বীকার করা হয়।

এইরকম বিভিন্ন ঘটনা ক্রমের মধ্যে দিয়ে আসামে বিচ্ছিন্নতাবাদি বা উগ্র নাশকতাবাদী গোষ্ঠীর উত্থানকে কেন্দ্র করে পৃথক বা স্বতন্ত্র অঞ্চল (Autonomous Territory) গঠনের দাবী। অপরদিকে বহিরাগত থেকে বিদেশি বা অনুপ্রবেশকারী প্রতিরোধে গণআন্দোলন বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নিবন্ধীকরণ প্রভৃতি বহু চর্চিত বিষয় উঠে আসে। এই সকল কারণ

অনুসন্ধানে আসামে নমঃশূদ্র ছাড়াও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসতি গড়ে ওঠার ইতিহাস এবং তাঁদের ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার উদ্বেগ অনুধাবন করার পাশাপাশি আর্থসামাজিক দিক এবং বৈদেশিক ইন্ধনের বিষয়টিকে নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন।

৪.২.২.২ আসাম অভিবাসন, ভাষা সংস্কৃতি ও স্বশাসিত অঞ্চল (Autonomous Territory) গঠনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আসামের প্রেক্ষাপটে অভিবাসনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, অভিবাসন আসামের ইতিহাসের অন্যাতম প্রাচীন বৈশিষ্ট। সময়ের প্রবাহে বিভিন্ন জাতি ও জনজাতি আসামের সংস্কৃতিতে অঙ্গীভূত হয়েছে। তাঁদের সন্মিলিত জীবনচর্চা, রীতি নীতি আসামের বর্তমান সংস্কৃতির নির্মাণে সহায়ক হয়ে উঠেছে।

এই সকল জনগোষ্ঠীর মধ্য অসমের পূর্ব অংশে বসবাসকারী অস্ট্রিক-ভাষী মাতৃতান্ত্রিক খাসি জনগোষ্ঠী আনুমানিক ১০০০ থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চীনের পশ্চিম প্রদেশ থেকে আসামের এই অঞ্চলে এবং মেঘালয়ের খাসি জয়ন্তিয়া পাহাড়ে অভিবাসিত হন। এই সকল অঞ্চল গুলি ছাড়াও ভারতের, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ এবং জম্মু-কাশ্মীরে এবং বাংলাদেশে এই জনগোষ্ঠীকে বসবাস করতে দেখা যায়।

আসামের বোরো উপজাতি অধ্যুষিত চারটি জেলা কোকরাঝার, চিরাং, বাকসা এবং উদালগুরি নিয়ে ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে Bodoland Territorial Area Districts (BTAD) গঠিত হয়।[২৪] গেরিয়েরসন তাঁর লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এর প্রতিবেদনে দেখিয়েছেন যে, বোরো উপজাতি হল চীন-তিব্বতি ভাষার শাখা তিব্বতি-বার্মিজ ভাষাগোষ্ঠীর উপশাখা অসমিয়া-বার্মিজ ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত মানুষ। সুনিতি কুমার চট্টোপাধ্যায় দেখান

যে, বোরো উপজাতির জনগোষ্ঠী ২০০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী সময় উত্তর-পূর্ব ভারতে অভিবাসিত হয়ে আসে।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাসকারী তিব্বতি-বার্মিজ ভাষী অহম বা তাই-আহম আসামের অন্যতম প্রভাবশালী জনগোষ্ঠী। ১২২৮ সালে চাওলুং সিউ-কা-ফ নামে নেতা, তাঁর ৯,০০০ অনুগামী নিয়ে বার্মা-চীন সীমান্তের মং মাও অঞ্চল (বর্তমান গনপ্রজাতন্ত্রী চীনের ইয়ুনান প্রদেশ) থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অভিবাসিত হয়ে হয়ে এসে বুড়িডিং নদী ও ডিখান নদীর মধ্যবর্তী জনহীন অংশে বসবাস শুরু করেন। জলা জমিতে ধান চাষের প্রযুক্তি জানা থাকায়, তাঁরা স্থানীয় বরাহি, মোরান ও অন্যান্য জাতিদের উপর সহজে প্রভাব বিস্তার করে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে শংকরদেবের উত্তরসূরী অনিরুদ্ধ দেবের প্রভাবে তাঁরা বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অসমিয়া ভাষা গ্রহণ করেন। তখন থেকে বোরো জাতি আসামের হিন্দুদের একটি স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে উঠে আসে।

আসামের বাঙালি অভিবাসন ছিল এই সকল অভিবাসনের থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। বিভিন্ন সময় আসামে কিছু বাঙালি অভিবাসন দেখা গেলেও মূলত ব্রিটিশ ঔপনিবেশ কালীন সময় থেকে তা আলাদা মাত্রা যোগ করে ছিল। ১৮২৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং বর্মার রাজার মধ্যে ইয়ান্দাবুর চুক্তির মধ্য দিয়ে মনিপুর ও আরাকান সহ ব্রিটিশদের ঔপনিবেশে পরিণত হয়। ১৮৩৯ সালে আসাম সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হওয়ার পর, আসামকে বঙ্গ প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করলে, সেখানে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে।

প্রাক ঔপনিবেশিক পর্বে আসামের অর্থনীতির প্রকৃতি ছিল, আধা জনজাতি বা 'Semi Tribal' ও আধা সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের। এরকম পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক পরিবেশের উপরে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক কাঠামোর তৈরির কাজ শুরু হয়। এর জন্য প্রয়োজনীয়

বিভিন্ন আধিকারিক এবং কর্মচারী তৎকালীন আসামে অপ্রতুল ছিল। এই কারণে প্রভূত পরিমাণ প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয়, এবং সুরক্ষা বিভাগীও আধিকারিক ও কর্মচারী তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অংশ থেকে ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনুগামী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালিদেরকে নিয়ে আসা হয় আসামে। ঔপনিবেশিক কাঠামো চালু হলে, আসামের কৃষি দ্রব্যের বাণিজ্যিকরণ শুরু হয়।

১৮৩৭ সালে ব্রিটিশরা আসামে চা শিল্প প্রতিষ্ঠা করে। প্রথমদিকে এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনে শ্রমিকদের চীন দেশ থেকে নিয়ে আসা হতো। ১৮৪৩ সালের আফিম যুদ্ধের কারণে তাঁরা দেশে ফিরে গেলে, স্থানীয় মূলত বোরো ও কাছারি জনজাতির উপর নির্ভর করতে হয়। ১৮৫৯ সালে স্থানীয় শ্রমিকের পরিবর্তে ছোটনাগপুর, বিহার উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের আদিবাসীদের বিপুল পরিমাণ নিয়ে আসতে শুরু করা হয়। এই দুই ধরনের অভিবাসনের ফলে আসামের জনবিন্যাস বদলে যেতে শুরু করে। ১৮৭৪ সালে ইংরেজ ঔপনিবেশিক রাজস্ব আদায় ও অন্যান্য প্রশাসনিক সুবিধার্থে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে বার করে আসামকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করে।

অপরদিকে ব্রিটিশদের রাজস্ব আদায়ের তাগিদে এবং বাণিজ্যিক কাঁচামালের চাহিদা পূরণ করার জন্য আসামের অনাবাদী জমি গুলিতে পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল থেকে চাষীদের নিয়ে এসে উৎপাদন শুরু করা হয়। যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুসলমান এবং নমঃশূদ্র জাতির মানুষ। পূর্ববঙ্গ থেকে কাঁচা পাট রপ্তানি হত, ব্রিটেনের চটকলের জন্য। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন নিচু অঞ্চল গুলোতে প্রচুর পরিমাণে পাট চাষের প্রচলন ছিল। মুসলিম এবং নমঃশূদ্র জাতির মানুষ পাট চাষে ছিল সিদ্ধহস্ত। এ কারণে স্থানীয় সময়ের উপর নির্ভর না করে, সরাসরি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল থেকে তাদেরকে আসামে নিয়ে আসা হয়, পাট চাষ বৃদ্ধি করার জন্য।

এছাড়াও চা শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনে যে শ্রমিক এবং জন জাতিদের নিয়ে আসা হয়। তাঁরা স্থানীয়দের ভূমি থেকে উৎখাত না করে শিল্প কেন্দ্রিক অঞ্চলগুলোতে কাজ করতে সক্ষম হলেও পূর্ববঙ্গ থেকে চাষিদের অভিবাসনের ফলে স্থানীয়দের সঙ্গে জমির দখল নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

ইংরেজ আমলে গোয়ালপাড়ার জমিদারের হাত ধরে অসমের বাইরে থেকে কৃষকদের আনা শুরু হয়। যাতে করে জমি খাতে রাজস্ব বৃদ্ধি করার সম্ভব হয়। এইভাবে রাজস্ব ঘাটতি মেটানোর জন্য ১৯৩৮ সালে মুহাম্মদ শাদুল্লাহ সংরক্ষিত চারণ ভুমিকে অসংরক্ষিত করে অভিবাসীদের চাষ ও বসবাসের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ফলস্বরূপ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কিছু দিনের মধ্যে বাঙালি মুসলিম এবং মূলত নিম্নবর্ণের বাঙালি হিন্দুদের জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে। বরাক এবং সুরমা উপত্যকা হল, বঙ্গভূমির সম্প্রসারিত উপরের অংশ। এই অংশটি অচিরেই বাঙালি অধ্যুষিত হয়ে ওঠে। ১৮৯১ সালের জনগণনাতে দেখা যায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রতি চারজনের মধ্যে একজন বহিরাগত।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে আসামকে পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি ওঠে। ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান অনুসারে আসামকে বাংলার সঙ্গে ভাগ বিভাগ ‘সি’ তে রাখা হয়ে ছিল। এই অঞ্চলটিকে নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের রাজনৈতিক মত বিরোধের কারণে দেশ ভাগের সময় পূর্ব বাংলা এবং আসাম বিভাজনের পর্বে সিলেট অঞ্চলে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।

বাঙালিদের মধ্যে অধিকাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পক্ষ গ্রহণ করে ছিল। এই গণ ভোটে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের পক্ষে যোগদান করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত

সিলেটের একটি অংশ ভারতের আসামের সঙ্গে যুক্ত হয়। অপর অংশটি পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়ে ছিল। এই গণভোটে অসমিয়া এবং বাঙালি সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব সর্বসমক্ষে উঠে আসে।

এই সময় থেকে অসমিয়া ভাষী জনগণ হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালি অভিবাসীদের আসাম থেকে বাইরে বের করে দিতে উদ্যোগী হয়। বিশেষত সিলেট বা শ্রীহট্ট অঞ্চল নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। এই ঘটনা একটি সুদুর প্রসারী বাঙালি অসমিয়া দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটায়। মুসলিম সম্প্রদায় ও বাংলা ভাষী হিন্দুদের কারণে আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ হারিয়ে যাওয়ার ভয় থেকে একদিকে অসমের 'বাঙাল খেদা আন্দোলন' অপরদিকে স্বশাসিত অঞ্চল গঠনের মধ্যে দিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক এলাকা রক্ষার প্রবনতা উঠে আসে।

৪.২.২.৩ স্বাধীনতা পরবর্তী আসামে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নমঃশূদ্র জাতি চেতনার বিবর্তন

স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আসামের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। ১৯৪৭ পরবর্তী সময় আসামের ভাষা এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা প্রকৃতি পরিবর্তন পরিলক্ষিত করা যাচ্ছিল। এই সময় থেকে আসামের একটি অংশের মানুষের মনে বাঙালি মুসলিম তথা উদ্বাস্তু বাঙালি বিরোধী ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা যেতে থাকে। এই রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাংলাভাষী উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি নমঃশূদ্র জাতি পরিচিতি এবং সামাজিক অবস্থানের বিবর্তন আবর্তিত হয়ে চলেছে।

আসামের ভাষা এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা বিষয়টি সূচনা হয়ে ছিল বেশ কয়েকটি কারণের সমাহারে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের কিছু ঘটনার মাধ্য দিয়ে এই বিষয়টির বহিঃপ্রকাশ হতে দেখা যায়। যেমন ১৯৪৭ সালের ২৪শে আগস্ট গৌহাটি শহরের এরকম একটি জন সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। এই জন সমাবেশে আসাম শুধুমাত্র অসমিয়াদের জন্য, এই

দাবি উঠতে থাকে।[২৫] ১৯৪৭ এর ২৫শে সেপ্টেম্বর কামরূপের ডেপুটি কমিশনার একটি সার্কুলার জারি করে আসাম থেকে বাঙালিদের বেরকরে দেওয়ার নির্দেশ দেন। অর্থাৎ বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালি বিরোধী ক্ষোভের উত্থান হতে দেখাযায়। এরকম বিভিন্ন ক্ষোভের রাজনীতিকরণ (Politicize) এর মধ্য দিয়ে বিষয়টি উত্তরোত্তর জটিলতর রূপ ধারণ করতে থাকে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত আসাম রাজ্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা দ্বারা পরিচালিত হয়। গপিনাথ বরদলৈ (১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬-৬ই আগস্ট, ১৯৫০) ছিলেন আসামের প্রথম প্রধান মন্ত্রী (তখন রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রীকে প্রধান মন্ত্রী বলা হোত)। ১৯৪৭ সালের ৩রা অক্টোবর তিনি ঘোষণা করেন, আসামের সরকারী ভাষা ও রাজ্যের ভাষা হিসেবে আসমিয়া ভাষাকে ব্যবহার করতে হবে।[২৬] আসামে বিভিন্ন ভাষা এবং সংস্কৃতির সমাহার থাকলেও, ব্রিটিশ নীতির কারণে ১৮৩৬ সাল থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩৭ বছর অসমিয়া ভাষা তথা সংস্কৃতির উপর বাংলা ভাষা তথা বাংলা সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার কারণে যে ক্ষোভ তৈরি হয়ে ছিল, এই ঘটনাগুলো ছিল তাঁরই বহিঃপ্রকাশ। তাঁদের একটি অংশ বাঙালা ভাষা সংস্কৃতি বিস্তারের বিরোধিতা করতে শুরু করে ছিল।

অপরদিকে দেশ ভাগ জনিত পরিস্থিতিতে কেন্দ্র সরকারের উদ্বাস্তু নীতির ক্ষেত্রে আসাম বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়ে ছিল। এরকম একটি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়, যখন ১৯৪৯ সালের মে মাসের ১৮ তারিখের একটা চিঠির মাধ্যমে জহরলাল নেহেরু বরদলৈকে সীমান্তবর্তী পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হিন্দু শরণার্থীদের আসামে পুনর্বাসন এবং সরকারের সুযোগ সুবিধা দিতে বাধ্য করেছিলেন।[২৭] হিন্দু শরণার্থীদের পাশাপাশি বাঙালি মুসলিম জনসংখ্যার আগ্রাসন, আসামের ভাষা সাংস্কৃতিক সমস্যাকে সংঘাতের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ব্রিটিশ নীতি এবং স্বাধীনতা পরবর্তী কেন্দ্র সরকারের হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালি অভিবাসন নীতি, খিলাঞ্জিয়া বা আসামের স্থানীয় জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। অসমিয়া সংস্কৃতিতে বাঙালি সংস্কৃতির প্রবেশ তাদের অর্থনীতি, ভাষা প্রভৃতিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করছিল। এর বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া ক্ষোভ অচিরেই জঙ্গি (Violence) রূপ ধারন করতে থাকে।

দেশ বিভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু আগমন এবং সাম্প্রদায়িক পরিমণ্ডলে তৈরি হওয়া উত্তেজনা প্রসূত বিভিন্ন সংঘাত সংগঠিত হতে দেখা যায়। এরকম একটি ঘটনা ছিল ১৯৫০ সালে করিমগঞ্জ, গোয়ালপাড়া, বরপেটা প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলিম বাঙালিদের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া দাঙ্গা। এই দাঙ্গার কারণে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ ও কোচবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে।[২৩] পরবর্তীতে ১৯৫০ সালের নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির পর এই সকল বাস্তুচ্যুত মানুষদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়ে ছিল। এই বিষয়গুলি আসামের খিলাঞ্জিয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলিম তথা বহিরাগত বাঙালি এবং কেন্দ্র সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভের সঞ্চার করে ছিল। পরবর্তী সময়ে এই ক্ষোভ হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল হয়ে ছিল। এই বাঙালি উদ্বাস্তুদের একটি অংশ হিসেবে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী আসামের ভাষা সাংস্কৃতিক বিদ্বেষ প্রসূত আগ্রাসন কবলিত হয়ে পড়ে।

১৯৫১ সালের নির্বাচনে আসামের ৯১টি আসনের মধ্যে ৭৫ আসনে জয় লাভ করে জাতীয় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।[২৮] আসামের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিষ্ণুরাম মেধি (৯ই আগস্ট, ১৯৫০-২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৭)। এই সময় পর্বে ১৯৫৩ সালে কেন্দ্র সরকারের নির্দেশে রাজ্য পুনর্গঠন কমিটি তৈরি করা হয়। এই কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে ১৯৫৬ সালে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যের সীমানা পুনর্গঠন আইন (The Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956) পাশ হয়।[২৯]

একদিকে ভাষার ভিত্তিতে ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া এবং অপরদিকে উদ্বাস্তু শরণার্থীদের থেকে আসামের খিলাঞ্জিয়া সংস্কৃতিকে রক্ষা করার তাগিদে গড়ে ওঠা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্য পুনর্গঠন আইনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের থেকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনে বলা হয়ে ছিল যে, আসামে পাঁচ লাখের বেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ঢুকে পড়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে অসমে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি নিবন্ধীকৃত করার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।

সরণি: ৪.২.২.৩. ১৯৫১ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত আসাম বিধান সভায় তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব

সাল	মোট আসন	তপশিলি আসন	ভোটার সংখ্যা	ভোট শতাংশ
১৯৫১	৯১	০	৪৯,৫৫,৩৯০	৪৯.৪২
১৯৫৭	৯৪	৫	৫৫,৫৩,৯২৬	৪৫.৪৪
১৯৬২	১০৫	৫	৪৯,৪২,৮১৬	৫১.০৫
১৯৬৭	১২৬	৯	৫৪,৪৯,৩০৫	৬১.৮৩
১৯৭২	১১৪	৮	৬৩,২৮,৫৩৭	৬০.৮৫

সুত্র: Statistical Report on General Election, The Legislative Assembly of Assam, 1951 to 1972.

১৯৫৭ সালের নির্বাচনে ৯৪টি আসনের মধ্যে ৫টি তপশিলি জাতি এবং ২৬টি তপশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত হয়ে ছিল।[৩০] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ৭১টি আসনে জয় লাভ করে। এই নির্বাচনে পাথরকান্দি সংরক্ষিত আসন থেকে গোপেশ নমঃশূদ্র, সি.পি.আই প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন।[৩১] বিমলা প্রসাদ চলিহা (২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৫৭- ৬ই নবেম্বর, ১৯৭০) ছিলেন আসামের কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের তৃতীয় মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর সময় ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি অসমিয়া ভাষাকে আসামের একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব করে। এই প্রেক্ষিতে আসামের উত্তেজিত জনতা বাঙালি অধিবাসীদের আক্রমণ করা শুরু করে। এই বছরের জুলাই ও সেপ্টেম্বরে এই হিংস্রতা তীব্র হয়ে উঠে। তখন প্রায় ৫০ হাজার বাঙালি হিন্দু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ছেড়ে আসাম সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। আরও ৯০ হাজার মানুষ বরাক উপত্যকা ও উত্তর-পূর্বের অন্যত্র পালিয়ে যায়।[৩২] ন্যায়াধীশ গোপাল মেহরোত্রার নেতৃত্বে এক ব্যক্তির একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কামরূপ জেলার গোরেশ্বর অঞ্চলের ২৫টি গ্রামের ৪,০১৯টি কুঁড়েঘর এবং ৫৮টি বাড়ি ধ্বংস ও আক্রমণ করা হয়ে ছিল। এই দাঙ্গায় নয়জন বাঙালি নিহত এবং শতাধিক লোক আহত হয়ে ছিলেন।

১৯৬০ সালে ২৪শে অক্টোবর প্রস্তাবটি বিধানসভায় গৃহীত হয় এবং অসমিয়া ভাষাকে আসামের সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।[৩৩] বরাক উপত্যকার বাঙালীদের ওপরে অসমিয়া ভাষা পিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে ১৯৬১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি কাছাড় গণ সংগ্রাম পরিষদ সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ করে। বাঙালীদের ওপরে অসমিয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে শিলচর, করিমগঞ্জ আর হাইলাকান্দিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়। ১৯শে মে শিলচরের তারাপুর রেলস্টেশনে অবরোধ চলাকালে আন্দোলনকারীদের ওপর স্টেশনের সুরক্ষায় থাকা প্যারামিলিটারী বাহিনী বন্দুক ও লাঠি চালায়।

এই ভাষা আন্দোলনে সর্বমোট ১১ জন শহিদ হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন কমলা ভট্টাচার্য, হীতেশ বিশ্বাস, কুমুদরঞ্জন দাস, তরণী দেবনাথ, শচীন্দ্রনাথ পাল, সুনীল সরকার, বীরেন্দ্র সূত্রধর, কানাইলাল নিয়োগী, সুকমল পুরকায়স্থ, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, সত্যেন্দ্র দেব।[৩৪] ২০শে মে শিলচরের জনগণ শহীদদের শবদেহ নিয়ে শোকমিছিল করে প্রতিবাদ করেছিলেন। এই

ঘটনার পর কেন্দ্র সরকারের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসের (Assam (Official) Language Act (ALA-1960) সংশোধন করা হয়।[৩৫] তাতে বাংলা ভাষাকে কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দির অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

একদিকে অসমিয়া সংস্কৃতির সমর্থক জনগোষ্ঠীর মানুষ অসমিয়া ভাষা তথা সংস্কৃতিকে রক্ষা করার প্রয়াসে উদ্যোগী হয়ে ছিল। অপরদিকে অবিভক্ত আসামের অসমিয়া সংস্কৃতি থেকে পৃথক সংস্কৃতির জনগোষ্ঠী নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অঞ্চল গঠনে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। এরকমভাবে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অঞ্চলের দাবিতে নাগা, গারো, খাসি ও জয়ন্তিকা পার্বত্য অঞ্চল অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে বাঙালি এবং অসমিয়া সংস্কৃতির থেকে পৃথক করে নেওয়ার প্রয়াসে উদ্যোগী হয়ে উঠে ছিল। তার ফলস্বরূপ ১৯৬৩ সালে নাগা পার্বত্য জেলা নিয়ে গঠিত হয় নাগাল্যান্ড নামক পৃথক রাজ্য। এর পাশাপাশি ১৯৭০ সালে গারো, খাসি ও জয়ন্তিকা পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে মেঘালয় আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠিত হয়। এরপর ১৯৭২ সালে অরুণাচল প্রদেশ ও মিজোরাম কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষিত হয়।

পরবর্তীতে এই অঞ্চলগুলি পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। ১৯৭৫ সালে কংগ্রেস পার্টির সর্বময় কর্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক ঘোষিত রাষ্ট্রীয় আপাৎকালীন অবস্থা (National Emergency, 25th June, 1975- 21st March, 1977) অবসানের পর।[৩৬] আসাম সহ অনেক রাজ্যে এবং কেন্দ্র কংগ্রেস শাসনের পরিবর্তন ঘটে যায়। এ সময় কেন্দ্র এবং আসামে জনতা পার্টি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী দল হিসেবে নতুন দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর, এই সময় থেকে আসামের ভাষা সংস্কৃতি আন্দোলন নতুন ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে ছিল। আসামের জনতা পার্টির সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলার জন্য কংগ্রেস নেতাদের মুখে উগ্রজাতীয়তাবাদী বক্তব্য প্রকাশিত হতে শুরু করে।

১৯৭৮ সালে শুয়ালকুচিতে অনুষ্ঠিত আসাম সাহিত্য সভার অধিবেশনে কংগ্রেস শিবিরের সঙ্গে যুক্ত এক অত্যন্ত প্রভাবশালী জ্যেষ্ঠ লেখকের ভাষণে, এইরকম আঞ্চলিক উগ্রজাতীয়তাবাদ উঠে আসতে দেখা যায়।[৩৭]

গোলাপ বরবরা (১২ই মার্চ, ১৯৭৮-৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯) ছিলেন আসামে জনতা পার্টির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী।

সরণি: ৪.২.২.৩. ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আসাম বিধান সভায় তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব

সাল	মোট আসন	তপশিলি আসন	ভোটার সংখ্যা	ভোট শতাংশ
১৯৭৮	১২৬	৮	৭৯,৭৩,৭৯২	৬৬.৮৬
১৯৮৩	১০৯	৭	৭২,৮৪,৬১২	৩২.৭৪
১৯৮৫	১২৬	৮	৯৮,৮২,৬৮৪	৭৯.২১
১৯৯১	১২৬	৮	১,১৮৯২,১৭০	৭৪.৬৭
১৯৯৬	১২২	৭	১,২১১৯,১২৫	৭৮.৯২

সুত্র: Statistical Report on General Election, The Legislative Assembly of Assam, 1978 to 1996.

জনতা সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলার প্রয়াসে কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতৃত্বের তরফ থেকে আসামের দীর্ঘ লালিত সমস্যা গুলোকে তুলে ধরে শুরু হয়ে ছিল। নেতাদের তুলে ধরা এই সমস্যাগুলির প্রতি স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে সমর্থন মূলক প্রতিক্রিয়া পাওয়া শুরু হয়ে ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে জনতা পার্টির সোশ্যালিস্ট অংশটি এই আন্দোলনকে সমর্থন করে ছিল। জনতা দলের সোশ্যালিস্ট নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রবীন্দ্র বর্মা।[৩৮] কংগ্রেস ছাড়াও ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন নেতা এই আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিল। এই ভাবে ধীরে ধীরে বিষয়টি রাজনৈতিক প্রতিপাদ্য বিষয় (Agenda) হয়ে উঠতে থাকে। প্রাথমিকভাবে কংগ্রেস নেতাদের হাতে আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রয়াস দেখা যায়। পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের রাশ কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে।

বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে আসামে বহিরাগত তত্ত্ব উঠে আসার পরিমণ্ডলে ১৯৭৮ সালে মঙ্গলদৈ লোকসভার সদস্য হীরালাল পাটোয়ারীর মৃত্যুর ফলে সেখানে উপ-নির্বাচনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এমত পরিস্থিতিতে নিম্ন অসমের এই লোকসভা কেন্দ্রটিতে বিপুল সংখ্যক বিদেশি ভোটারের উপস্থিতির তত্ত্ব উঠে আসে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ১৯৭৯ সালে সদৌ আসাম ছাত্র সংস্থা (All Assam Students' Union) মঙ্গলদৈ লোকসভা কেন্দ্রে ভোট বয়কটের দাবি করে এবং বিদেশীদের বহিষ্কার করার জন্য আন্দোলনের ডাকদেয়।[৩৯] ১৯৭৯ সালের ৮ই জুন আসু (AASU) বিদেশী প্রবেশকারীদের সনাক্ত করণ, ভোটাধিকার খর্ব করা এবং তাদের বিতাড়ন করার দাবিতে ১২ ঘন্টা ঘন্টা আসাম বন্ধের আহ্বান জানায়।[৪০] এছাড়া ভবিষ্যতে আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য ১৯৭৯ সালের ২৬শে আগস্ট আসাম গণ সংগ্রাম পরিষদ (A.G.S.P) গড়ে তোলা হয়।[৪১] এ.জি.এস.পি. এর নেতৃত্বে ধর্মঘট, ধরনা, প্রতীকী আইন অমান্য, অফিস আদালত বয়কট প্রভৃতি কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে আসামের কিছু অংশে অচল অবস্থায় সৃষ্টি হয়।

১৯৭৯ সালের থেকে আসু এবং সদৌ আসাম গণসংগ্রাম পরিষদের পরিচালনায় আসাম আন্দোলনের উত্তরণ শুরু হয়। এই পরিস্থিতি আরও তীব্র আকার ধারন করলে, শেষ পর্যন্ত ১৯৭৯ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে গোলাপ বরবরা মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর আসামে জনতা পার্টির দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন যোগেন্দ্র নাথ হাজারিকা (৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ থেকে ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯)। এই বছর থেকে আসাম আন্দোলন শুরু হওয়ার পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ উঠে আসতে দেখা যায়। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হিসেবে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষের আগমনের তত্ত্ব উঠে আসে। সরকারি তথ্য অনুসারে ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে

আসামে হিন্দু সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৪১.৮৯ শতাংশ। অপরদিকে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৭৭.৪২ শতাংশ।[৪২]

অপর দিকে আসামের ভাষা-নৃতাত্ত্বিক বিভিন্ন সমস্যা গুলোকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কংগ্রেসপন্থী নেতাদের ভূমিকার কথা উঠে আসে। এমত পরিস্থিতিতে ১৯৭৯ সালের সংসদীয় নির্বাচন রদ করা হলে সংসদীয় ব্যবস্থা অচল হয়ে পরে।[৪৩] জনতা সরকার প্রশাসন চালাতে ব্যর্থ হওয়ায় ১২ই ডিসেম্বরে আসামে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হয়। ইতিমধ্যে ১৯৮০ সালে কেন্দ্রে পুনরায় ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকার অধিষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে আনোয়ারা তৈমুরের নেতৃত্বে এবং অন্যান্য দলের সমর্থনে আসামে কংগ্রেস (ইন্দিরা গান্ধী) সরকার গঠিত হয়।[৪৪] সরকারি কর্মচারী এবং বিভিন্ন আন্দোলনকারীদের বিরোধিতায় ছয় মাসের মধ্যেই এই সরকারের পতন হয় এবং আবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়।

অপরদিকে আসামের বিভিন্ন সংগঠন ভোটার তালিকা থেকে বিদেশীদের নাম বাতিল করার দাবি তুলতে থাকে। ১৯৮৩ কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশিদের নাম বাতিল করার দাবি নাকচ করে ফেব্রুয়ারি মাসে একসঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট প্রকাশ করে। এই ঘটনায় ক্রমাগত আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করলে, শেষ পর্যন্ত তা হিংস্রতার রূপ ধারন করে। বহিরাগত বাঙালিদের উপর আক্রমণের এইরকম উদাহরণ হিসেবে উঠে আসে নেইলি হত্যা কাণ্ড।

১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নিম্নআসামের মুসলিম অধ্যুষিত নেইলি হত্যা কাণ্ড সংগঠিত হয়। নেইলি ছাড়াও মঙ্গলদৈ, শিলাপাথর, ধেমাজি, ডিগবয় প্রভৃতি অঞ্চলেও সংঘর্ষের ঘটনা দেখা যায়।[৪৫] এই সকল অঞ্চলে আক্রমনে শিকার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু বাঙালি মুসলিম হলেও, এর পাশাপাশি বাঙালি হিন্দু তথা নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীও এই হিংস্রতার থেকে অব্যাহতি পায়নি।

১৯৮৩ সালে আসামের ঘটনার তদন্তর জন্য ত্রিভুবন প্রসাদ তিওয়ারির সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনে, অবিভক্ত লাখিমপুর জেলার হিংসাত্মক ঘটনাবলী উঠে এসেছে।[৪৬] তৎকালীন সংবাদ প্রতিবেদক অরুণ শৌরির প্রতিবেদনে নেইলি গণহত্যা এবং আসামের হিংসাত্মক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়।[৪৭] এছাড়া নেলি হত্যা কান্ডের ওপর প্রথম বিদ্যায়তনিক গবেষণা প্রকাশ করেন জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক মাকিকো কিমুরা।[৪৮] এই সকল প্রতিবেদনে আসাম হত্যাকাণ্ড (Massacre) এর বিবরণ এবং কারণ তুলে ধরার প্রয়াস দেখা গেছে।

১৯৮৩ সালের নির্বাচনের পর নেলি ঘটনায় প্রায় ১,৬০০ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। স্থানীয় অসমিয়া তিওয়া, কারবি (Karbi), মিসিং, রাভা ও কোচ জনগোষ্ঠী পূর্ববঙ্গীয় মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে ছিল।[৪৯] এই গণহত্যার ঘটনা সংবাদ মাধ্যমের হাত ধরে দেশ তথা বিশ্বের আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। নেলি ঘটনার মধ্য দিয়ে এই হিংসাত্মক কার্যকলাপ উঠে আসলেও এই ঘটনা প্রবাহ থেমে থাকেনি। ইতিপূর্বে ১৪ই ফেব্রুয়ারি উত্তর আসামের ধেমাজির কাছে বিষ্ণুপুর, শান্তিপুর, টেকজুরি, ধরণিবস্তি প্রভৃতি প্রায় ১৫টি বাঙালি হিন্দু গ্রামের উপর আন্দোলনকারীরা আক্রমণ করে ১০০টির বেশি বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ছিল।[৫০] ২০শে ফেব্রুয়ারি শিলাপাথর অঞ্চলে আর্নে তিরাশি, আর্নে রাম নগর, ১নং আর্নে চাপারি, ২নং আর্নে চাপারি মতো নমঃশূদ্র অধ্যুষিত গ্রাম এইরকম আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে ছিল।[৫১]

তিওয়ারি কমিশনের রিপোর্টে, এই বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ১,৩৪৯টি হিংসাত্মক ঘটনার বিবরণ সমাহিত করা হয়ে ছিল।[৫২] শাসন ব্যবস্থা অচল অবস্থার সুযোগ নিয়ে নেলি, ধেমাজি, জোনাই এবং কোকরাঝারে বাঙালি মুসলমান এবং হিন্দুদের ওপর আক্রমণ, গোরেশ্বরে অসমিয়া হিন্দুদের সঙ্গে বাঙালি হিন্দুদের সংঘর্ষ, সামগুড়ি, ঢালিয়া এবং

ঠেকেরাবাড়িতে মুসলমানরা হিন্দুদের হত্যা, আবার চাউলখোয়া চাপারিতে অসমিয়া হিন্দু মুসলমান মিলে বাঙালি মুসলমানদের হত্যা করার মতো ঘটনা ঘটেছে।[৫৩] তৎকালীন সংবাদ প্রতিবেদক অরুন সৌরি আসামের এই হিংসাত্মক ঘটনার জন্য সরকারপক্ষ এবং বিরোধীপক্ষ উভয়কে দায়ী করেছেন।[৫৪]

বিভিন্ন প্রতিবেদনে আসামের উদ্বাস্ত বাঙালি হিন্দু এবং মুসলিমদের উপর অত্যাচারের বিভিন্ন কারণ উঠে আসে। ভাষাগত সংস্কৃতি বজায় রাখার উদ্বেগ থেকে বিদেশিদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার যে দাবি উঠে ছিল, তার জন্য ভোট বয়কটের ডাক দেওয়া হয়ে ছিল। ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই সকল আন্দোলনকে অস্বীকার করে একসঙ্গে লোকসভায় এবং বিধানসভা ভোট সম্পন্ন করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আসাম সংঘর্ষের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে ছিল। তাছাড়াও নেলি অঞ্চলে স্থানীয়দের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের সংঘাত, শিলাপাথর অঞ্চলে বাঙালি হিন্দুদের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত বিবাদ, হিংসাত্মক ঘটনার সূচনা করে ছিল।[৫৫] এই সকল ঘটনার পর আসাম গণ পরিষদ এবং সদৌ আসাম গণসংগ্রাম পরিষদ এই সমস্ত হিংসাত্মক ঘটনার দায়ভার নিতে অস্বীকার করে।

১৯৮৩ সালের নির্বাচনে ১২৬ নির্বাচন কেন্দ্রের মাত্র চারটি কেন্দ্রে কংগ্রেস (আই) প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়ে ছিল। বাকি সকল কেন্দ্রে তাদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ঘোষণা করা হয়ে ছিল।[৫৬] নির্বাচনের পর হিতেশ্বর শইকীয়া (প্রথমবার) (২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩- ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৮৫) এর নেতৃত্বে কংগ্রেস (আই) দল সরকার গঠন করে। এই সরকার গঠনের প্রথম পর্যায় থেকেই আন্দোলনকারী সংগঠনের বাধা ও বয়কটের সম্মুখীন হতে হয়। সরকার এবং আন্দোলনকারী সংগঠনের পারস্পরিক সংঘাতের প্রক্রিয়া অবসানের জন্য ১৯৮৪ এপ্রিল মাস থেকে ভারত সরকারের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়।

শেষ পর্যন্ত ১৯৮৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সময় আসাম গণ পরিষদ [All Assam Students' Union (AASU)], আসাম গণসংগ্রাম পরিষদ [All Assam Gana Sangram Parishad] এবং কেন্দ্র সরকারের মধ্যে আসাম চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী আসাম বিধানসভা ভঙ্গ করে পুনরায় নির্বাচন সংগঠন করার ব্যবস্থা করা হয়। বিদেশীদের চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে ৫ নং বিধি (Clause 5 of the MoS) অনুসারে ১.১.১৯৬৬ সালের আগে পর্যন্ত যারা আসামে এসেছেন, তাদের নাগরিকত্ব স্বীকার করা হবে।[৫৭] ১.১.১৯৬৬ থেকে ২৪শে মার্চ ১৯৭১ সালের মধ্যে এসেছেন তাদের ভোটাধিকার ১০ বছরের জন্য বাতিল করা হবে। দশ বছর পরে পুনরায় তাদের ভোটাধিকার স্বীকার করা হবে।[৫৮] ৫ নং বিধির ৮ নং অনুবিধি (The Subsection 8 of Clause 5 of the MoS) অনুসারে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ এবং তার পরে বিদেশীদেরকে আইন অনুযায়ী বহিষ্কৃত করা হবে।[৫৯] এই চুক্তির ফলে আসাম আন্দোলনের অবসান হয় এবং সংসদীয় রাজনীতির পরিবেশ ফিরে আসতে শুরু করে।

আসাম আন্দোলনের নেতৃত্বের দাবি অনুসারে সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করা হয়। এই সংশোধিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ৬,৮৯,৭১৫ জন ভোটারকে বাদ দেওয়া হয়ে ছিল।[৬০] আসাম চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর আসাম রাজনীতিতে আসাম গণ পরিষদ এবং সংযুক্ত সংখ্যালঘু মোর্চা [United Minorities Front (UMF)] এই দুইটি নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সংযুক্ত সংখ্যালঘু মোর্চা দলটি ছিল পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম এবং হিন্দু নেতাদের নিয়ে গঠিত হয়ে ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আসাম চুক্তি বাতিল করা। ১৯৮৫ সালের নির্বাচনে ৩৫.১৭ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্দল হিসেবে আসাম গণ পরিষদ ৬৪টি আসনে জয়লাভ করে। কংগ্রেস (আই) ২৫টি পায় এবং সংযুক্ত সংখ্যালঘু মোর্চা ১১.০৯ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৭টি আসনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়।[৬১]

১৯৮৫ সালের নির্বাচনের পর সদৌ আসাম ছাত্র সংস্থা (All Assam Students' Union) এর তাদানিন্তন সভাপতি প্রফুল্ল কুমার মহন্ত (প্রথমবার) (২৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৫-২৭ নবেম্বর, ১৯৯০) আসাম গণ পরিষদ দলের নেতা হিসেবে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হন। আসামে ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যে সকল দাবী নিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়ে ছিল, সরকার গঠন করার পর, তার বাস্তবিক প্রয়োগ আসাম গণ পরিষদের নেতাদের দ্বারা সফল হয়নি।[৬২] পরবর্তীতে আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে মত পার্থক্য তৈরি হওয়ায় ১৯৯১ সালের নির্বাচনের আগে দীনেশ চন্দ্র গোস্বামী এবং ভৃগুকুমার ফুকনের নেতৃত্বে নতুন আসাম গণ পরিষদ দল গঠিত হয়ে ছিল। ফলত পরবর্তী নির্বাচনে জনগণের রায় কংগ্রেসের দিকে চলে যায়। পরবর্তী কালে ১৯৯৪ সালে নতুন আসাম গণ পরিষদ দল পুনরায় আসাম গণপরিষদের সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস ৬৬ টি আসনে জয় লাভ করে সরকার গঠন করে। হিতেশ্বর শইকীয়া (৩০ জুন, ১৯৯১-২২ এপ্রিল, ১৯৯৬) দ্বিতীয়বার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের থেকে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। অপরদিকে আসাম গণ পরিষদ ১৯টি এবং নতুন আসাম গণ পরিষদ ৫টি আসনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়ে ছিল।[৬৩] ভারতীয় জনতা পার্টি এই নির্বাচনে দশটি আসনে জয়ী হয়ে ছিল। তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আটটি আসনের মধ্যে ৪টি জাতীয় কংগ্রেস, দুইটি আসাম গণ পরিষদ এবং দুইটি বিজেপির দল থেকে জয় লাভ করে ছিল।[৬৪]

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ১২২টি আসনের মধ্যে আসাম গণ পরিষদ ৫৯টি, জাতীয় কংগ্রেস ৩৪টি, বিজেপি ১০টি আসনে জয় লাভ করে।[৬৫] তপশিলিদের জন্য সংরক্ষিত সাতটি আসনের মধ্যে আসাম গণ পরিষদ থেকে ৫টি, জাতীয় কংগ্রেস ও বিজেপি থেকে একটি করে আসনে জয়লাভ করেন।[৬৬] এই নির্বাচনের পর প্রফুল্ল কুমার মহন্ত (১৭ই মে,

২০০১) দ্বিতীয়বারের জন্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। দুইবার আসামের সরকার গঠন করার পরেও নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধ, অন্তর্দ্বন্দ্ব। অপরদিকে এই সরকারের প্রতি দুর্নীতি এবং গুপ্তহত্যার মতন অভিযোগ আরোপ করা হয়।[৬৭] এমতো পরিস্থিতিতে ২০০৫ সালের ৩রা জুলাই প্রফুল্ল কুমার মহন্তকে দলথেকে বহিস্কার করা হয়। এরপর তিনি প্রগ্রেসিভ আসাম গণ পরিষদ দল তৈরি করেন। পরবর্তীতে ২০০৮ সালের গোলঘাট সম্মেলনে সকল বিরোধিতার অবসান ঘটিয়ে গণপরিষদের সকল নেতা এনং বিক্ষুব্দ দল পুনর্মিলিত হয়।

২০০১ সালের পর আসাম গণপরিষদের নেতাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং বিচ্ছিনতার পরিস্থিতিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তরুণ গগৈ (১৭ মে, ২০০১-২০১৬) এর নেতৃত্বে পরপর তিন বার সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়।

সরকার বদল হলেও আসামের ভাষা-নৃতাত্ত্বিক দাবির অন্ত হয়নি। এই দাবিকে গুরুত্ব প্রদান করে ২০১৪ সালে আসামের নাগরিকপঞ্জি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইতি মধ্যে আসাম আন্দোলনের অন্যতম যুবনেতা সর্বানন্দ সোনোয়াল অ.গ.প. ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন।

সরণি: ৪.২.২.৩. ২০০১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত আসাম বিধান সভায় তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব

সাল	মোট আসন	তপশিলি আসন	ভোটার সংখ্যা	ভোট শতাংশ
২০০১	১২৬	৮	১,৪৪,৩৯,১৬৭	৭৫.০৫
২০০৬	১২৬	৮	১,৭৪,৩৪,০১৯	৭৫.৭৭
২০১১	১২৬	৮	১,৮১,৮৮,২৬৯	৭৫.৯২
২০১৬	১২৬	৮	১,৯৯,৯০,৭৫৫	৮৪.৬৭
২০২১	১২৬	৮	২,৩৪,৩৬,৮৬৪	৮২.৪১

সুত্র: Statistical Report on General Election, The Legislative Assembly of Assam, 2001 to 2021.

সর্বানন্দ সোনোয়াল ২০১৬ সনের আসাম বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে জয় লাভ করে এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রীর পদ (২৪শে মে ২০১৬ -১০ ই মে ২০২১) গ্রহণ করেন। ২০১৮ সালের ৩০শে জুন আসামে জাতীয় নাগরিকপঞ্জির প্রাথমিক খসড়া প্রকাশিত হয়। ২০১৯ সালের ৩১ শে অগাস্ট জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নিবন্ধিকরন (National Register of Citizens) এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়। তাতে আসামের ৩,৩০,২৭,৬৬১ জনের নাগরিকত্ব পরিক্ষার আবেদন পত্র জমা পড়েছিল। তার মধ্যে ১৯,০৬,৬৫৭ জনের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে। এই ১৯ লাখের মধ্যে ১৩ লাখ বাঙালি হিন্দু। এই ১৩ লক্ষ বাঙালি হিন্দুর মধ্যে নব্বই শতাংশই তপশিলি এবং তাদের একটি সিংহভাগ নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষ।[৬৮] ২০২১ সালের আসাম বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে এবং হিমন্ত বিশ্বশর্মা মুখ্য মন্ত্রী নির্বাচিত হন।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আসাম আন্দোলনের গতি প্রকৃতি সবসময় একটি নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হয়নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর বিভিন্ন দিক উঠে আসে। ভাষা-নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আসাম রাজ্যটি ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসার পর থেকে তার স্বাতন্ত্রতা হারাতে শুরু করে। ব্রিটিশ শাসনকালে আসামের চা বাগান শিল্পের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চা শ্রমিক নিয়ে আসা শুরু হয়ে ছিল। এই চা শ্রমিক বাঙালি, বিহারী, নেপালি এবং বিভিন্ন আদিবাসীরাই আসামের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৭ শতাংশ।[৬৯] আবার আসামে কার্বি, ডিমাশা, দেউরি, নিশি, হো, হাজং, তূরুং, রাভা, কুকি, মিসিং প্রভৃতি ১৫টির বেশি স্থানীয় উপজাতির জনগোষ্ঠীর বসবাস।[৭০] এই প্রতিটি গোষ্ঠী এবং জাতি উপজাতি গুলির নিজস্ব স্থানীয় ভাষা আছে যা প্রায় ৪০টিরও বেশী। এই সকল ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে বাংলা দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষা। এছাড়া আসাম দখল করার পর ১৮৩৬ থেকে ১৮৭৩ সাল

পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার বাংলা ভাষাকে আসামের উপরে আরোপ করে। এর ফল স্বরূপ অসমিয়া জাতীয়তাবাদী মননে বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

ব্রিটিশ আমলের বাঙালি এবং অন্যান্য ভাষা গোষ্ঠীর আগমনের ফলে আসামের ভাষা-নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতি ছাড়াও কৃষি ও জমি সংস্কৃতির বিবর্তন, কর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি, মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ধর্মীয় সংস্কৃতির বিবর্তন প্রভৃতি কারণগুলি বাইরে থেকে আসা বা প্রব্রজন (Migration) কারী জনগোষ্ঠীর প্রতি স্থানীয় অসমিয়া জনমানসে ক্ষোভ জাগ্রত হতে দেখা যায়। ১৯৮৩ সালের নেলি হত্যাকাণ্ড ছিল মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর এই রকম ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।[৭১]

এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র, প্রব্রজন এবং ভাষা-নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য উদ্ভূত উৎকণ্ঠা সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থেকেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়পর্ব থেকে অসমিয়া ভাষাকে রাজ্যের প্রধান ভাষা হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াসে বাংলা ভাষাকে দমন করার প্রয়াস দেখা যায়। ১৯৭৮ সালের জনতা সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে বিষয়টি ধীরে ধীরে রাজনৈতিক উপপাদ্য বিষয় (Agenda) হয়ে উঠতে থাকে। এই সময় থেকে অসমিয়া ভাষার সংস্কৃতি রক্ষার উপায় হিসেবে বহিরাগত তত্ত্বের উদ্ভব হতে শুরু করে। এই বহিরাগতরা ছিলেন আসামের বাইরে থেকে আসা অ-অসমিয়া ভাষী প্রব্রজনকারী জনগোষ্ঠী।

১৯৭৯ সাল থেকে সদৌ আসাম ছাত্র সংস্থার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বহিরাগত তত্ত্বটি ক্রমশ বিদেশি তত্ত্বের দ্বারা পুনঃস্থাপিত হতে থাকে। স্থানীয় অসমিয়া জনগোষ্ঠীর সকল সমস্যার পুঞ্জিভূত বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় বিদেশি তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। এই তত্ত্ব অবলম্বন করে আসাম গণ পরিষদ আসামের শাসন ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়ে ছিল। পরবর্তীতে আসাম গণপরিষদের সদস্যগণ ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (National Democratic Alliance) এ যোগ দিলে আসাম গণ পরিষদের মতো আঞ্চলিক

দলের কাছ থেকে আসামের ভাষা-নৃতাত্ত্বিক সমস্যা (Agenda) জাতীয় দলের হাতে স্থানান্তরিত হয়।

৪.২.৩. ত্রিপুরা রাজ্যে তপশিলি তথা নমঃশূদ্র জাতি চেতনা

ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থিত ত্রিপুরা রাজ্য ১৯৪৭ সালে ভারতের সঙ্গে যুক্ত (Merge) হয়। এর আগে পর্যন্ত ব্রিটিশ করদ রাজ্য হিসেবে এখানে রাজতন্ত্র বজায় ছিল। ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারি প্রদেশটি ভারতের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায়। ১০,৪৯১.৬৯ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট রাজ্যটি অক্ষাংশ ২২°৫৬'উঃ থেকে ২৪°৩২'উঃ এবং দ্রাঘিমাংশ ৯০°০৯'পূঃ থেকে ৯২°২০'পূঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজ্যটির উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমায় বাংলাদেশ অবস্থিত এবং পূর্ব দিকে ভারতের আসাম ও মিজোরাম অবস্থিত। ত্রিপুরায় বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার (৩৬,৭৩,৯১৭ জন) মধ্যে ২৪,১৪,৭৭৪ (৬৫.৭২ শতাংশ) জন মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন।[৭২] ২০১২ সালের আগে পর্যন্ত রাজ্যটি ধলাই, উত্তর ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা এই চারটি জেলায় বিভক্ত ছিল। এই বছর থেকে গোমতী, খোয়াই, সিপাহীজলা এবং ঊনকোটি নামক আরও চারটি নতুন জেলা ঘোষণা করা হয়।

ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশের রাজ্য গুলির মধ্যে আসামের পর ত্রিপুরা রাজ্যটিতে দ্বিতীয় সর্বাধিক নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। এই রাজ্যে তপশিলি জাতির মানুষের সংখ্যা ১৭.৮ শতাংশ, তার মধ্যে নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সংখ্যা ২,১৫,২৬৭ জন, যা মোট জন সংখ্যার প্রায় ৫.৮৫ শতাংশ এবং তপাশিলি জাতির প্রায় ৩২.৮ শতাংশ।[৭৩] নমঃশূদ্ররা এই রাজ্যের সংখ্যা গরিষ্ঠ তপশিলি জনগোষ্ঠী।

ত্রিপুরার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সময় রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন হলেও রাজ্যটি প্রাচীনকাল থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে স্থানীয় রাজতন্ত্রের অধীনে ছিল। ঔপনিবেশিক শক্তির আগমনের পর, ১৮০৯ সালে রাজ্যটি ব্রিটিশ করদ রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা পর্বে ত্রিপুরার নাবালক রাজা কিরিত বিক্রম কিশোরের তরফ থেকে রাজমাতা কাঞ্চন প্রভাদেবী ভারতের সঙ্গে যোগদান পত্র (Instrument of Accession, 13th August, 1947)[৭৪] স্বাক্ষর করেন। অতঃপর ১৯৪৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর একত্রীকরণ চুক্তি (Merger Agreement) এর মধ্য দিয়ে ভারতের অঙ্গীভূত হয়। ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারি প্রদেশটি ভারতের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায়।

ত্রিপুরার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমান্তে বাংলাদেশ এবং পূর্ব দিকে ভারতের অপর দুই রাজ্য আসাম ও মিজোরাম অবস্থিত। জঙ্গল ও পর্বত বেষ্টিত এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির নৃতত্ত্বগত (Ethno Cultural) এবং ভাষা সংস্কৃতিগত বিবিধতা অনন্য। এখানে বাংলা ভাষার আগমনের বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে পঞ্চদশ শতক থেকে ত্রিপুরার রাজপরিবার কর্তৃক সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষার প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার সূচনা হয়ে ছিল। রাজা রত্ন মানিক্য (১৪৬৮-৮৮) এর রাজত্বকালে প্রায় চার হাজার বাঙালি পরিবারকে ত্রিপুরায় নিয়ে এসে, তাদের বিভিন্ন সরকারি পদে নিয়োগ করা হয়ে ছিল বলে জানা যায়।[৭৫] এরপর বাংলা ভাষাকে রাজদরবারের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়ে ছিল। এই সকল কারণে, ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির একটি গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়ে ছিল।

ইংরেজ করদ রাজ্য হওয়ার পর ১৮৭২ সাল থেকে ত্রিপুরার জনগণনার বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় আদমশুমারির তথ্য সম্পর্কে দ্বিমত থাকলেও তৎকালীন জনবিন্যাস সম্পর্কে একটি ধারনা পাওয়া যায়। ১৮৭২ সালের তথ্য অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যে

বসবাসকারী ৯০.০৪ শতাংশ মানুষ ছিলেন জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত।[৭৬] এছাড়া এখানে বাঙালি, মনিপুরী এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। এই রাজ্যে ১৯টি উপজাতির বাসস্থান। এদের মধ্যে পুরান ত্রিপুরা উপজাতি বা ককবরক ভাষা জনগোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা সর্বাধিক।[৭৭] এছাড়া রিয়াং, জামাতিয়া, চাকমা, নোয়াটিয়া, হালাম, মগ, মুন্ডা, কুকি, গারো প্রভৃতি উপজাতি উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার আগে থেকেই ত্রিপুরায় বাঙালি জনগোষ্ঠীর আগমন শুরু হয়ে ছিল। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে এই প্রবাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যখন ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্থানের ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, বাগেরহাট প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দাঙ্গা শুরু হয়। তখন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতেও এই দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এই দাঙ্গা কবলিত অঞ্চল গুলি ছিল মূলত নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য কৃষি নির্ভর নিম্নবর্ণের মানুষের বসত ভূমি।[৭৮] এই উদ্বাস্তুদের একটি অংশ ত্রিপুরায় অভিবাসন করে।

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ত্রিপুরায় বাঙালি উদ্বাস্তু আগমনের পরিসংখ্যান এই তথ্যকে সমর্থন করে।[৭৯] এইভাবে ১৯৫১ সালের আদমশুমারির পরিসংখ্যানে দেখা যায়, যে ত্রিপুরায় আদি নিবাসীদের তুলনায় বহিরাগত বাঙালির সংখ্যা বেশি। এরপর ১৯৬৪-৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে অসংখ্য মানুষ অসাম ত্রিপুরা মনিপুর প্রভৃতি জায়গায় চলে এসেছিল।[৮০] মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ও এই উদ্বাস্তু প্রবাহ থেমে থাকেনি। কখনো ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে, বা কখনো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এই উদ্বাস্তু প্রবাহ হয়ে চলে। পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরা অভিবাসিত বাঙালি জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ ছিল তপশিলি তথা নমঃশূদ্র জাতির মানুষ।

২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় ত্রিপুরা আদিবাসীদের সংখ্যা ৩১.৭৮ শতাংশ অপরদিকে বহিরাগত বাঙালি হয়ে উঠেছে সংখ্যাগুরু। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের আদি বাসভূমিতে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। ত্রিপুরার জনবিন্যাসগত এই পরিবর্তন রাজ্যটির রাজনীতিতেও প্রতিফলিত হয়। ত্রিপুরার প্রথম দুজন কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শচীন্দ্র লাল সিং (Sachindra Lal Singh) তাঁর সময় বিধানসভার সর্বমোট ৩০টি আসনের মধ্যে তিনটি তপশিলি জাতির জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত ছিল। এবং সুখময় সেনগুপ্তের সময় ৬০টি আসনের মধ্যে তপশিলি জাতি জন্য ৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়।[৮১] তৃতীয় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসি দলের (TCD) প্রফুল্ল কুমার দাস। জনতা দলের থেকে চতুর্থ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন রাধিকা রঞ্জন গুপ্ত।

সরণি: ৪.২.৩.১. ১৯৪১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরার জনসংখ্যা পরিবর্তনের পরিসংখ্যান

সাল	জনসংখ্যা	বৃদ্ধির পরিমাণ (শতাংশ)
১৯৪১	৫,১৩,০১০	+ ৩৪.১৪
১৯৫১	৬,৩৯,০২৯	+ ২৪.৫৬
১৯৬১	১১,৪২,০০৫	+ ৭৮.৭১
১৯৭১	১৫,৫৬,৩৪২	+ ৩৬.২৮
১৯৮১	২০,৫৩,০৫৮	+ ৩১.৯২
১৯৯১	২৭,৪৪,৮২৭	+ ৩৩.৬৯
২০০১	৩১,৯১,১৬৮	+ ১৫.৭৪
২০১১	৩৬,৭৩,৯১৭	+ ১৪.১৮

সূত্র: ১৯৪১ থেকে ২০১১ সাল ত্রিপুরা আদমশুমারি।

পঞ্চম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট দলের নৃপেন চক্রবর্তী (5th January 1978- 5th February 1988)। এই সময় তপশিলি জাতের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭টি।[৮২] ষষ্ঠ এবং সপ্তম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের সুধির রঞ্জন মজুমদার এবং সমীর রঞ্জন বর্মন। অষ্টম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির

দশরথ দেববর্মা (10 April 1993- 11 March 1998)। নবম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মানিক সরকার (11 March 1998-9 March 2018)। ২০১৩ জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ছিল ১০ টি।[৮৩] দশম মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় জনতা পার্টির বিপ্লব কুমার দেব (9th March 2018- 15th May 2022)। একাদশতম ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্যমন্ত্রী হন মানিক সাহ (15th May 2022)।

নির্বাচনের রাজনীতির আলোচনায় দেখা যায় ত্রিপুরা সর্বমোট ১১ জন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে একমাত্র দশরথ দেব ছিলেন ত্রিপুরার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ। অর্থাৎ নির্বাচনের রাজনীতির ক্ষেত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরার জনজাতি সমূহের সার্থ রক্ষায় একদিকে যেমন 'Tripura Tribal Areas Autonomous District Council' গঠন করা হয়।[৮৪] অপরদিকে আমরা বাঙালি পার্টির (AMB) উদ্যোগে উত্তর পূর্ব ভারতে বাঙালির স্বার্থ রক্ষা করার প্রয়াস দেখা যায়।

৪.৪. সিদ্ধান্ত, উপসংহার এবং প্রশ্ন উত্থাপন

উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যসমূহ নৃতত্ত্বগত (Ethno Cultural) এবং ভাষা সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। ব্রিটিশ উপনিবেশ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর বিশেষত আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যপক অভিবাসন (Immigration) শুরু হয়। এই সকল অভিবাসিতদের মধ্যে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। এই বাংলা ভাষী মানুষের মধ্যে তপশিলি জাতি অন্তর্ভুক্ত নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় রাজ্য দুইটিতে অভিবাসন জনিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বহিরাগত জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভূমিপুত্রদের ক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়। এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে রাজ্য দুইটিতে ভিন্ন প্রেক্ষিত উঠে আসতে দেখা যায়। আসামের ক্ষেত্রে এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় নৃতত্ত্বগত (Ethno Cultural) এবং ভাষা সংস্কৃতিগত আন্দোলন বা ভূমিপুত্র

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অপরদিকে ত্রিপুরায় জনবিন্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন এই ভাষা নৃতাত্ত্বিক আন্দোলনকে দুর্বল করে দিয়ে ছিল।

আসামের ভূমিপুত্র আন্দোলন আলোচনায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং বরাক উপত্যকায় দুইটি ভিন্ন প্রেক্ষিত উঠে আসতে দেখা যায়। একদিকে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ভূমিপুত্র বা খিলঞ্জীয়া আন্দোলন ভারত তথা বিশ্বের গবেষকদের আলোচনায় উঠে এসেছে। অপরদিকে বরাক উপত্যকায় এই ভূমিপুত্র আন্দোলনের প্রবলতা অনেকটাই ক্ষীণ।

ভাষা সংস্কৃতি গত আন্দোলনের এই ভিন্নতার কারণ অনুধাবন করা হলে কয়েকটি বিষয় উঠে আসে। ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক উপত্যকার জনবিন্যাসগত পার্থক্যের বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, একদিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জনবিন্যাস ক্ষেত্রটিতে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর বসবাস। এখানে বাংলা ভাষাগোষ্ঠীর অনুপাত তুলনামূলকভাবে কম। অপরদিকে বারাক উপত্যকার কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি এই সকল জেলায় বাংলা ভাষী মানুষের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে বেশি।

আসাম অঞ্চলটি প্রাচীনকাল থেকে ভারতের মূল ভূখণ্ডের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে অঞ্চলটিতে আর্যাবর্তের সংস্কৃতির প্রচার এবং প্রসার হয়ে ছিল অনেক পরে। বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এবং উপজাতি অধ্যুষিত আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ভক্তি আন্দোলন পর্বে শ্রীমন্ত শংকরদেব (Srimanta Sankardev) প্রচারিত নব্য-বৈষ্ণব ধর্ম অধিক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। এই সকল কারণে আসামের সংস্কৃতিতে বর্ণ ও জাতি বৈষম্যের প্রবলতা তুলনামূলকভাবে কম পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে বরাক উপত্যকাটি অবিভক্ত বাংলার অংশ থাকার সূত্রে, অঞ্চলটিতে বাংলা ভাষা সংস্কৃতির প্রাধান্যের পাশাপাশি অবিভক্ত বাংলার তপশিলি সাংস্কৃতিক চেতনার ধারাবাহিকতাও পরিলক্ষিত হয়।

ব্রিটিশ শাসনকাল ১৮৩৬ সাল থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩৭ বছর আসামের উপর বাংলা ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই কারণে তৈরি হওয়া ক্ষোভকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় আসাম আন্দোলন গড়ে উঠে ছিল। অসমিয়া ভাষাকে আসামের একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব এবং এই প্রেক্ষিতে আসামের দাঙ্গা ছিল তার বহিঃপ্রকাশ। ১৯৬০ সালে ২৪ অক্টোবর প্রস্তাবটি বিধানসভায় গৃহীত হয় এবং অসমিয়া ভাষাকে আসামের সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তার প্রেক্ষিতে ১৯৬০-৬১ সালের বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাকে কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দির অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

একদিকে অসমিয়া ভাষা সংস্কৃতি রক্ষায় হিংসাত্মক প্রয়াস শুরু হয়ে ছিল। অপরদিকে আসামের অসমিয়া সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির জনগোষ্ঠী নিজেদের জন্য পৃথক ভাষা-সাংস্কৃতিক অঞ্চল গঠনে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। তার ফলস্বরূপ ১৯৬৩ সালে নাগা পার্বত্য জেলা নিয়ে গঠিত হয় নাগাল্যান্ড নামক পৃথক রাজ্য। এর পাশাপাশি ১৯৭০ সালে গারো, খাসি ও জয়ন্তিকা পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে মেঘালয় আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠিত হয়। এরপর ১৯৭২ সালে অরুণাচল প্রদেশ ও মিজোরাম কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষিত হয়। এরকমভাবে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতি রক্ষার জন্য নাগা, গারো, খাসি ও জয়ন্তিকা পার্বত্য অঞ্চল অঞ্চলের পাশাপাশি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ (Autonomous Council) গঠন বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিজেদের পৃথক করে নেওয়ার প্রয়াসে উদ্যোগী হয়ে ওঠে।

আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার খিলঞ্জীয়া বা ভূমিপুত্র আন্দোলন প্রথমিক ভাবে ভাষা সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে শুরু হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলন বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে দেখা যায়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় ভাষাকে উপলক্ষ (Purpose) করে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন ১৯৬০ এর দশকে 'বাঙাল খেদা' আন্দোলনে পরিণত হয়। আবার

১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ পর্বে তা বহিরাগত বিতাড়ন বা 'বিদেশি খেদা' আন্দোলনে পরিণত হয়।

অপরদিকে ত্রিপুরা রাজ্যটি ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং দেশভাগ ঘটনা প্রবাহের মধ্যদিয়ে ত্রিপুরার জন বিন্যাস দ্রুত পরিবর্তন হতে শুরু করে। ১৯৭২ সালে প্রদেশটি ভারতের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর দেখা যায়, স্থানীয় অধিবাসীর তুলনায় অভিবসিত বাঙালির সংখ্যা বেশি। এই জন বিন্যাসগত পরিবর্তন ত্রিপুরার ভাষা সংস্কৃতিগত আন্দোলনকে তৈরি হতে বাঁধা দেয়। এই সামাজিক সমস্যার বিষয় সমুহকে অবলম্বন করে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক সমীকরণ, ত্রিপুরার মতো অভিবাসিত বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলের ভাষা-নৃতাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে সম্পাদ্য কার্যাবলী (Agenda) তৈরি করে না। অপরদিকে আসামের ভাষা-নৃতত্ত্বগত বৈষম্যের কারণে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া ক্ষোভ ক্রমশ প্রাদেশিক রাজনীতির প্রাঙ্গন থেকে জাতীয় রাজনীতিক দলের সম্পাদ্য কার্যাবলী (Agenda) হিসেবে উঠে আসে।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ:

১. K.S. Singh (Ed): People of India: Assam volume XV part two, (Calcutta, seagull books, 2003) p. XVIII।

২. তদেব। p. XII।

৩. Vivek Chadha: Low Intensity Conflicts in India, (Delhi, Sage Publications, 2005), p. 222.

৪. সুকুমার বিশ্বাস: আসামে ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি-প্রসঙ্গ ১৯৪৭-১৯৬১ (আগরতলা, পারুল প্রকাশনী, ২০১৭)।

৫. Jayeeta Sharma: Empre's Garden: Assam and makink if India, (London, Duke University Press, 2011), p.p. 25-48.

৬. Rana P. Behal: Indian Migrant labourer in South-east Asian and Assam Plantations under the British Imperial System, (Noida, V.V. Giri National Labour Institute, 2017) p. 5।

৭. Census of India, 1872।

৮. রঞ্জিত দে: ত্রিপুরার লোক জীবন ও লোকসংস্কৃতি, (কলকাতা, নবজাতক প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ. ২।

৯. Census of India, 2011।

১০. তদেব।

১১. তদেব।

১২. তদেব।

১৩. Sanjib Baruah: In The Name of Nation: India and Its Northeast, (California, Standford University Press, 2020).

১৪. খিলঞ্জীয়া: শব্দটি বুৎপত্তিগত ভাবে আহোম ভাষা থেকে এসেছে। এর অর্থ 'Indigenous বা স্থানীয় নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষ। যারা কোনো অঞ্চলের প্রথম বাসিন্দা অথবা প্রথম পরিচিত স্থায়ী নিবাসী।

১৫. Census of India, 2011।

১৬. তদেব।

১৭. তদেব।

১৮. K.S. Singh (Ed): প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮

১৯. তদেব, পৃ. ৬১৮।

২০. K.S. Singh (Edetor): প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ৬১৫-৬২০।

২১. তদেব, পৃ ৬১৫-৬২০।

২২. তদেব, পৃ ৬১৫-৬২০।

২৩. Naresh Mitra: Suspected Ulfa terrorists gun down 5 in Assam's Tinsukia district, (Guwahati, Times of India, TNN, 2018), (https://timesofindia.indiatimes.com/ city

/guwahati /at-least-five-feared-killed-in-firing-in-assams-tinsukia-district/articleshow/66466426.cms), Date: ২৯.০৬.২০২৩, Time 20:49 IST.

২৪. The Sixth Scheduled to The Constitution (Amendment) Act, 2003, No- 44 of 2003, Dated: 7th September, 2003.

২৫. মনোজ ভট্টাচার্য: আসাম রাজ্যে মানবিক সংকট, (কলকাতা, গাংচিল, ডিসেম্বর, ২০১৮), (মধ্যে) পত্রিকা, ন-নাগরিক, পৃ.পৃ. ২৯-৩৬।

২৬. সুকুমার বিশ্বাস: প্রাগুক্ত।

২৭. শর্মিষ্ঠা দেব: জাতীয় নাগরিকপঞ্জি এবং আসামের ভূমিপুত্র ও ভুক্ত ভোগীর বয়ান, (কলকাতা, গাংচিল, ডিসেম্বর, ২০১৮), (মধ্যে) পত্রিকা, ন-নাগরিক, পৃ.পৃ. ১৪৩-১৫৩।

২৮. রূপ কুমার বর্মণ: পরিবর্ত অনুসন্ধান, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২), পৃ.পৃ. ১৫-৬৫।

২৯.The Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, No. 29 of 1956.

৩০. Statistical Report on General Election, 1951 to the Legislative Assembly of Assam, Election Commission of India, New Delhi.

৩১. Statistical Report on General Election, 1957 to the Legislative Assembly of Assam, Election Commission of India, New Delhi.

৩২. সুকুমার বিশ্বাস: প্রাগুক্ত।

৩৩. তদেব।

৩৪. ই-দেশহিতৈষী, ১৯ মে বরাক উপত্যকার ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন স্মরণে, ৫৯ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা / ১৩ মে, ২০২২/২৯বৈশাখ, ১৪২৯ (https://www.deshhitaishee.net/deshhitaishee/news-list/details/13_ may_writeup05.php), তারিখ: ২৯.০৬.২০২৩, সময়: ৮:৪০ রাত্রি।

৩৫. Assam official Language Act, 1960, Assam Act No XXXIII of 1960, Receive the assentt of governor on the 17th December, 1960)

৩৬. Hindustan Time, Written by Joydeep Bose, June 25: On this day in 1975, Indira Gandhi imposed the Emergency. What remains of its legacy? Jun 25, 2021 09:11 AM IST, New Delhi।

৩৭. প্রসূন বর্মন: অসম আন্দোলন ১৯৭৯-১৯৮৫, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২০) পৃ. ১৫।

৩৮. তদেব, পৃ. ১৫।

৩৯. তদেব, পৃ. ১৬।

৪০. তদেব, পৃ. ৩২।

৪১. তদেব, পৃ. ৩২।

৪২. Samir Kumar Das:| Conflict and Peace in India's Northeast: The Role of Civil Society, (Washington DC, East-West Center, 2007), p.p. 8-9.

৪৩. দেবর্ষি দাস: আসাম নাগরিক পঞ্জির সাতকাহন, (কলকাতা, পিপলস স্টাডি সার্কেল, ২০১৯) পৃ. ২২।

৪৪. প্রসূন বর্মন: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৪৫. তদেব, পৃ. ১৩৯।

৪৬. তদেব, পৃ. ১১৬।

৪৭. Arun Shourie, titled Assam Elections: The Avoidable Tragedy, India Today, Issue Date: May 15, 1983।

৪৮. Makiko Kimura: Memories of the Massacre: Violence and Collective Identity in the Narratives on the Nellie Incident Asian Ethnicity, Volume 4, Number 2, June 2003 পৃ-পৃ. ২২৫-২৩৯।

৪৯. তদেব, পৃ. ২২৭।

৫০. প্রসূন বর্মন: প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

৫১. তদেব, পৃ. ১১১।

৫২. তদেব, পৃ. ১১৮।

৫৩. Arun Shourie Assam elections: Can democracy survive them? India Today, Issue Date: May 31, 1983 পৃ.৫৭

৫৪. Arun Shourie, titled Assam Elections: The Avoidable Tragedy, India Today, Issue Date: May 15, 1983

৫৫. প্রসূন বর্মন: প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

৫৬. তদেব, পৃ. ৪৩।

৫৭. Frontline: 1985: Assam Accord signed at the core of the Accord was the "Foreigners Issue", Published: Aug 15, 2022 06:00IST। (https://frontline.thehindu.com/politics/india-at- 75-epochalmoments-1985-assam-accord-signed/article65721984.ece) Date: 30.06.2023, Time: 9:27 a.m.।

৫৮. তদেব।

৫৯. তদেব।

৬০. প্রসূন বর্মন: প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

৬১. তদেব, পৃ. ৪৮।

৬২. আধীর বিশ্বাস: ন-নাগরিক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৮), পৃ. ১৪৫।

৬৩. Statistical Report on General Election, 1991 to the Legislative Assembly of Assam, Election Commission of India, New Delhi।

৬৪. তদেব।

৬৫. Statistical Report on General Election, 1996 to the Legislative Assembly of Assam, Election Commission of India, New Delhi।

৬৬. তদেব।

৬৭. প্রসূন বর্মন: প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ১৬৭-১৭৮।

৬৮. নীতিশ বিশ্বাস (সম্পা): এন.আর.সি. ও ভাষা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সংখ্যা, (কলকাতা, ঐকতান গবেষণা পত্র, ২০১৯-২০) পৃষ্ঠা.৮।

৬৯. আধীর বিশ্বাস: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

৭০. তদেব, পৃ.১৪০।

৭১. Makiko Kimura: প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ২২৫-২৩৯।

৭২. আদমশুমারি, ২০১১।

৭৩. তদেব।

৭৪. The Instrument of Accession was a legal document first introduced by the Government of India Act 1935 and used in 1947 to enable each of the rulers of the princely states under British paramountcy to join one of the new dominions of India or Pakistan created by the Partition of British India.

৭৫. রূপশ্রী দেবনাথ: সম্প্রীতি ও সংকটে জনজাতি ও বাঙালি: প্রসঙ্গ ত্রিপুরার বাংলা কবিতা. ড. রূপশ্রী দেবনাথ, (https://www.thecho.in/files/ Rupashree-Debnath b0t1o4nz.pdf), তারিখ: ২৯.০৬.২০২৩, সময়: ৮:৪০ রাত্রি।

৭৬. আদমশুমারি, ১৮৭২।

৭৭. নরেশচন্দ্র দেববর্মা, বিমান ধর, কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী (সম্পা): ত্রিপুরার আদিবাসী, (আগরতলা, ত্রিপুরা দর্পণ, ২০০৯) পৃ. ১১।

৭৮. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৭৯. রঞ্জিত দে: প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৮০. আধীর বিশ্বাস: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

৮১. Statistical Report on General Election, 1972 to the Legislative Assembly of Tripura, Election Commission of India, New Delhi।

৮২. Statistical Report on General Election, 1977 to the Legislative Assembly of Tripura, Election Commission of India, New Delhi।

৮৩. Statistical Report on General Election, 2013 to the Legislative Assembly of Tripura, Election Commission of India, New Delhi।

৮৪. Tripura Gazette, Agartala, No-125, R.N.N.E. 930, Dated: 8th August, 1979.

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে তপশিলি জাতি থেকে হিন্দু সংখ্যালঘুতে বিবর্তন: নমঃশূদ্র জাতির একটি আলোচনা। (১৯৪৭-২০২১)

৫.১ ভূমিকা:

১৯৪৭ সালের দেশভাগের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের ভূ-রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সূচনা হতে দেখা যায়। দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তান নামক একটি নতুন রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ঔপনিবেশিক শাসকের বিভেদ ও শাসন নীতি এবং ভারতীয় নেতাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে সংগঠিত দেশভাগ, ভারতীয় উপমহাদেশকে তিনটি টুকরোতে বিভাজিত করে দিয়ে ছিল। ভারতের পূর্বপ্রান্তে বাংলা ও অসমের কিছু আংশ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম প্রান্তে পাঞ্জাবের কিছু অংশ ও কয়েকটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তান।

রাতারাতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম অংশের প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। ফলত নতুন দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করা অঞ্চলে বসবাসে অনিচ্ছুক মানুষজনের ক্ষেত্রে, তাঁদের আগের জাতীয়তাবাদী পরিচিতি (National Identity) সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এমত পরিস্থিতিতে, নব উদ্ভূত ইসলাম নির্ভর রাষ্ট্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বাস্তুচুতি ও দেশহীনতা[১] এর সম্মুখীন হয়ে পড়েন।

দেশ বিভাজনের জন্য র‍্যাডক্লিফ লাইন তৈরি হওয়ার পর দেখা যায়, হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত অনেক অঞ্চল পাকিস্তানের অংশে রাখা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্থানে থেকে যাওয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে অনুসূচিত জাতির একটি বড় অংশ ছিল নমঃশূদ্র, রাজবংশী,

পৌন্ড্র, বাগদি, মালো জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা ছিলেন মূলত কৃষি ও মৎস্য শিকার প্রভৃতি বৃত্তি নির্ভর মানুষ। এই অংশটি ছিল সামাজিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় বিন্যাসের নিম্নতম সরণিতে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠী। তাঁদের কাছে অভিবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম তথ্য ও পরিকাঠামো ছিল অধরা।

এই কারণে আর্থিক ভাবে সচ্ছল ও শিক্ষিত উচ্চবর্ণের অভিবাসন দেশভাগের প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু হলেও তথা কথিত নিম্নবর্ণিয় উদ্বাস্তু প্রবাহ অপেক্ষাকৃত পরে শুরু হয়। এই উদ্বাস্তু প্রবাহ দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাপ্ত হয়ে ছিল। এমত পরিস্থিতিতে পরিকল্পিত নাগরিক বিনিময় ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, ১৯৪৭ পরবর্তী প্রবজন (Migration) জনিত উদ্বাস্তু সমস্যাকে বৃদ্ধি করে ছিল।

অবিভক্ত বঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বা বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ এবং নোয়াখালী এই ৬টি জেলা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নমঃশূদ্র জাতির ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ বসবাস করতেন। ১৯৪১ সালে আদমশুমারি অনুসারে অবিভক্তবঙ্গের এই জেলাগুলিতে হিন্দু সংখ্যা ছিল যথাক্রমে- খুলনা ৫০.৫%, যশোর ৩৫%, ফরিদপুর ৩৯%, ঢাকা ৩৬%, বাখরগঞ্জ ২৮%, ও নোয়াখালী ১৯%।[২] বাংলা তথা ভারত ভাগের আগে পর্যন্ত নমঃশূদ্র জাতিটি অবিভক্ত বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলি জাতি হওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে সামাজিক ভাবে অগ্রগামিতার ফলে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী অগ্রসর জাতি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

১৯৩২ সালের পুনা চুক্তি পরবর্তী বাংলার রাজনীতিতে তপশিলি সংরক্ষিত আসনে জাতি চেতনা তথা জাতি রাজনীতির গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই জাতি রাজনীতিতে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। অবিভক্ত বাংলায় নমঃশূদ্র নেতাদের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য ছিলেন যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল, প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক প্রভৃতি। একদিকে যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল বাংলার হিন্দু এবং মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান এবং ভারতের থেকে অতন্ত্র ভাবে বাঙালিদের জন্য একটি দেশ গড়ার পক্ষে ছিলেন। অপরদিকে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর চেয়েছিলেন সকল তপশিলি জাতির সুষ্ঠু অভিবাসনের পরে দেশ বিভাজন কার্যকরী হোক।

১৯৪৭ সালের দেশ ভাগে ভারত-পাকিস্তানের সীমারেখা তৈরি করার দায়িত্ব পেয়ে ছিলেন ইংল্যান্ডের ব্যারিস্টার স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ। তিনি ৮ই জুলাই ভারতে আসেন। ভারতীয় ভৌগলিক বিন্যাস, জনবিন্যাস, সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ৩৫ দিনের মধ্যে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাজনের খসড়া প্রস্তুত করে ফেলেন। তাঁর সভাপতিত্বে বাংলা ও পাঞ্জাব সীমানা নির্ধারণের জন্য দুইটি পৃথক কমিটি গঠন করা হয়ে ছিল। বাংলা ভাগের জন্য গঠিত কমিটিতে চারজন সদস্য হিসেবে ছিলেন চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিজন কুমার মুখোপাধ্যায়, আবু সালেহ মোহাম্মদ আক্রম এবং এম.এ. রহমান।[৩]

র‍্যাডক্লিফের বাংলা ভাগের ফলে খুলনা জেলা বাদে প্রেসিডেন্সি ডিভিশন, বর্ধমান ডিভিশন, দার্জিলিং ও দেশীয় রাজ্য কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয় সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম ডিভিশন, ঢাকা ডিভিশন, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, খুলনা প্রকৃতি জেলা।[৪] বাংলা বিভাজনে নমঃশূদ্র অধ্যুষিত সিংহভাগ অংশ যথা- ঢাকা, পাবনা, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলগুলি পূর্ব পাকিস্তানের অংশে পরিণত হয়। র‍্যাডক্লিফ নির্ধারিত বাংলার বিভাজন রেখা যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল এবং প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর উভয় নেতার নমঃশূদ্র জাতিকে সংঘবদ্ধ রাখার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেয়। এই বাংলা বিভাজন বাংলাদেশের নমঃশূদ্র জাতি চেতনাকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করে ছিল।

দেশভাগের অভিঘাতে বিভাজিত বাংলায় নমঃশূদ্র তথা তপশিলি রাজনীতি সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে পড়ে ছিল। ১৯৪৭ পরবর্তীতে বাংলার তপশিলি সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মধ্যে ১৬টি আসন পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশে থেকে যায়। এই সংরক্ষিত আসনের সিংহ ভাগ ছিল নমঃশূদ্র অধ্যুষিত অঞ্চল। তাঁদের মধ্যে একটি অংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং অন্যান্য অঞ্চলে অভিবাসিত হতে শুরু করেন।

অপরদিকে বরিশালের যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের নেতৃত্বে এবং আশ্বাসে অনেক নমঃশূদ্র জাতির মানুষ বাংলাদেশ থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন। দেশভাগের পর যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল পাকিস্তানের প্রথম আইন ও শ্রম মন্ত্রী হিসেবে যোগ দান করেন। জিন্নার মৃত্যু পরবর্তী সময় পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। এমত পরিস্থিতিতে তিনি পাকিস্তানের ন্যায়পরায়ণতার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে, ভারতে চলে আসেন (১৯৫০) এবং মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। এর পর থেকে বাংলাদেশে অবস্থানকারী নমঃশূদ্র জাতির উপরে নেমে আসে আরও এক গভীর সংকট।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভৌগলিক দূরত্ব ছাড়াও সংস্কৃতি, ভাষা, আচার-আচরণ এমনকি অর্থনৈতিক অবস্থানেও ছিল ব্যাপক ব্যবধান। ১৯৪৭ সালে পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা সংখ্যা গরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিক ভাবে পঙ্গু করে ঔপনিবেশে পরিণত করে ছিল। এই ঔপনিবেশিকতা বজায় রাখার জন্য পাকিস্তানে অবস্থানকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর চলতে থাকে সাম্প্রদায়িক নিষ্পেষণ।

জিন্নার মৃত্যু এবং যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের পাকিস্তান ত্যাগের পর থেকে নমঃশূদ্র অধ্যুষিত অঞ্চল গুলিতে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরকম একটা সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার উদাহরণ ছিল ১৯৫০ সালের দাঙ্গায়। ১৯৫০ সালে বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জায়গায় উগ্রপন্থী লীগ নেতা, সাম্প্রদায়িক মৌলভী ও

মাওলানার সহযোগিতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়।[৫] একদিকে দাঙ্গার প্রবলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে অপর দিকে হিন্দু উদ্বাস্তুদের দেশ ত্যাগের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এমত পরিস্থিতিতে বাংলায় অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মত, নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী ধর্মীয় ভিত্তিতে নব নির্মিত পূর্ব পাকিস্তানে নতুন জাতীয়তাবাদী পরিচয়ে নিজেদেরকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য ধর্ম পরিবর্তন অথবা সাম্প্রদায়িক পরিমণ্ডলে টিকে থাকার জন্য নিজেদেরকে উপযোগী করে তোলা অথবা ভারতীয় হিসেবে জাতীয় পরিচিতি অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনে বাস্তুভূমি ত্যাগ করা, এর মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারত অভিমুখে যে উদ্বাস্তু প্রবাহ দেখা গেছে, মুক্তিযুদ্ধের পরেও এই উদ্বাস্তু প্রবাহ থেমে থাকেনি।

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নমঃশূদ্র জাতি চেতনার বিবর্তনের কয়েকটি দিক আলোচিত হয়েছে। প্রথমত, বাংলা বিভাজন (১৯৪৭) পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে মৌলবাদী শক্তির উত্থানের ফলে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা এবং দাঙ্গা, এই সকল বিভিন্ন কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে দেশত্যাগ করতে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) পরবর্তী বাংলাদেশেও এই ধারা অব্যহত ছিল।

এই সকল কারণে বাংলাদেশে তাঁদের সংখ্যা ক্রমাগত নিম্ন অভিমুখে যেতে থাকে। এর ফল স্বরূপ সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় এবং তার অংশ হিসেবে নমঃশূদ্র জাতির রাজনৈতিক চেতনা নির্বাচনী শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে ক্রমাগত অসক্ষম হয়ে পড়েতে থাকে। এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত, তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দ থেকে ক্রমাগত দূরে সরিয়ে দেয়। দেশভাগের পূর্বে, অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা তপশিলি জাতি তথা নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী কীভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়ত, পরিবর্তিত অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর জাতি চেতনা কীভাবে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। এছাড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিধ্বস্ত ও বিক্ষিপ্ত নমঃশূদ্র জাতির সামাজিক পরিচিতি বিষয়টি কীভাবে নতুন সমীকরণে অবস্থান করে আছে, এই বিষয় সমূহ প্রতিপাদ্য অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৫.২ বিভাজিত বাংলার (১৯৪৭) পূর্ব অংশে হিন্দু সংখ্যালঘু ও নমঃশূদ্র জাতি চেতনার বিবর্তন (১৯৪৭-২০২১)

১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্থান বা বর্তমান বাংলাদেশ ২০৩৪´ থেকে ২৬° ৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮০১´ থেকে ৯২৪১´ দ্রাঘিমাংশ মধ্যবর্তী ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে বিস্তৃত।[৬] এর পশ্চিমে রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় রাজ্য। পূর্বে দিকে রয়েছে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য এবং মিয়ানমার বা বার্মা দেশ। ২০২২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা মোট ১৬৫,১৫৮,৬২০ জন। এর মধ্যে মুসলিম ১৫০,৩৬০,৪০৫ অর্থাৎ ৯১ শতাংশ, হিন্দু ১৩,১৩০,১১০ অর্থাৎ ৭.৯৪ শতাংশ এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষ।[৭]এই হিন্দু জন জনসংখ্যার একটি অংশ নমঃশূদ্র জাতির মানুষ।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার অবসানে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী সময় ক্ষমতাসীন পাকিস্তান মুসলিম লীগের শাসন আমলে গণতন্ত্রের ভিত্তি নির্মাণ হয়নি। প্রথমে আমলা তান্ত্রিক শাসন এবং তার পরের সামরিক শাসনের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়।[৮] ভারতের পূর্ব দিকে এবং পশ্চিম দিকে রাষ্ট্রটির দুইটি আলাদা ভূখণ্ড অবস্থিত ছিল। এই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব ছিল প্রায় দেড় হাজার মাইলের মতো। এই দূরত্ব ছাড়াও

সংস্কৃতি, ভাষা, আচার-আচরণ এমনকি অর্থনৈতিক অবস্থানেও দুইটি ভূখণ্ডের মধ্যে ছিল ব্যাপক ব্যবধান।

সৃষ্টিলগ্ন থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিক ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের মুখোপেক্ষী হয়ে থাকতে দেখা যায়। লাহোর প্রস্তাবে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দেওয়ার কথা বলা হয়ে ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকদের মধ্যে প্রথম থেকে এ বিষয়ে অনীহা প্রকাশ পায়। গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে স্বৈরতন্ত্র, এক নায়কতন্ত্র ও সামরিক তন্ত্রের মধ্যে দিয়ে পাকিস্থানের শাসন চলতে থাকে। এই ভাবে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের উপর ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রে শোষণ চালিয়ে রাজনৈতিক পরিবেশ অচল করে রাখে। ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীন হয়েও পূর্ব পাকিস্তান ধীরে ধীরে পশ্চিম পাকিস্থানের কলোনি হয়ে ওঠে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত মুজিবুর রহমানের সময়কালে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভিত্তি নির্মাণ হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সময় পর্বে দীর্ঘকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অস্থিরতা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অপরদিকে মৌলবাদী একনায়ক তন্ত্রের উত্থানের ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতার পরিমণ্ডল হয়ে ওঠে অস্থিতিশীল।

এমতো পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে অবস্থানকরি ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের সামাজিক অবস্থান হয়ে ওঠে সংকটাপন্ন। এই সংখ্যালঘু হিন্দুদের একটি অংশ হিসেবে নমঃশূদ্র জাতির পরিচিতির বিবর্তন ঘটতে থাকে। অভিবাসনের ফলে বাংলাদেশে থেকে যাওয়া সকল নমঃশূদ্র জাতির মানুষ তাঁদের জাতি পরিচিতি হারিয়ে ফেলতে শুরু করেন। ধর্মীয়

অসহিষ্ণুতার আবহে হিন্দু পরিচিতি হয়ে ওঠে সামাজিক অবস্থানের আধার। এমত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অধিকাংশ নমঃশূদ্র জাতির মানুষ তাঁদের সামাজিক উত্থানের অবলম্ব অর্থাৎ মতুয়া ধর্মের ছত্রছায়ায় নিজেদের একত্রিত করার প্রয়াস শুরু করে।

১৯৪৭ সালের পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের ইতিহাসে দুইটি শাসক গোষ্ঠীর স্পষ্ট বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। অধ্যায় আলোচনার সুবিধার্থে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কে প্রথম পর্ব এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে ২০২১ পর্যন্ত সময়কে দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে ভাগ করা হয়েছে।

৫.২.২ পশ্চিম পাকিস্থানের শাসনামলে পূর্ব বঙ্গের হিন্দু তথা নমঃশূদ্র জাতির চেতনার বিবর্তন (১৯৪৭-১৯৭১)

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্থান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রেক্ষাপট আলোচনা করার ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলো নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠন করার কথা উঠে ছিল। বাংলার সোহরাবদী, আবুল হাশেম প্রভৃতি মুসলমানদের একটি অংশ চেয়েছিলেন যে, ভারতের পূর্বাংশ নিয়ে একটি স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠন করা হবে। ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লিতে মুসলিম লীগের দলীয় আইন সভার সদস্যদের এক কনভেনশনে জিন্নাহ লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে একটি মাত্র রাষ্ট্র গঠন হবে বলে ঘোষণা করেন। অপরদিকে ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগাস্টের কলকাতা এবং তার পরবর্তী দাঙ্গার ফলে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা বাংলা ভাগের পক্ষেকে সমর্থন করে।[৯]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ মূলক আচরণ। কেবল অর্থনৈতিক শোষণ নয়, বাঙ্গালি সংস্কৃতি ও

ঐতিহ্যের উপর নিপীড়ন শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তান ধীরে ধীরে পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনি হয়ে ওঠে। পাকিস্তান মূলত এমন একটি দেশ ছিলো যার দু খণ্ডের মানুষে-মানুষে শুধুমাত্র ধর্ম ছাড়া আর কোনই মিল ছিল না। পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালীদের উপর সাংস্কৃতিক অধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত এক শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব কার্যকরী করার প্রয়াস শুরু হলে, পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়।

একদিকে যেরকম বাঙালি সংস্কৃতির উপর আঘাত নেমে আসছিল। অপরদিকে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বাংলা ভাগের আগে থেকেই রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার কারণে, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর্যায়ে পৌঁছে ছিল।[১০] ১৯৪৬ সালের কলকাতার দাঙ্গা এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নোয়াখালী দাঙ্গা প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রভাব বৃদ্ধির হওয়ায়, বঙ্গের পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে হিন্দু অভিবাসনের পটভূমি প্রস্তুত হতে শুরু করে।[১১]

নমঃশূদ্র জাতির নিরীখে আলোচনার সুবিধার্থে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন আমলকে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সাল এবং ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

৫.২.২.২ ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সাল পর্বে পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র জাতি চেতনার বিবর্তন (১৯৪৭-১৯৫০)

ভারত থেকে পূর্ববঙ্গ বিভাজিত হওয়ার পরবর্তী পাকিস্থানি শাসন আমলের ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সাল পর্বটি নমঃশূদ্র জাতির ক্ষেত্রে ছিল গুরুত্ব পূর্ণ। বাংলা ভাগের প্রেক্ষাপটে নমঃশূদ্র নেতা তথা নমঃশূদ্র জাতিগোষ্ঠী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে ছিলেন। একটি অংশ

পাকিস্তানের প্রথম আইন ও শ্রমদপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে যোগ দেওয়া যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল এবং তপশিলি ফেডারেশনের নেতা এবং মতুয়া সঙ্ঘের পূর্ব বঙ্গের শাখাকে অনুসরণ করে, এখানেই থেকে যান। অপর একটি অংশ প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরকে অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে আসতে থাকেন। ১৯৪৭ পরবর্তী হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি নমঃশূদ্র জন স্রোত পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি ভারতীয় রাজ্যগুলোতে অভিবাসিত হতে শুরু করে।

১৯৪৭ পরবর্তী পাকিস্থান সরকারের আমলাতন্ত্রের বা কখনো ধর্মীয় মৌলবাদ সৃষ্ট যোগসাজশে উদ্বাস্তু ঢেউ ভারতের দিকে আসতে থাকে। একটি উদ্বাস্তু ঢেউ স্তিমিত হওয়ার আগেই আরেকটি সাম্প্রদায়িক অশান্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে থাকে, যার ফলে বাংলার উদ্বাস্তু প্রবাহ দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। ১৯৪৬ সালের নোয়াখালী দাঙ্গা ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে বঙ্গের পশ্চিম অংশের দিকে হিন্দু উদ্বাস্তু প্রবাহের প্রস্তুতি পর্ব।[১২] ১৯৪৭ সালে মতুয়া মহাসংঘাধিপতি প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরকে অনুসরণ করে যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল থেকে মতুয়াভক্ত নমঃশূদ্র মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন।[১৩]

১৯৪৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা উদ্বাস্তু সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ। জুন মাসের শেষে এই সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে ১১ লক্ষ।[১৪] এই সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল। এই পর্বে বাস্তুচ্যুত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা মানুষের মধ্যে ৩ লাখ ৫০ হাজার ছিল শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। ৫ লাখ ৫০ হাজার গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। ১ এক লাখের বেশি ছিল কৃষক এবং ১ লাখের অধিক ছিল কৃষির সঙ্গে যুক্ত কারিগর।[১৫]

পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সরকারি প্রচেষ্টা হিসেবে, এই বছরে এপ্রিল মাসে ভারত পাকিস্থান উভয় পক্ষ 'ইন্টার-ডোমিনিয়ন এগ্রিমেন্ট' নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান করা। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু পর্যবেক্ষণ ও সমস্যা নিরসনের জন্য একজন করে সংখ্যালঘু মন্ত্রী নিযুক্ত করা

হয়। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে আরেকটি 'ইন্টার-ডোমিনিয়ন কনফারেন্স স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এই চুক্তি বাস্তব ক্ষেত্রে অকার্যকারীতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রভৃতি নেতার দ্বারা তীব্র সমালোচিত হয়ে এসেছে।[১৬] কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ চুক্তি বাস্তব সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হওয়ায়, উদ্বাস্তু প্রবাহ রোধ করা সম্ভব হয়নি।

অপরদিকে যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে পাকিস্থানে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি পাকিস্থানের করাচিতে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্থানের প্রতিটি মহকুমায় একজন করে তপশিলি জাতিভুক্ত আধিকারিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১৭] তিনি পূর্ব পাকিস্থানের সকল সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুদের জন্য ২০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।[১৮]

১৯৪৮ সালের ১১ ই সেপ্টেম্বর পাকিস্থানের কায়েদে-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার মৃত্যু পরবর্তী পর্বে পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন আসতে শুরু করে, যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় পূর্ব পাকিস্থানের হিন্দুদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্থানের শাসক গোষ্ঠীর নীতির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। দেশভাগ কালীন সময়ে জিন্না নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রতি দায়বদ্ধতা স্বরূপ যে, ন্যায় বিচারের আশ্বাস দিয়ে ছিলেন, তা লঙ্ঘিত হতে শুরু করে।[১৯]

পূর্ব পাকিস্থানে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা বাড়তে শুরু করে ছিল। হিন্দুদের প্রতি মুসলিম আচরণ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। সংখ্যালঘু হিন্দু ডাক্তার, আইনজীবী, দোকানদার সবাইকে বয়কট করা হয়। হিন্দু নারীদের প্রতি নির্যাতন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধর্মীয় ও সামাজিক হেনস্তার ঘটনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। অপরদিকে পাকিস্থান সরকার সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের প্রতি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। উপরন্তু হিন্দুদের প্রতি আমলাতান্ত্রিক অন্যায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, যাতে করে হিন্দুরা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য

হয়।[২০] যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের পদত্যাগ পত্রে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলির বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি প্রশাসনিক পর্যায়ে বিরূপ কর্তব্য পালনের অভিযোগ আরোপ করা, যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।[২১]

১৯৪৯ সালের প্রথমদিকে বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত পুলিশের অত্যাচার, শ্রীহট্ট জেলার হাবিবগঞ্জ তপশিলি সম্প্রদায়ের উপর পুলিশ ও মিলিটারির অত্যাচার, এই বছরেই ২০ই ডিসেম্বর খুলনা জেলার মোল্লারহাট থানার অন্তর্গত কালশিরা গ্রামে পুলিশ মিলিটারি ও স্থানীয় মুসলমানদের অত্যাচার, এরকম ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।[২২] এই ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের অভিযোগের ভিত্তিকে দৃঢ় করে। খুলনা জেলার কালশিরা গ্রামের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি স্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হলে, পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্রে ঘটনাটিকে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করা হয়,[২৩] যা ভবিষ্যতের সংঘর্ষের সংকেত বহন করে এনেছিল।

একদিকে পূর্বপাকিস্তানে হিন্দুদের প্রতি সাম্প্রদায়িক ক্ষোভ ও আক্রমণ বৃদ্ধি পেতে থাকে, অপরদিকে এর প্রতিফলন স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুচ্যুত মানুষের আগমন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬ লক্ষ।[২৪] ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ববঙ্গের ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, বাগেরহাট প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দাঙ্গা শুরু হয়। এই দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পরে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে।[২৫] এই দাঙ্গাকবলিত অঞ্চল গুলি ছিল মূলত নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য কৃষি নির্ভর মানুষের বসত ভূমি।

এই ঘটনার পর পূর্ব পাকিস্থানে অমুসলিম ব্যক্তিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার সংকুচিত হয়ে পড়ে। অধিকন্তু, পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে হিন্দু নিপীড়ন শুরু হয়। মূলত ১৯৫০ সালের থেকে পূর্ববঙ্গে আনসার বাহিনীর[২৬] আক্রমণের মূল

লক্ষ্য হয়ে ওঠে নমঃশূদ্র তথা সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়।[২৭] দাঙ্গা বিধ্বস্ত পূর্ববঙ্গ থেকে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় চলে আসা উদ্বাস্তুদের মধ্যে ৭০ শতাংশের বেশি মানুষ সরকারি রিলিফ ক্যাম্পে শরণ নেন। সরকারি রিলিফ ক্যাম্প প্রায় গোটাটাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিজীবী নমঃশূদ্র জাতির মানুষ।[২৮] দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চল থেকে দলে দলে নমঃশূদ্র পরিবার পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে শুরু করেন।

১৯৫০ সালের পর থেকে নমঃশূদ্র এবং কৃষি নির্ভর উদ্বাস্তু প্রবাহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে ছিল। এই দাঙ্গায় বাস্তুচ্যুত মানুষদের জন্য সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে প্রবেশ সহজ সাধ্য ছিল না। হাজার হাজার উদ্বাস্তু মানুষ পূর্ববঙ্গের রেল স্টেশন স্টিমার ঘাট ঢাকা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতে শুরু করেন। এমন পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধান চন্দ্র রায় ঢাকা বিমানবন্দর থেকে উদ্বাস্তুদের নিয়ে আসার জন্য ১৬টি ভাড়াটে বিমানের ব্যবস্থা করেন। ফরিদপুর, বরিশালের স্টিমার ঘাটে ১৫টি বড় যাত্রীবাহী স্টিমার প্রেরণ করেছিলেন। বনগাঁ থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে আসা ট্রেনের কয়েকটি কামড়া মেয়েদের হাতের শাখা, ছিঁড়ে যাওয়া শাড়ি এবং রক্তাক্ত মৃতদেহ নিয়ে এসে পৌঁছে ছিল, তাঁর বিবরণ পাওয়া যায়।[২৯]

ইতিপূর্বে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে দেখা করে উদ্বাস্তুদের স্বার্থে কিছু দাবি তুলতে অনুরোধ করেন। এই দাবিগুলোর মধ্যে ছিল-

ক. পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পরিকল্পিত জন বিনিময়।

খ. ফেলে আসা সম্পত্তির উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

এবং গ. পাকিস্তানের কাছ থেকে উদ্বাস্তুদের পূনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ভূখন্ড দাবি করা।[৩০]

১৯৫০ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় লোকসভা কক্ষে ড. মুখার্জি শরণার্থীদের পক্ষে এই দাবি উত্থাপন করলে, প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু এই প্রস্তাবটিকে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শের পরিপন্থী এই যুক্তি দেখিয়ে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন।[৩১]

পরিস্থিতি আরো জটিল হওয়া শুরু করে যখন এই বছরের (১৯৫০) অক্টোবর মাসে বরিশালের অবিসংবাদিত নমঃশূদ্র নেতা যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল ভারতে চলে আসেন। তিনি ছিলেন পাকিস্থান সরকারের আইন এবং শ্রমমন্ত্রী। সংখ্যালঘু হিন্দু এবং নমঃশূদ্রদের প্রতি পাকিস্তানের ন্যায় পরায়ণতা উপর বিশ্বাস হারিয়ে, তিনি ১৯৫০ সালের ৮ই অক্টোবর কলকাতা থেকে ডাকযোগে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলির কাছে প্রায় আট হাজার শব্দের পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন।[৩২] পরের দিন ৯ই অক্টোবর কলকাতার আনন্দবাজার, যুগান্তর, স্টেটসম্যান, হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড, অমৃতবাজার, সত্যযুগ, বসুমতি প্রভৃতি পত্রিকায় পদত্যাগপত্রটি প্রকাশিত হয়।[৩৩]

যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের ভারতে চলে আসার ফলে পূর্ব পাকিস্থানে থাকা নমঃশূদ্র জানগোষ্ঠীর সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বসবাস করার সাহস এবং চেতনায় ভাঙ্গন ধরতে শুরু করে। পূর্ব পাকিস্থানের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির কথা সম্পর্কে জহরলাল নেহেরু নিজেও অবগত ছিলেন, এই কথা জানা যায় তাঁর মাউন্টব্যাটেনকে লেখা চিঠির মাধ্যমে। এই চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নিরাপত্তা হীনতার কারণে প্রায় প্রত্যেক হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করতে চাইছিল।[৩৪]

১৯৫০ পরবর্তী সময় থেকে পূর্ব পাকিস্থানে তপশিলি জাতির এই ধারনার পরিবর্তন হতে থাকে। ইসলাম শাসিত রাষ্ট্রে সকল অমুসলিম সম্প্রদায় হয়ে ওঠে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অংশ।

৫.২.২.৩ ১৯৫১ সাল ১৯৭১ সাল পর্বে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর বিবর্তন (১৯৫১-১৯৭১)

১৯৫০ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্থানে অবস্থান করার ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদয়ের ক্রমাগত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হতে থাকে। পার্শ্ববর্তী ভারতের সঙ্গে সংযোগ কম করার জন্য কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পাসপোর্ট ব্যবস্থা। ১৯৫২ সালের ১৫ই অক্টোবর থেকে পাকিস্থান সরকার একক ভাবে পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু করার কথা ঘোষণা করে। এই উদ্যোগে ভারতীয় মুসলমানরা শঙ্কিত না হলেও পূর্ব পাকিস্থানে বসবাসকারী হিন্দুদের মধ্যে দেশ ত্যাগ করার জোয়ার দেখতে পাওয়া যায়। এই বছরের মে থেকে অক্টোবর, এই ছয় মাসের মধ্যে মোট ১,৯৩,৬৬৮ জন মানুষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসন করেন।[৩৫]

পূর্বপাকিস্তানে সংখ্যালঘু নমঃশূদ্র তথা হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক সংঘটিত হতে থাকে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে ভারতে চলে আসার নিরন্তর শরণার্থী প্রবাহ। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্থানে অবস্থানকারী অবশিষ্ট নমঃশূদ্র জাতির একটি বড় অংশ মতুয়া সঙ্ঘের ছত্রছায়ায় একত্রিত হতে থাকে।

১৯৫৪ সালে পাকিস্থানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হয়। এই বছরের ৮-১১ই মার্চ পূর্বপাকিস্থানে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। মোট আসন ছিল ৩০৯টি। মোট মুসলিম আসন ২৩৭, বর্ণহিন্দু, তপশিলি, বৌদ্ধ খ্রিষ্টান, ও অন্যান্য সংখ্যালঘু আসন সংখ্যা ৭২। এই নির্বাচনে কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। এই যুক্তফ্রন্টে তপশিলি ফেডারেশনের নেতা রসোরাজ মন্ডল যোগ দিয়ে ছিলেন।[৩৬] নির্বাচনের তপশিলি ফেডারেশনের জেতা আসনের সংখ্যা ছিল ২৭টি।

মুসলিম লীগের জয়ী হয়ে ছিল মোট দশটি আসনে, যুক্তফ্রন্টের পক্ষে বিজয়ী সদস্যের সংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল ২২৩ জন।[৩৭] ঐ বছরের ৩ই এপ্রিল এ.কে. ফজলুক হক চার সদস্য বিশিষ্ট যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রিসভা গঠনের পর ৩০শে এপ্রিল ফজলুল হক ও মুজিবুর রহমান কলকাতায় শুভেচ্ছা সফরে আসেন। ভারতের সঙ্গে সখ্যতা বৃদ্ধিতে অসন্তুষ্ট পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ, ১৯৫৪ সালের ৩০শে মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করে দিয়ে, ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) এর ৯২(ক) ধারা জারির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্থানের গভর্নর শাসন আরোপ করেন।[৩৮] এইরকম অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু হিন্দু তথা নমঃশূদ্ররা সুরক্ষিত ছিলেন না। এই কারণে বিভিন্ন সময়ে শরণার্থীর প্রবাহ স্তিমিত হলেও কখনো থেমে থাকেনি।

১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ছোট-বড় মিলিয়ে ৮০২১টি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৯] এরকম একটি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের কারণে খুলনা জেলার তিনটি গ্রামের নমঃশূদ্র চাষিরা রাতারাতি গ্রাম ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, এই বর্ণনা পাওয়া যায়।[৪০] অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ধাপে ধাপে উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে সীমান্ত বন্ধ করে দেন এবং সীমান্তের ওপার থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য 'বর্ডার স্লিপ' এর ব্যবস্থা করে বিভিন্ন ট্রানজিট ক্যাম্পে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।[৪১] এমত পরিস্থিতিতে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারি হিসেব অনুযায়ী ৪০ লাখেরও বেশি মানুষ ভারতে চলে আসেন এর মধ্যে প্রায় ত্রিশ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেন।[৪২] পাকিস্তানের নির্বাচন-পরবর্তী সময় গভর্নর শাসন চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারত অভিমুখে উদ্বাস্তু প্রবাহ চলতে থাকে।

১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয়। এই সংবিধানের ২১৪.(১) নং ধারায় উর্দু এবং বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

পাকিস্তানকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' [পাকিস্তান সংবিধান, ১৯৫৬, ধারা ৩২(২)] বলে ঘোষণা করা হয়, অর্থাৎ মুসলিম ধর্মের মানুষ ছাড়া অন্য কোন ধর্মের মানুষ রাষ্ট্রনায়ক বা রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না।[৪৩] এই সংবিধানে মধ্যে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে এই নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ও প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৪৪]

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গে সামরিক শাসন জারি হলে, সামরিক শাসনের মদদপুষ্ট রাজাকার, আলবদর, আল সমাস, আনসার প্রভৃতি বাহিনী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু নিধনে পাকিস্তান সরকারের মদত পুষ্ট সংগঠন হয়ে ওঠে।[৪৫] অল্প কিছুদিনের মধ্যে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, ওই দেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি নির্যাতন এবং পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের দিকে উদ্বাস্তু প্রবাহের মধ্য দিয়ে। ১৯৬০-৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গের দিকে উদ্বাস্তু প্রবাহ ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এই সময়ে পূর্ব পাকিস্থানের উপস্থিত কানাডার টাইমস ইনক এর সংবাদদাতা মট্রিয়েলের প্রকাশিত প্রতিবেদনে সামরিক শাসকের উদ্যোগে সংগঠিত ব্যাপক হিন্দু হত্যার বিবরণ উঠে এসেছে।[৪৬] তাঁর প্রতিবেদনে, ১৯৬২ সালে পাবনা রাজশাহী এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে ঢাকা এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পাকিস্থানি সেনার উদ্যোগে ব্যাপক হিন্দু নিধনের বিবরণ উঠে আসতে দেখা যায়। ১৯৬০-৬৫ সালের মধ্যে দশ লক্ষের অধিক হিন্দু উদ্বাস্তুর আগমনের বিবরণ পাওয়া যায়। পূর্বপাকিস্থানে বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায় ছাড়াও এই অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তু ছিল, পাকিস্থানের সামরিক শাসন বিরোধী বাঙালি মুসলিম।

ক্রমাগত অত্যাচারের প্রতিবাদে পশ্চিম পাকিস্তান তথা পূর্ববঙ্গের ক্ষোভের উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিবাদ সংগঠিত হতে থাকে। ১৯৭০ সালে জেনারেল আইয়ুব খান জেনারেল

ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যান। তিনি 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার ১৯৭০' ঘোষণা করে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক নির্বাচন ঘোষণা করেন।[৪৭]

এই নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি, পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৮৮টি আসনে জয়লাভ করে।[৪৮] অপরদিকে প্রাদেশিক নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন অপরদিকে পাকিস্তান পিপলস পার্টি একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারে নি।[৪৯]

এই নির্বাচনী ফলাফলকে নস্যাৎ করার জন্য ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্থানি বাহিনীকে বাঙ্গালি নিধনযজ্ঞের সবুজ সংকেত প্রদান করে সন্ধ্যায় গোপনে পশ্চিম পাকিস্থান যাত্রা করেন।[৫০] সে রাতেই পাকিস্থান বাহিনী শুরু করে 'অপারেশন সার্চলাইট'[৫১] নামের হত্যাযজ্ঞ। পাকিস্থানি সেনাবাহিনীর এই গোপন অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, সরকার বিরোধী সকল প্রকার আন্দোলনেকে বিনষ্ট করা, যার সহজ লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠে ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন। এই পর্বে বাঙালি হিন্দুদের প্রতি রাজাকার এবং পশ্চিম পাকিস্থানি সেনা বাহিনীর অকথ্য নির্যাতনের বিবরণ পাওয়া যায়, যা হিন্দু উদ্বাস্তু মানুষের পূর্ব পাকিস্থান ছেড়ে আসার ঘটনাকে কয়েক গুন বাড়িয়ে দিয়ে ছিল।

পশ্চিম পাকিস্থানি সেনার বর্বরতার কারণে তৎকালীন পূর্বপাকিস্থানে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে শুরু করে। যার ফলস্বরূপ আত্মপ্রকাশ ঘটে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীর। অতঃপর ১৯৭১ সালে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে পরিচালিত ভারতীয় সেনার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্থান পশ্চিম পাকিস্থানের শাসন থেকে মুক্তি পায়। স্বাধীন এবং সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পর হিন্দুদের প্রতি সাম্প্রদায়িক অত্যাচার

তুলনামূলক ভাবে কম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দিকে উদ্বাস্তু প্রবাহও কমে আসতে দেখা যায়।

এরপর বাঙ্গালীদের জন্য নতুন দেশ গঠন হওয়া সত্ত্বেও, দেশটিতে ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতা ও মৌলবাদী সংস্কৃতির উত্থানের কারণে ভারত অভিমুখে সংখ্যা লঘু হিন্দুদের গমন কখনোই সম্পূর্ণ থেমে যায় নি। দেশভাগের ফলে ভারত ও পাকিস্থান মিলিয়ে প্রায় দুই কোটি মানুষ বাস্তহারা হয়ে পড়েন।[৫২]

১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্থানের সামরিক শাসনের আবহে হিন্দু সম্প্রদায় ক্রমাগত রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত হতে থাকে।নমঃশূদ্র জাতি ক্ষেত্রে এর অন্যথা ছিল না। ১৯৫০ সালে যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের পাকিস্থান ত্যাগ করার পর, সেখানে তপশিলি জতি চেতনা তথা জাতি রাজনীতির সকল সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন সময় গণতান্ত্রিক শাসন শুরু করার প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। ১৯৫৪ সাল বা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল পশ্চিম পাকিস্থানি শাসকদের মনোপুত না হওয়ায়, তাঁরা সামরিক শাসনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখেন।

অপরদিকে পূর্ব পাকিস্থানের হিন্দু এবং বিরোধী কণ্ঠ রোধ করার উপায় হিসেবে নির্যাতন ও হত্যালীলা সংগঠিত করতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে নমঃশূদ্র জতির কিছু মানুষ দেশ ত্যাগ বা ধর্ম ত্যাগের মধ্য দিয়ে নিজেদের রক্ষা করে। অবশিষ্ট অংশ জাতি চেতনা থেকে সরে গিয়ে হিন্দু অথবা মতুয়া ধর্মের শরণাপন্ন হয়ে পড়েন।

৫.২.৩ মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু হিসেবে তপশিলি তথা নমঃশূদ্র জাতির চেতনার বিবর্তন (১৯৭১- ২০২১)

মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্থানের শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কয়েক বছর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার

সূত্রপাত হলেও, ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসনের উত্থান হতে দেখা যায়। এই বিষয়টি একদিকে একনায়কতন্ত্র অপর দিকে ধর্মীয় গোঁড়ামি বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়ে উঠে ছিল। এই পরিস্থিতিতে নমঃশূদ্র জতির মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিথিতে মতুয়া সঙ্ঘ তাঁদের একত্রিত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছিল। অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক সমালোচনা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রাষ্ট্র প্রধানদের দিক থেকে মতুয়া সঙ্ঘের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করার প্রয়াস দেখান।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থা চালু হয়। শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী (১৯৭১-১৯৭৫) এর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময় শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ১১ই এপ্রিল ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংবিধান গৃহীত হয় এবং একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর অর্থাৎ বাংলাদেশের বিজয় দিবসের প্রথম বার্ষিকী হতে এটি কার্যকর হয়।

বাংলাদেশের 'জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২' এর নিয়ম অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৫৩] এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ছাড়াও ন্যাশনাল সোসালিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রভৃতি ১৪টি দল অংশগ্রহণ করে ছিল। নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ছিল।[৫৪] শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী (১৯৭১-১৯৭৫)।এই নির্বাচনে ১৩ জন বিজয়ী সংখ্যালঘু প্রার্থীর মধ্যে ১২ জন ছিলেন আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী উত্থাপন করেন। এই সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে প্রচলিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাতিল করে,

রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়।[৫৫] সংসদে উত্থাপনের মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে এই বিল সংসদে পাশ হয়। এই ব্যবস্থাকে বাকশাল ব্যবস্থা বলা হয়। এটি ছিল রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা। ১৯৭৫ সালের শুরুতে মুজিব দেশে বাকশাল ব্যবস্থার অধীনে একদলীয় শাসন চালু করেন। মুজিবকে আজীবন রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয় এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সেনা বাহিনীর কিয়দংশের ষড়যন্ত্রে সংঘটিত সেনা অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন।

মুজিবের মৃত্যু বাংলাদেশকে আবার রাজনৈতিক সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। সেনা অভ্যুত্থানের নেতারা অল্প দিনের মধ্যেই উচ্ছেদ হয়ে যান এবং অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান আর রাজনৈতিক হত্যা কাণ্ডে দেশ অচল হয়ে পড়ে। শেখ মুজিবের নিধনের পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন খন্দকার মোস্তাক আহমেদ (১৫ই আগস্ট ১৯৭৫-৫ নভেম্বর, ১৯৭৫)। ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর আরেকটি সেনা অভ্যুত্থানের মধ্যেদিয়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা আসীন হন এবং রাষ্ট্রপতির দ্বারা সামরিক আইন চালু করেন। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সর্বমোট ১০ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে জিয়াউর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন।

১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদীয় নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। এই নির্বাচনে মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩৩০টি এর মধ্যে জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশ জাতীয় দল (বিএনপি) ২৩৭টি (এর মধ্যে মহিলাদের জন্য ত্রিশটি আসন সংরক্ষিত ছিল) আসন, আওয়ামী লীগ ৪০টি আসন, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ২০টি আসন এবং অন্যান্য দল বাকি ৩৩টি আসনে জয়লাভ করে।[৫৬] সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। এ নির্বাচনে সর্বমোট ৮ জন (২.৪২%) সংখ্যালঘু সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

দেশের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা দখল করার পর, তিনি ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংবিধান সংশোধন করেন। এই সংশোধনে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি বাতিল করে, সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানি রহিম' কথাটি যুক্ত করা হয়। পরবর্তী কালে ২০১০ সালে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টে সংবিধানের এই পঞ্চম সংশোধন বাতিল করা হয়।

১৯৮১ সালের ৩০শে মে গভীর রাতে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান নিহত হন। তিনি নিহত হওয়ার পর বিএনপি নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার ১৯৮২ সালের ২৩ পর্যন্ত শাসনভার পরিচালনা করেন। ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ সেনাপ্রধান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক শাসন জারি করেন। আন্তর্জাতিক চাপে শেষ পর্যন্ত ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের তৃতীয় সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮৬ এর নির্বাচনে সেনাপ্রধান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পার্টি নামক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচনে এরশাদের দল ১৮৩টি, আওয়ামী লীগ ৭৬টি, জামাতে ইসলামী ১০টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ৫টি আসনে জয়লাভ করে ছিল। বিএনপি দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। নির্বাচনটিতে মোট সাত জন সংখ্যালঘু প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন। নির্বাচনের পর এরশাদের জাতীয় দল ভোট কারচুপি এবং জালিয়াতির অভিযোগে আরোপিত হয়। এর প্রতিবাদে বাংলাদেশের বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ স্বৈরাচারী সরকারের পতনের উদ্দেশ্যে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। ফলস্বরুপ বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অসহিষ্ণুতার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে ছিল। এমত

পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি এরশাদ ১৯৮৭ সালের ২৭শে নভেম্বর দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন।

এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য তিনি ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের চতুর্থ সংসদীয় নির্বাচন ঘোষণা করেন। তিনি সংখ্যাগুরু মুসলিম জনতাকে পাশে পাওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৮৮ সালে অষ্টম সংবিধান সংশোধনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। অতঃপর সেনা বাহিনীর সমর্থনের অভাব এবং গণ বিক্ষোভেরে কারণে, ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি ১৪০টি, আওয়ামী লীগ ৮৮টি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ১৮টি, জাতীয় দল ৩৫টি এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ৫টি আসনে জয়লাভ করে ছিল। বাংলাদেশ জামাতে ইসলামী দল তাদের ১৮টি আসন নিয়ে বিএনপির সঙ্গে যুক্ত হয়।[৫৭] এই নির্বাচনের পরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্ত্রী, বেগম খালেদা জিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত্রী হিসাবে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

১৯৯২ সালের প্রথম থেকে বিএনপির সহযোগী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলাম দলের প্রধান গোলাম আজাদের বিচারের দাবিতে আওয়ামী লীগের আন্দোলন শুরু হয়। গোলাম আজম ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী নেতা। গোলাম আজম এবং আরো ২৪ জন নাগরিকের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধকালীন দেশদ্রোহিতা মামলা করা হয়। এ বিষয়টি কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তাল হতে থাকে।

অপরদিকে ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারতে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা ঘটলে, বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর উন্মত্ত জনতা দেশজুড়ে হিন্দুদের মন্দির, দোকান এবং বাড়িতে আক্রমণ করে এবং অগ্নিসংযোগ

করে। এই দাঙ্গায় হিন্দুদের ২৮ হাজার বাড়ি, ২৭০০ দোকান, ৩৬০০ মন্দির ভাঙচুর করা হয়, ১২ হিন্দু নিহত হয়, আহতের সংখ্যা ছিল ২০০০ এছাড়া ২০০০ মহিলার শ্লীলতাহানি করা হয়।[৫৮]

একদিকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার প্রসূত আন্তর্জাতিক চাপ। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধা অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে ১৯৯৪ সালের ২রা ডিসেম্বর সংসদের বিরোধী দলের ১৪৭ জন পদত্যাগ করেন। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে নির্বাচন কমিশন ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ষষ্ঠ নির্বাচন ঘোষণা করে। এই ষষ্ঠ নির্বাচনকে আওয়ামীলীগ এবং অন্যান্য বিরোধী দল বয়কট করে। আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচন বয়কট করে ১৪ই এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারি ৪৮ ঘন্টা বন্ধের ডাক দেন। ষষ্ঠ নির্বাচন অসফল হওয়ার পর পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার জুলাই মাসে বাংলাদেশের সপ্তম সংসদীয় নির্বাচন ঘোষণা করেন।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩৭.৪৪ শতাংশ ভোট পেয়ে, ১৪৬টি, বিএনপি ৩৩.৬০ শতাংশ ভোট পেয়ে ১১৬টি, জাতীয় পার্টি ১৬.৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে ৩২টি, বাংলাদেশ জামাতী ইসলামী দল ৮.৬১ শতাংশ ভোট পেয়ে ৩টি আসনে জয় লাভ করে।[৫৯] এই নির্বাচনে ১১ জন সংখ্যালঘু প্রার্থী জয়লাভ করেন। শেখ হাসিনা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত্রী হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগের ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের স্তরে ১৯৯১ সালের তুলনায় কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

১৯৯১ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলা হয়ে ছিল। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ইস্তারে ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি থেকে সরে আসতে দেখা যায়। এই নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে হ্বজের পোশাক পড়ে অথবা নামাজরত অবস্থায় নির্বাচনের পোস্টার দিয়ে নির্বাচনী প্রচার করতে দেখা যায়।[৬০]

২০০১ সালে বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি (নাজিউর রহমান মঞ্জু) ও ইসলামী ঐক্যজোট তৈরি করে নির্বাচনে নামে। এই অষ্টম সংসদীয় নির্বাচনে বিএনপি ৪০.৯১ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৯৩টি, আওয়ামী লীগ ৪০.১৩ শতাংশ ভোট পেয়ে ৬২টি, এছাড়া ইসলামী জাতীয় ঐক্যফন্ট ১৪টি এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলাম ১৭টি আসনে জয়লাভ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত্রী হিসেবে খালেদা জিয়া ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ পর্যন্ত পুনরায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

তাঁর শাসন পর্বে বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, নাটোর, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, ফেনী, ঝিনাইদহ, লালমনিরহাট, গোপালগঞ্জ, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর প্রভৃতি হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে বিএনপি এবং তার সহযোগী কর্মীদের নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাসের বিবরণ পাওয়া যায়।[৬১]

২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোটের সরকারের মেয়াদ শেষ হয়। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ সংসদীয় নির্বাচন পিছিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের নবম সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আসনে জয়লাভ করে। ২০০৮ সালের নবম সংসদীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৪৯.০ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৩০টি আসনে, বিএনপি ৩৩ শতাংশ ভোট পেয়ে ৩০টি আসন লাভ করেন। শেখ হাসিনা সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেত্রী হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৭২.১৪ ১৪ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৩৪টি আসনে জয় লাভ করে, জাতীয় পার্টি ৭.৩৩ শতাংশ ভোট পেয়ে ৩৪

আসনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়। ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩৫০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ৩০১টি, জাতীয় পার্টির ২৬টি আসন, বিএনপি ৭টি আসনে জয় লাভ করে। শেষ দুইটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ভোট কারচুপি অভিযোগ উঠে এসেছে।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে দেখা যায় যে, হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা সঙ্কট জনক ভাবে কমে গিয়েছিল। ফলত তাঁরা সংখ্যালঘু শ্রেণিতে পরিণত হয়। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে নমঃশূদ্র জাতি চেতনার অবলম্বন হয়ে উঠে ছিল বাংলাদেশের মতুয়া সঙ্ঘ। ১৯৪৭ পরবর্তী বাংলাদেশে মতুয়া নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুধন্য ঠাকুর, শচীপতি ঠাকুর, অংশুপতি প্রসন্ন ঠাকুর, পদ্মনাভ ঠাকুর, হিমাংশুপতি ঠাকুর, সুব্রত ঠাকুর প্রভৃতি। এছাড়া ছিল বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ (১৯৮৮) এর মতো সংগঠন।

এই সকল সংগঠনের মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘু জাতির সামাজিক অবস্থান সুরক্ষিত করা হয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৯২ সালে ৮ই জুন ঢাকা মতুয়া প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদাজিয়া।[৬২] এর পর থেকে প্রতি বছর ঢাকা মতুয়া প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া ছিল বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ (১৯৮৮) এর মতো সংগঠন নিরন্তর সংখ্যা লঘু মানুষের সামাজিক ঊর্ধ্ব গমনে সহায়তা প্রদান করে চলেছে।

৫.৩ সিদ্ধান্ত উপসংহার এবং প্রশ্ন উত্থাপন

১৯৪৭ থেকেই নবগঠিত পাকিস্তান ছিল বিদ্বেষ মূলক পরিমণ্ডলে আবিষ্ট। দেশটিতে গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো সর্বোপরি

সদিচ্ছার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর অন্যতম কারণ ছিল রাজনৈতিক পরিসরে পশ্চিম পাকিস্থানের সামরিক এবং বেসামরিক আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য।

এই প্রাধান্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি তাঁদের কর্তৃত্ব শেষ পর্যন্ত একে একটি উপনিবেশে পরিণত করে ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বিদ্বেষপূর্ণ সাম্প্রদায়িক জাতি তত্ত্ব আরোপ করা হয়ে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের উপর। এই কর্তৃত্ব উর্দু ভাষা সংস্কৃতি এবং মুসলিম মৌলবাদ আরোপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। যে কারণে পাকিস্তানের গণতন্ত্র বারবার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। এর পাশাপাশি ধর্মীয় মৌলবাদ জন্ম দিয়েছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি বিদ্বেষ প্রসূত দাঙ্গা এবং নির্যাতনের।

১৯৪৭ এর দেশভাগের পর থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসনামলে তৎকালীন বঙ্গের পূর্ব অংশ পাকিস্তানি আমলাতান্ত্রিক এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অধীনে থাকতে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতি গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদকে স্বীকার করেনি। যা গণতন্ত্রকে বিনষ্ট করার পাশাপাশি ধর্মীয় বৈচিত্র্যকেও ধ্বংস করার প্রয়াসে ব্রতী হয়ে ছিল। ফলস্বরূপ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদের শিকার হয়। বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে হিন্দুরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের মধ্যে নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্বে পূর্ব পাকিস্থানের অপর ঔপনিবেশিকতা বজায় রাখার জন্য পাকিস্থান, সকল বিরোধী শক্তিকে শেষ করতে উদ্যত হয়ে ছিল। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য হিন্দু এবং বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের নির্যাতন ও হত্যা চলতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে নমঃশূদ্র জতির কিছু মানুষ দেশ ত্যাগ বা ধর্ম ত্যাগের মধ্য দিয়ে নিজেদের রক্ষা করে। অবশিষ্ট অংশ জাতি চেতনা থেকে সরে গিয়ে হিন্দু অথবা মতুয়া ধর্মের শরণাপন্ন হয়ে পড়েন।

এ ক্ষেত্রে মতুয়া ধর্মের সামাজিক ঊর্ধ্বগামিতার প্রক্রিয়া তাঁদের সামাজিক এবং মানসিক অবদমিতার থেকে মুক্ত করে। এই সামাজিক অগ্রগামীতা তাঁদের অবদমিত বা দলিত জনগোষ্ঠীর পরিচিতি থেকে হিন্দু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ হিসেবে তুলে ধরে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সূত্রপাত হয়। কিন্তু ১৯৭৪ সালে চতুর্থ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শেখ মজিবর রহমানের একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পুনরায় গণতান্ত্রিক সংকট শুরু হয়। এরপর জিয়াউর রহমান এবং হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বাঁধা প্রাপ্ত হয়। ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপস্থাপন প্রক্রিয়া শুরু হলেও ধর্মীয় মৌলবাদ এবং তার অনুঘটক হিসেবে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় অন্তর্গত নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য তাপশীল জাতি ধর্মীয় সন্ত্রাসের শিকার হতে থাকেন।

অপরদিকে আওয়ামী লীগ ১৯৯১ সালের নির্বাচনি ইস্তাহারে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সমান অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিলেও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের ইস্তাহারে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি কোন রকম প্রতিশ্রুতি (Agenda) উত্থাপন করেনি। বরঞ্চ নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনারা নামাজ পড়ারত পোস্টার নির্বাচনের প্রচারে ব্যবহার করা হয়ে ছিল। এই বিষয়টি থেকে বাংলাদেশের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা উদাহরণ উঠে আসে। যদিও আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর বিভিন্ন শীর্ষ পর্যায়ের অধিকারী হিসেবে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ নিয়োজিত হতে দেখা যায়।

২০০১ সালে চার দলীয় ঐক্য জোটের উপর ভরসা করে বিএনপি পুনরায় সরকার করতে সক্ষম হয়। বিএনপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বিভিন্ন অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের ঘটনা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। ২০০৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ

ক্ষমতায় আসলে এই পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হলেও সংখ্যালঘুদের প্রতি নির্যাতনের ঘটনা বন্ধ হয়নি। ২০০৮ এবং তারপর থেকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপহাস হয়ে উঠেছে। এই সকল নির্বাচনে মূল বিরোধী দলনেত্রী জেলবন্দী অবস্থায় এবং বিএনপি পার্টি নির্বাচন ব্যবস্থার বাইরে থেকে যায়। যা বাংলাদেশকে পুনঃরায় গণতান্ত্রিক ছলনার আড়ালে একনায়কতন্ত্রি রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।

১৯৪৭ সাল পরবর্তী সময় থেকে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে পারস্পরিক অসম্প্রীতি দুই দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন করেছে। এই পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ফলে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশ হিসেবে নমঃশূদ্র জাতির মানুষ মৌলবাদী সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে।

১৯৪৬ সালের দাঙ্গা থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের অপারেশন সার্চলাইট পর্যন্ত সময় পর্বে, বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে নির্যাতন পরিলক্ষিত হয়েছে। তার একটি বৃহৎ অংশ ছিল নমঃশূদ্র জাতির মানুষ। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশও এই নির্যাতন থেমে যায়নি। কখনো হযরতবাল, বাবরি মসজিদ, গোধরা কান্ড কখনো নির্বাচন পরবর্তী প্রতিশোধ বা কখনো শুধু মাত্র গুজবের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের হিন্দু তথা নমঃশূদ্র অধ্যুষিত এলাকাগুলো হয়ে উঠেছে ধর্মীয় মৌলবাদীদের বধ্যভূমি।

এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘু মানুষের ক্রমঃহ্রাসমান জনসংখ্যার মধ্য দিয়ে। ১৯৪১ সালের আদমশুমারির পরিসংখ্যান অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২৮ শতাংশ। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারির পরিসংখ্যানে তা ছিল ১৩.৫০ শতাংশ এবং ২০২২ সালে বাংলাদেশের হিন্দু জনসংখ্যা ৭.৯৪ শতাংশে নেমে আসে।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ:

১. Statelessness: A stateless person is defined as someone who is "not considered as a national by any State under the operation of its law," 1 and is thus someone without any nationality or citizenship anywhere. 2. Addressing statelessness is a foundational and integral part of UN efforts to strengthen the rule of law.

২. Rup Kumar Barman: Migration, State Policies and Citizenship: A Historical Study on India, Bangladesh and Bhutan, (New Delhi, New Delhi, Aayu Publications, 2021), পৃ. ১৯৭।

৩. সুভাষ বিশ্বাস: দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা: প্রসঙ্গ নদিয়া জেলা, (কলকাতা, সোম পাবলিশিং, ২০১৬), পৃ. ১৪।

৪. তদেব পৃ. ১৪।

৫. ধনঞ্জয় দাশ: আমার জন্মভূমি- স্মৃতিময় বাংলাদেশ, (কলকাতা, মুক্তধারা, ১৯৫৮), পৃ. ২৩।

৬. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০২০।

৭. বাংলাদেশের আদমশুমারি, ২০২২।

৮. আহম্মেদ শরীফ: বাংলাদেশ নির্বাচন ও গনতান্ত্র, (ঢাকা, আনন্যা, ২০১৭) পৃ. ২১।

৯. অমলেন্দু দে: স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা প্রয়াস ও পরিণতি,(কলকাতা, রত্না প্রকাশন, ১৯৭৫), পৃ. ৫৫।

১০. অর্পিতা বসু: উদ্বাস্তু আন্দোলন ও পুনর্বাসিত সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় (কলকাতা, গাংচিল, ২০১৩) পৃ. ১১।

১১. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

১২. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: প্রান্তিক মানব, (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৯), পৃ. ১৭।

১৩. কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর: বাংলার নমঃশূদ্র, (কলকাতা, কে.এন.টি.এ.এ., ২০২১), পৃ. ২৫।

১৪. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

১৫. তদেব, পৃ. ১৮।

১৬. বাবুল কুমার পাল: বরিশাল থেকে দন্ডকারণ্য: পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ইতিহাস, (কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০১০), পৃ.৬৫।

১৭. আশিস হীরা (সম্পা): দেশভাগের নিম্ন বর্ণ, (কলকাতা, গাংচিল, ২০২০), পৃ. ২৬।

১৮. তদেব, পৃ. ২৬।

১৯. জগদীশ চন্দ্র মন্ডল: মহাপ্রাণ যোগেন্দ্র নাথ, চতুর্থ খন্ড, (কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ২০০৪), পৃ. ২০৬।

২০. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ২১-৩৬।

২১. জগদীশ চন্দ্র মন্ডল: প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।

২২. তদেব, পৃ.পৃ. ২০৫-২১৯।

২৩. তদেব, পৃ. ২০৯।

২৪. প্রফুল্ল চক্রবর্তী: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠ.২৯।

২৫. তদেব, পৃ. ১৮।

২৬. আনসার বাহিনী: ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের পর ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা বাহিনীর কিছু সদস্য, যারা পরবর্তীতে পাকিস্তানের নাগরিক হয়, তাদের নিয়ে আনসার বাহিনী তৈরি হয়। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান আনসার আইন দ্বারা আনসার বাহিনী পূর্ব পাকিস্তান আনসার হিসাবে গঠিতহয়। ১৯৪৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি এই বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

২৭. বাবুল কুমার পাল: প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

২৮. তদেব, পৃ. ৬১।

২৯. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩।

৩০. আশিস হীরা (সম্পা): প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

৩১. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৩২. জগদীশ চন্দ্র মন্ডল: প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ১৭২-২২০।

৩৩. তদেব, পৃ. ২২০।

৩৪. বাবুল কুমার পাল: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

৩৫. Rup Kumar Barman: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৩৬. ধনঞ্জয় দাশ: প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

৩৭. আহম্মেদ শরীফ: প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

৩৮. তদেব, পৃ. ৫৪।

৩৯. বাবুল কুমার পাল: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

৪০. আশিস হীরা (সম্পা): প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

৪১. মনোশান্ত বিশ্বাস: বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি, (কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৬), পৃ. ২৭৫।

৪২. বাবুল কুমার পাল: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

৪৩. তদেব, পৃ. ৬৫।

৪৪. আহম্মেদ শরীফ: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৪৫. কিশোর বিশ্বাস: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

৪৬. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৪৭. আহম্মেদ শরীফ: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

৪৮. তদেব, পৃ ৬৯।

৪৯. তদেব, পৃ. ৬৯।

৫০. তদেব, পৃ. ৭১।

৫১. অপারেশন সার্চলাইট: অপারেশন সার্চলাইট ছিল পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি পরিকল্পিত সামরিক অভিযান। এটি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে চালু করা হয়ে ছিল। যখন হাজার হাজার পাকিস্তানি সেনা, ট্যাঙ্ক এবং আর্টিলারি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান শহর ও শহরগুলিতে মোতায়েন করা হয়ে ছিল। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল

ইয়াহিয়া খান এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল টিক্কা খানের নির্দেশে এই অভিযান পরিচালিত হয়ে ছিল।

৫২. পপুলেশন রিডিসস্ট্রিবিউশন এন্ড ডেভলপমেন্ট ইন সাউথ এশিয়া।

৫৩. আহম্মেদ শরীফ: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৫৪. People's Republic of Bangladesh, Date of Elections: March 7, 1973, পৃ. ৩৪।

৫৫. আহম্মেদ শরীফ: প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

৫৬. People's Republic of Bangladesh, Date of Elections: 18 February 1979, পৃ. ৫২।

৫৭. People's Republic of Bangladesh, Date of Elections: 27 February, 1991।

৫৮. Salam Azad (Edited): Atrocities on the Minorities in Bangladesh, (Dhaka, Amity for peace, 2003) পৃ. ৯।

৫৯. তদেব, পৃ. ৯।

৬০. আহম্মেদ শরীফ: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

৬১. Salam Azad: প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ১৩-৪২।

৬২. মতুয়া দর্পণ, (ঢাকা, জাতীয় মতুয়া প্রতিনিধি সম্মেলন, ১৯৯২)।

উপসংহার:

ভারতীয় উপমহাদেশে বর্ণ ও জাতি ভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থার ইতিহাস সুপ্রাচীন। এই বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থার বহুল ব্যবহার হিন্দু সমাজ ব্যবস্থাকে জটিল এবং সংকটাপন্ন করে তুলেছে। এই ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে সমাজের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী তাঁদের নিজদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার থেকে সুরক্ষিত রাখার উপায় হিসেবে, সমাজের অপর একটি অংশকে মূলত শিক্ষা, অর্থ, ধর্ম, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভাবে বঞ্চিত করে রাখেন। এর ফলস্বরূপ ভারতের অনেক জাতি এই সমাজ ব্যবস্থায় আর্থিক এবং সামাজিক সম্মানের ক্ষেত্রে নিম্নতম সরণিতে পতিত হয়ে পড়েছিল। এই সকল জাতির মধ্যে বাংলার নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পৌণ্ড্র, বাগদি, মালো প্রভৃতি অন্যতম।

উনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক শাসকের উদ্যোগে বর্ণ ও জাতি ভেদের বিষয়টি সামাজিক ন্যায়বিচার ও যুক্তিবাদের আলোকে আলোচিত হতে শুরু করে ছিল। এই আলোচনায় জাতির ভিত্তিতে কর্ম বিভাজনের ফলে গড়ে ওঠা সামাজিক অসাম্য ও অন্যায়ের প্রেক্ষাপট উদ্ভাসিত হয়। এর পাশাপাশি ব্রিটিশ আধিপত্যে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের ধারনা গড়ে ওঠার ফলে, এই অবদমিত জাতি গুলির মধ্যে চেতনার উন্মেষের সূচনা হয়। বিষয়টিকে অবলম্বন করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটতে দেখা যায়। এই সকল জাতি আন্দোলনের ইতিহাসে বাংলার নমঃশূদ্র জাতির অংশীদারিত্ব স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে।

বঙ্গপ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের নদীনালা বিধৌত ক্ষেত্রটি নমঃশূদ্র জাতির মূল আবাস ভূমি ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও রাজনৈতিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে, নমঃশূদ্র জাতি চেতনার বিকাশের সহ ঘটনা হিসেবে সামাজিক তথা

রাজনৈতিক উত্থান পরিলক্ষিত হয়। এই ঘটনাটি বাংলার সকল জাতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা হিসেবে পরিচিত হয়ে রয়েছে।

১৯৪৭ পরবর্তী বাংলা বিভাজনের ফলে নমঃশূদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলটি পূর্ব-পাকিস্তানের অংশে রয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মত নমঃশূদ্র জাতিটি বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে ছিল। এমত পরিস্থিতিতে তাঁদের একটি অংশ বাস্তুচ্যুত হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর পূর্ব ভারতের আসাম, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। অবশিষ্ট অংশটি পূর্ব পাকিস্তানেই থেকে যায়।

আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে পশ্চিম বঙ্গ, পূর্ব বঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশ এবং উত্তর পূর্ব ভারতের আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য, এই তিনটি অঞ্চলে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বে নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস লেখা হয়েছে। আলোচনা ও নিরীক্ষিণের পরিপ্রেক্ষিতে, এই তিনটি অঞ্চলে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা ও সামাজিক অবস্থানের মধ্যে ভিন্ন প্রেক্ষিত উঠে এসেছে। বর্তমান গবেষণা পত্রটির বিভিন্ন অধ্যায়ে এই প্রেক্ষিত সমূহকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রথম ক্ষেত্র হিসেবে বাংলা বিভাজন (১৯৪৭) পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে নমঃশূদ্র জাতি চেতনা ও সামাজিক অবস্থানে কয়েকটি বিষয় উঠে এসেছে। যেমন উদবাস্তুতার প্রাথমিক অবস্থা সামলে নেওয়ার পর, এই জনগোষ্ঠীর মানুষ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করে ছিলেন। এই বসতি সমূহের গঠন (Structure) অনুধাবন করলে, তাঁদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে বসবাস করার ধারা পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের এই ধারা বা প্রবণতা রাজ্যের বিভিন্ন জেলার জনবিন্যাস এবং রাজনৈতিক সমীকরণ পরিবর্তন করে দিয়েছে।

নমঃশূদ্র জাতির এই সঙ্গবদ্ধতা বা রাজনৈতিক ঐক্য গঠনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মতুয়া ধর্মের কিছু নীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ তাঁদের সাংগঠনিক

পরিকাঠামো গঠনের ইতিহাসের সঙ্গে মতুয়া ধর্ম তথা মতুয়া সংগঠন অঙ্গাঙ্গিক ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। এই বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে মতুয়া মহাসঙ্ঘকে নমঃশূদ্র জাতির স্বঘোষিত অভিভাবক রূপে তুলে ধরে। যা একদিকে তাঁদের রাজনৈতিক স্বচেতনতার পরিমণ্ডলে উপবিষ্ট করে। অপরদিকে ঠাকুর বংশের পরবর্তী প্রজন্মকে পরিবার তন্ত্রের রাজনীতিতে আবিষ্ট হতে লালায়িত করে তোলে। এক্ষেত্রে পরিবার তন্ত্রকে গনতন্ত্রিক পরিকাঠামোর জন্য সংকট স্বরূপ দেখা হয়।

নমঃশূদ্র জাতিটি নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা সহ বেশ কয়েকটি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে, বিধানসভার ও লোকসভা নির্বাচনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভোট রাজনীতির সমীকরণ প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়ে উঠেছে। এই সক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গ সংসদীয় রাজনীতিতে, তাঁদেরকে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার করে তুলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে এই জনবিন্যাসগত পরিবর্তনের ফলে নমঃশূদ্র জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ভরকেন্দ্র তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হতে দেখা যায়। এই রাজ্যে গড়ে ওঠা নমঃশূদ্র জাতি চেতনা ও রাজনৈতিক সাযুজ্য, একদিকে তাঁদেরকে এনে দিয়েছে নাগরিক অধিকার, জাতি রাজনীতি চর্চা এবং প্রতর্কের অধিকার (The Right To Question)। অপরদিকে তাদেরকে করে তুলেছে, অন্যান্য স্থানে বসবাসকরি নমঃশূদ্র জাতির মানুষের অভিভাবক।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রের প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যে নমঃশূদ্র জাতির এক বৃহৎ অংশ বসবাস করেন। রাজ্য দুইটিতে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বাঙালি জনগোষ্ঠীর নৃতত্ত্বগত (Ethno Cultural) এবং ভাষা সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্বে, নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীকে জাতি সত্ত্বার পরিবর্তে ভাষা সত্ত্বা আরোপ করে তাঁদের করে তুলেছে, ‘বহিরাগত বাঙালি’।

ক্ষেত্রে হিসেবে আবার আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং বরাক উপত্যকায় দুইটি ভিন্ন প্রেক্ষিত উঠে আসতে দেখা যায়। একদিকে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ভূমিপুত্র বা খিলঞ্জীয়া আন্দোলনে নমঃশূদ্র জাতিটি নৃতত্ত্বগত (Ethno Cultural) এবং ভাষা সংস্কৃতিগত আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। অপরদিকে বরাক উপত্যকায় এই ভূমিপুত্র আন্দোলনের প্রবলতা অনেকটাই স্থিমিত। সেখানে বাংলা ভাষা সমমর্যাদায় স্বীকৃত হয়েছে।

অপরদিকে ত্রিপুরা রাজ্যে দেশভাগ পরবর্তী অভিবাসনের ফলে, এখানকার জনবিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে, বাঙালিরা হয়ে উঠেছে সংখ্যা গুরু। এই জনবিন্যাসগত পরিবর্তন ত্রিপুরার ভাষা সংস্কৃতিগত আন্দোলন তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের নৃতত্ত্বগত (Ethno Cultural) এবং ভাষা সংস্কৃতিগত সমস্যা উত্থানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমীকরণ (Political Agenda) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। এই সমীকরণকে উপলক্ষ করে দেখা যায় যে, ত্রিপুরার মতো অভিবাসিত বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলের ভাষা-নৃতাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে কোন জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলের সম্পাদ্য কার্যাবলী (Agenda) তৈরি হয় না। অপরদিকে আসামের ভাষা-নৃতত্ত্বগত বৈষম্যের কারণে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া ক্ষোভ ক্রমশ প্রাদেশিক রাজনীতির প্রাঙ্গন থেকে জাতীয় রাজনীতির সম্পাদ্য কার্যাবলী (Agenda) তে পরিণত হয়।

তৃতীয় প্রেক্ষিত হিসেবে ব্রিটিশ শাসন পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থানকারী নমঃশূদ্র জাতির অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের দীর্ঘকালীন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা নমঃশূদ্র জাতি চেতনাকে প্রান্তিকতার জায়গায় নিয়ে এসেছিল। এমতাবস্থায় একদা নমঃশূদ্র জাতির চেতনা উত্থানের ভিত্তি ভূমিতেই নমঃশূদ্র জাতি রাজনীতি অবলুপ্ত হয়েছে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্বে এবং পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে হিন্দু এবং তার অংশ হিসেবে নমঃশূদ্র জাতির মানুষ দেশ ত্যাগ বা ধর্ম ত্যাগের মধ্য দিয়ে অল্প সংখ্যক হয়ে পড়েছিল। এই সংখ্যার সল্পতা হিন্দু বর্ণবাদের চেতনাকে অনেকাংশে স্থিমিত করে দেয়। অপরদিকে অবশিষ্ট নমঃশূদ্র জাতির মানুষ মতুয়া বা হিন্দু ধর্মের শরণাপন্ন হয়ে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করে। এই প্রক্রিয়া বর্তমান বাংলাদেশে তাঁদের অবদমিত বা দলিত জনগোষ্ঠীর পরিচিতি থেকে হিন্দু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ হিসেবে তুলে ধরেছে।

সংযোজনী:

সংযোজনী: ১. ১৯৩৬ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে তপশিলি জাতি তালিকা।

ক্রমিক নং.	তপশিলি জাতির নাম	ক্রমিক নং.	তপশিলি জাতির নাম	ক্রমিক নং.	তপশিলি জাতির নাম	ক্রমিক নং.	তপশিলি জাতির নাম	ক্রমিক নং.	তপশিলি জাতির নাম	ক্রমিক নং.	তপশিলি জাতির নাম
১.	আগারিয়া	১৪.	ধেনুয়ার	২৭.	কাদার	৪০.	কোরা	৫৩.	মুসাহারা	৬৬.	বিনঝিয়া
২.	বাগদি	১৫.	ধোবা	২৮.	কান	৪১.	কোটাল	৫৪.	নাগেশিয়া	৬৭.	চামার
৩.	বাহেলিয়া	১৬.	দোসাদ	২৯.	কান্ধ	৪২.	লালবেগি	৫৫.	নমঃশূদ্র	৬৮.	জালিয়া কৈবর্ত
৪.	বাইটি	১৭.	ডোম	৩০.	কান্দরা	৪৩.	লোধা	৫৬.	নট	৬৯.	রাজয়ার
৫.	বাউরি	১৮.	দোয়াই	৩১.	কাওড়া	৪৪.	লোহার	৫৭.	নুনিয়া	৭০.	মুন্ডা
৬.	বেদিয়া	১৯.	গারো	৩২.	কাপুরিয়া	৪৫.	মাহাড়	৫৮.	ওরাও	৭১.	কোনয়ারা
৭.	বেলদার	২০.	ঘাসি	৩৩.	করেঙ্গা	৪৬.	মাহালী	৫৯.	পালিয়া	৭২.	ঝাল মালো বা মালো
৮.	বেরুয়া	২১.	গোনরি	৩৪.	কান্থা	৪৭.	মাল	৬০.	পান	৭৩.	তুরি
৯.	ভাটিয়া	২২.	হাডি	৩৫.	কাউর	৪৮.	মাল্লা	৬১.	পাসি	৭৪.	সাঁওতাল
১০.	ভুঁইমালি	২৩.	হাজং	৩৬.	খোড়িয়া	৪৯.	মালপাহাড়িয়া	৬২.	পাটনি	৭৫.	তিয়র
১১.	ভূঁইয়া	২৪.	হালালখোর	৩৭.	খটিক	৫০.	মেচ	৬৩.	পোদ	৭৬.	শুড়ি
১২.	ভূমিজ	২৫.	হাড়ি	৩৮.	কোচ	৫১.	মেথর	৬৪.	রাভা	-	-
১৩.	বিন্দ	২৬.	হো	৩৯.	কোনাই	৫২.	মুচি	৬৫.	রাজবংশী	-	-

সূত্র: The Gazette of India, 6th June, 1936, Part I; Rup Kumar Barman: *Caste, Politics, Casteism and Dalit Discourse: The Scheduled Castes of West Bengal'* (New Delhi, Abhijit Publications, 2020, p. 301.

সংযোজনী:২ পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতি তালিকা।

ক্রমিক নং	তপশিলি জাতির নাম	ক্রমিক নং	তপশিলি জাতির নাম	ক্রমিক নং	তপশিলি জাতির নাম	ক্রমিক নং	তপশিলি জাতির নাম	ক্রমিক নং	তপশিলি জাতির নাম
১.	বাগদি (BAGDI)	১৩.	চামার (CHAMAR)	২৫.	হালাখোর (HALAKHOR)	৩৭.	কাউর (KAUR)	৪৯.	লোহার (LOHAR)
২.	বাহেলিয়া (BAHELIA)	১৪.	চৌপাল (CHAUPAL	২৬.	হাড়ি (HARI)	৩৮.	কেওট (KEOT)	৫০.	মাহার (MAHAR))
৩.	বাইতি (BAITI)	১৫.	দাবগার (DABGAR)	২৭.	জালিয়া কৈবর্ত (JALIA KAIBARTTA)	৩৯.	খাইরা (KHAIRA)	৫১.	মাল (MAL
৪.	বান্তর (BANTAR)	১৬.	দামাই (নেপালি) (DAMAI)	২৮.	মালো, ঝালো মালো	৪০.	খাটিক (KHATIK)	৫২.	মাল্লা (MALLAH)
৫.	বাউড়ি (BAURI)	১৭.	ধোবা (DHOBA)	২৯.	কাদার (KADAR)	৪১.	কোচ (KOCH)	৫৩.	মুসাহার (MUSAHAR)
৬.	বেলদার (BELDAR	১৮.	দোআই (DHOAI)	৩০.	কামি (নেপালি) (KAMI)	৪২.	কোনাই (KONAI)	৫৪.	নমঃশূদ্র (NAMASUDRA)
৭.	ভোগতা (BHOGTA	১৯.	ডোম (DOM)	৩১.	কাঁদরা (KANDRA	৪৩.	কোনওয়ার (KONWAR)	৫৫.	নট (NAT)
৮.	ভুইমালি (BHUMAL)	২০.	দোসাধ (DOSADH)	৩২.	ডাঞ্জার (DANJAR)	৪৪.	কোটাল (KOTAL)	৫৬.	নুনিয়া (NUNIYA)
৯.	ভূইয়া (BHUIYA)	২১.	ঘাসি (GHASI)	৩৩.	কাওড়া, (KAORA)	৪৫.	কুরারিয়ার (KURARIAR)	৫৭.	পালিয়া (PALIYA)
১০.	বিন্দ (BIND)	২২.	গোনরী (GONRH)	৩৪.	ধরি (DHARI)	৪৬.	লালবেগী (LALBEGI)	৫৮.	প্যান (PAN)
১১.	পাসি (PASI)	২৩.	পোদ/পৌন্ড্র (POD/POUNDRA)	৩৫.	রাজওয়ার (RAJWAR)	৪৭.	শুঁড়ি (সাহা বাদে) (SUNRI)	৫৯.	চাই (CHAI)
১২.	পাটনি (PATNI)	২৪.	রাজবংশী (RAJBANSHI)	৩৬.	সরকি (নেপালি) (SARKI)	৪৮.	তিয়ার (TIYAR)	৬০.	তূরী (TURI)

সূত্র: The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2016 No. 24 of 2016 [6th May, 2016.]; Rup Kumar Barman: *Caste, Politics, Casteism and Dalit Discourse: The Scheduled Castes of West Bengal'* (New Delhi, Abhijit Publications, 2020, p. 302.

সংযোজনী: ৩. নমঃশূদ্র জাতির বিভিন্ন উপবিভাজন।

ক্রমিক নং	নাম
১.	বউড়া
২.	ধানী
৩.	শেফালী
৪.	জিরনী
৫.	মৌগ্‌গা
৬.	নুনিয়া
৭.	কাঁড়ার
৮.	চাঁইয়া

সূত্র: বিপুল কুমার রায়, নমঃশূদ্রদের ইতিহাস, ঢাকা, মুক্তচিন্তা, ২০১৬, পৃ. ৬৪।

সংযোজনী: ৪. ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্থান থেকে ভারতে আসা উদ্বাস্তুদের দেওয়া বর্ডার স্লিপ।

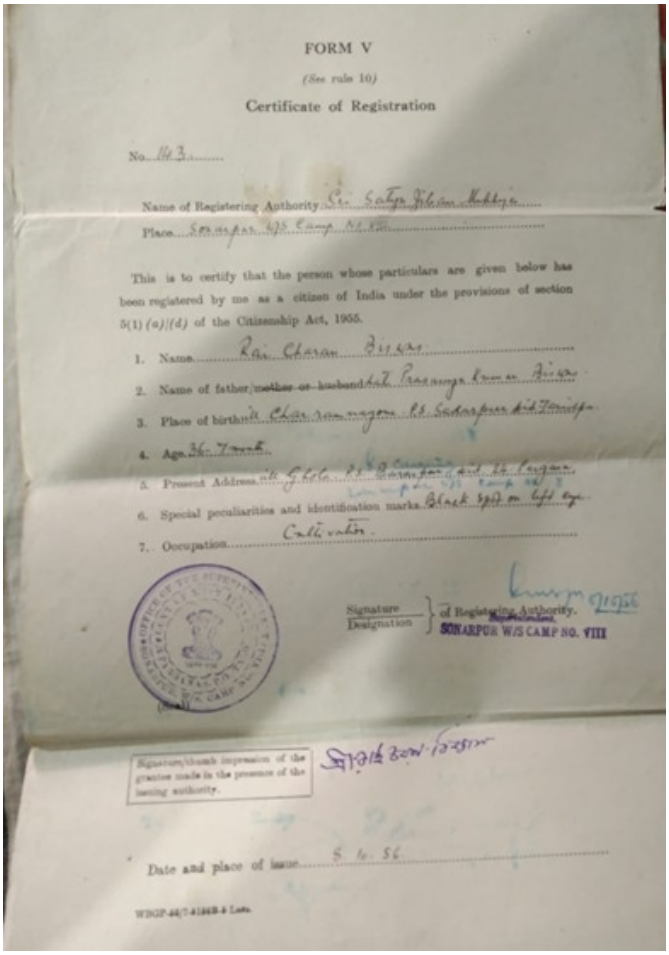

FORM V

(See rule 10)

Certificate of Registration

No. 143

Name of Registering Authority Sri Satya Jiban Mukherjee

Place Sonarpur W/S Camp No. VIII

This is to certify that the person whose particulars are given below has been registered by me as a citizen of India under the provisions of section 5(1)(a)/(d) of the Citizenship Act, 1955.

1. Name Rai Charan Biswas
2. Name of father/~~mother or husband~~ Lt. Prasanna Kumar Biswas
3. Place of birth Char ramnagar P.S. Sadarpur dist Faridpur
4. Age 36 7 month
5. Present Address
6. Special peculiarities and identification marks Black spot on left eye
7. Occupation Cultivation

Signature / Designation } of Registering Authority.

SONARPUR W/S CAMP NO. VIII

(Seal)

Signature/thumb impression of the grantee made in the presence of the issuing authority.

Date and place of issue 5. 6. 56

WBGP-46/7-41 [illegible]

সূত্র: গবেষকের সংগ্রহ, নাদিয়া, ২০২০।

সংযোজনী: ৫. অল ইন্ডিয়া নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদের লিফলেট।

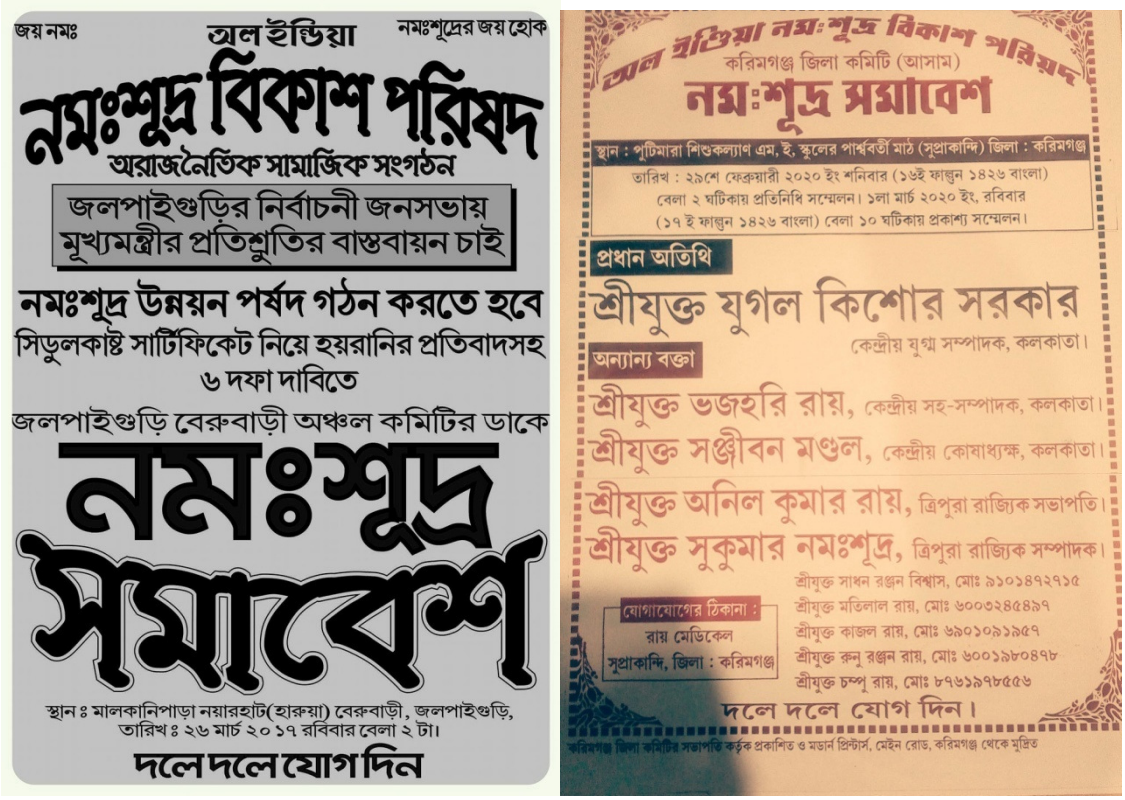

সূত্র: গবেষকের সংগ্রহ, ২০১৭ ও ২০২০।

সংযোজনী: ৬. মতুয়া ধর্মের প্রতীক এবং মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের ছবি।

সূত্র: গবেষকের সংগ্রহ, ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, ২০১৮।

সংযোজনী: ৭. মতুয়া ও নমঃশূদ্র জাতির চেতনা প্রসারের বিভান্ন কার্যক্রম।

সূত্র: গবেষকের সংগ্রহ।

সংযোজনী: ৮.আসাম আকর্ড স্বাক্ষরের ছবি।

সুত্র: The Hindu Photo Archive.

সংযোজনী: ৯. আসাম চুক্তি (আকর্ড) এর শর্ত ও আইন।

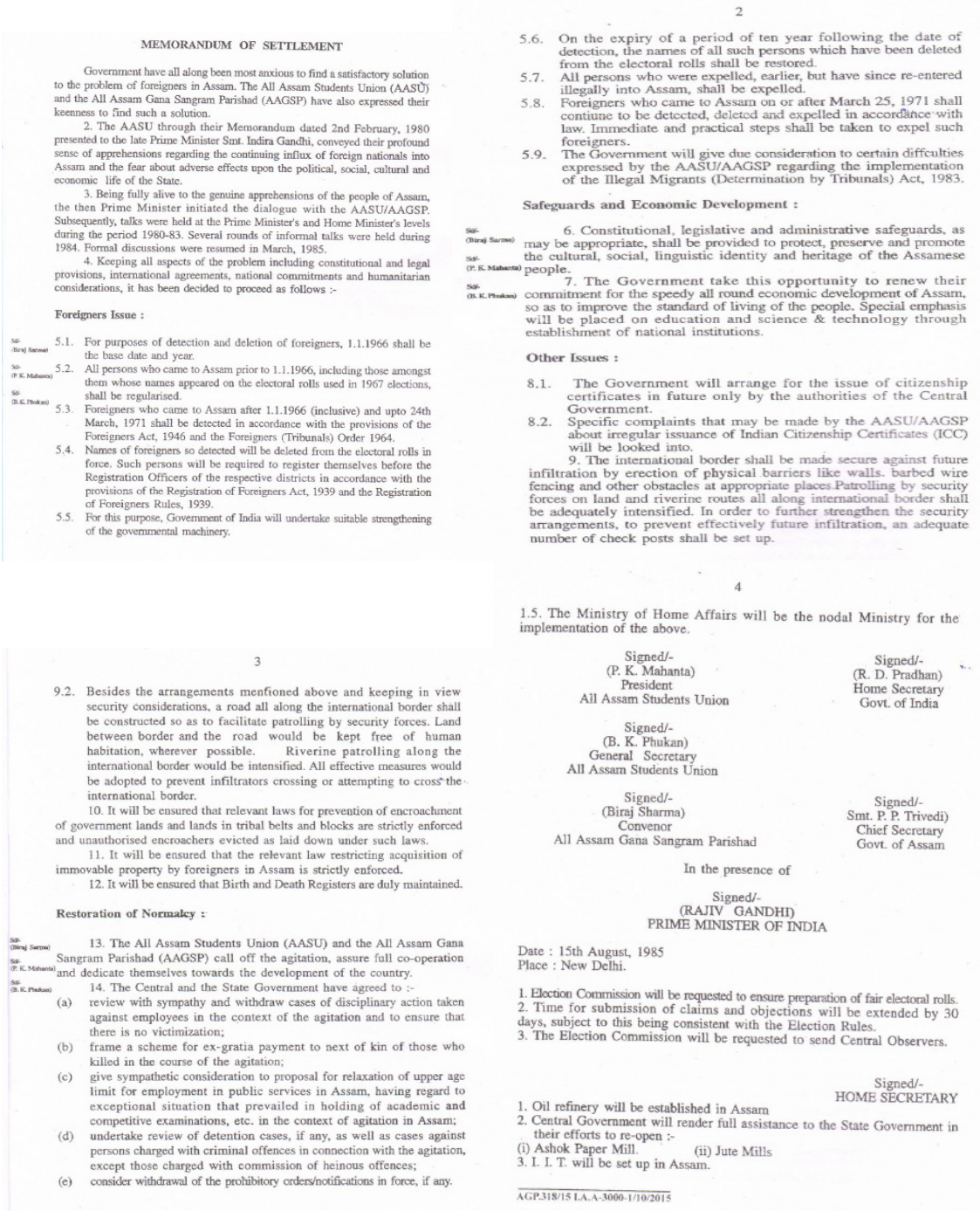

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

Government have all along been most anxious to find a satisfactory solution to the problem of foreigners in Assam. The All Assam Students Union (AASU) and the All Assam Gana Sangram Parishad (AAGSP) have also expressed their keenness to find such a solution.

2. The AASU through their Memorandum dated 2nd February, 1980 presented to the late Prime Minister Smt. Indira Gandhi, conveyed their profound sense of apprehensions regarding the continuing influx of foreign nationals into Assam and the fear about adverse effects upon the political, social, cultural and economic life of the State.

3. Being fully alive to the genuine apprehensions of the people of Assam, the then Prime Minister initiated the dialogue with the AASU/AAGSP. Subsequently, talks were held at the Prime Minister's and Home Minister's levels during the period 1980-83. Several rounds of informal talks were held during 1984. Formal discussions were resumed in March, 1985.

4. Keeping all aspects of the problem including constitutional and legal provisions, international agreements, national commitments and humanitarian considerations, it has been decided to proceed as follows :-

Foreigners Issue :

Sd/- (Biraj Sarma) Sd/- (P. K. Mahanta) Sd/- (B. K. Phukan)

5.1. For purposes of detection and deletion of foreigners, 1.1.1966 shall be the base date and year.

5.2. All persons who came to Assam prior to 1.1.1966, including those amongst them whose names appeared on the electoral rolls used in 1967 elections, shall be regularised.

5.3. Foreigners who came to Assam after 1.1.1966 (inclusive) and upto 24th March, 1971 shall be detected in accordance with the provisions of the Foreigners Act, 1946 and the Foreigners (Tribunals) Order 1964.

5.4. Names of foreigners so detected will be deleted from the electoral rolls in force. Such persons will be required to register themselves before the Registration Officers of the respective districts in accordance with the provisions of the Registration of Foreigners Act, 1939 and the Registration of Foreigners Rules, 1939.

5.5. For this purpose, Government of India will undertake suitable strengthening of the governmental machinery.

2

5.6. On the expiry of a period of ten year following the date of detection, the names of all such persons which have been deleted from the electoral rolls shall be restored.

5.7. All persons who were expelled, earlier, but have since re-entered illegally into Assam, shall be expelled.

5.8. Foreigners who came to Assam on or after March 25, 1971 shall continue to be detected, deleted and expelled in accordance with law. Immediate and practical steps shall be taken to expel such foreigners.

5.9. The Government will give due consideration to certain diffculties expressed by the AASU/AAGSP regarding the implementation of the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act, 1983.

Safeguards and Economic Development :

Sd/- (Biraj Sarma) Sd/- (P. K. Mahanta) Sd/- (B. K. Phukan)

6. Constitutional, legislative and administrative safeguards, as may be appropriate, shall be provided to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people.

7. The Government take this opportunity to renew their commitment for the speedy all round economic development of Assam, so as to improve the standard of living of the people. Special emphasis will be placed on education and science & technology through establishment of national institutions.

Other Issues :

8.1. The Government will arrange for the issue of citizenship certificates in future only by the authorities of the Central Government.

8.2. Specific complaints that may be made by the AASU/AAGSP about irregular issuance of Indian Citizenship Certificates (ICC) will be looked into.

9. The international border shall be made secure against future infiltration by erection of physical barriers like walls. barbed wire fencing and other obstacles at appropriate places.Patrolling by security forces on land and riverine routes all along international border shall be adequately intensified. In order to further strengthen the security arrangements, to prevent effectively future infiltration, an adequate number of check posts shall be set up.

3

9.2. Besides the arrangements menfioned above and keeping in view security considerations, a road all along the international border shall be constructed so as to facilitate patrolling by security forces. Land between border and the road would be kept free of human habitation, wherever possible. Riverine patrolling along the international border would be intensified. All effective measures would be adopted to prevent infiltrators crossing or attempting to cross the international border.

10. It will be ensured that relevant laws for prevention of encroachment of government lands and lands in tribal belts and blocks are strictly enforced and unauthorised encroachers evicted as laid down under such laws.

11. It will be ensured that the relevant law restricting acquisition of immovable property by foreigners in Assam is strictly enforced.

12. It will be ensured that Birth and Death Registers are duly maintained.

Restoration of Normalcy :

Sd/- (Biraj Sarma) Sd/- (P. K. Mahanta) Sd/- (B. K. Phukan)

13. The All Assam Students Union (AASU) and the All Assam Gana Sangram Parishad (AAGSP) call off the agitation, assure full co-operation and dedicate themselves towards the development of the country.

14. The Central and the State Government have agreed to :-

(a) review with sympathy and withdraw cases of disciplinary action taken against employees in the context of the agitation and to ensure that there is no victimization;

(b) frame a scheme for ex-gratia payment to next of kin of those who killed in the course of the agitation;

(c) give sympathetic consideration to proposal for relaxation of upper age limit for employment in public services in Assam, having regard to exceptional situation that prevailed in holding of academic and competitive examinations, etc. in the context of agitation in Assam;

(d) undertake review of detention cases, if any, as well as cases against persons charged with criminal offences in connection with the agitation, except those charged with commission of heinous offences;

(e) consider withdrawal of the prohibitory orders/notifications in force, if any.

4

1.5. The Ministry of Home Affairs will be the nodal Ministry for the implementation of the above.

Signed/-
(P. K. Mahanta)
President
All Assam Students Union

Signed/-
(R. D. Pradhan)
Home Secretary
Govt. of India

Signed/-
(B. K. Phukan)
General Secretary
All Assam Students Union

Signed/-
(Biraj Sharma)
Convenor
All Assam Gana Sangram Parishad

Signed/-
Smt. P. P. Trivedi)
Chief Secretary
Govt. of Assam

In the presence of

Signed/-
(RAJIV GANDHI)
PRIME MINISTER OF INDIA

Date : 15th August, 1985
Place : New Delhi.

1. Election Commission will be requested to ensure preparation of fair electoral rolls.
2. Time for submission of claims and objections will be extended by 30 days, subject to this being consistent with the Election Rules.
3. The Election Commission will be requested to send Central Observers.

Signed/-
HOME SECRETARY

1. Oil refinery will be established in Assam
2. Central Government will render full assistance to the State Government in their efforts to re-open :-
(i) Ashok Paper Mill. (ii) Jute Mills
3. I. I. T. will be set up in Assam.

AGP.318/15 I.A.A-3000-1/10/2015

সূত্র: আসাম চুক্তির প্রতিলিপি, ২০২১।

সংযোজনী: ১০. শিলচর রেল স্টেশন চত্বরে ভাষা শহিদ স্মারক।

সূত্র: সংগৃহীত, ২০২০।

সংযোজনী: ১১. আসাম রাজ্য সরকার ভাষা আইন, ১৯৬০।

The 17th December 1960

No.LJL.35/60.—The following Act of the Assam Legislative Assembly which received the assent of the Governor is hereby published for general information.

Received the assent of the Governor on the 17th December 1960

ASSAM ACT No.XXXIII OF 1960

THE ASSAM OFFICIAL LANGUAGE ACT, 1960

(As passed by the Assembly)

[Published in the *Assam Gazette*, Extraordinary, dated the 19th December 1960]

An

Act

to declare the Official Language of the State of Assam.

Preamble. Whereas Article 345 of the Constitution provides that the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State as the language to be used for official purposes of the State and for matters hereinafter appearing ;

সূত্র: আসাম রাজ্য সরকার ভাষা আইনের প্রতিলিপি।

সংযোজনী: ১২. আসামের তপশিলি জাতি তালিকা।

ক্রমিক নং	জাতির নাম	জনসংখ্যা	শতাংশ
১.	বাশফোর	১৪,৭৬০	০.৮
২.	ভুইমালি	৫৭,৯৭৪	৩.২
৩.	বাণিয়া	৪৭,৯৭৪	২.৬
৪.	ধুপি, ধোবী	৪৯,৯২৯	২.৭
৫.	দুগ্লা, ঢলিয়া	৬,৩৬৪	০.৩
৬.	হীরা	৫৫,১০৬	৩.০
৭.	জালকেওট	২৩,৫১১	১.৩
৮.	ঝাল মালো	৭৭,৫৩৩	৪.২
৯.	কৈবর্ত, জালিয়া	৫,৮১,৫৫৯	৩১.৮
১০.	লালবেগি	৫৫২	০.০৫
১১.	মাহার	১,৭২৫	০.১
১২.	মাহাতার	১২,৭১৫	০.৭
১৩.	মুচি	৭০,৯৫৪	৩.৯
১৪.	নমঃশূদ্র	৫,৫৫,৬২১	৩০.৪
১৫.	পাটনি	১,৫১,৯৯২	৮.৩
১৬.	সূত্রধর	৬২০৩২	৩.৪
মোট তপশিলি জাতি		১৮,২৫,৯৪৯	১০০

সুত্র: Census of India, 2001 & Office of the Register General, India; Rup Kumar Barman: Migration, State Policies and Citizenship: A Historical Study on India, Bangladesh and Bhutan, New Delhi, New Delhi, Aayu Publications, 2021, p. 211.

সংযোজনী: ১৩. মাতৃভাষা অনুসারে আসামের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান।

ক্রমিক নং	মাতৃভাষা	জনসংখ্যা
১.	অসমিয়া	১,৫০৯৫,৭৯৭
২.	বাংলা	৯০,২৪,৩২৪
৩.	হিন্দি	২১,০১,৪৩৫
৪.	বোড়ো (Bodo)	১৪,১৬,১২৫

সুত্র: Census of India, 2011 & Office of the Register General, India

সংযোজনী: ১৪. ত্রিপুরা তপশিলি জাতি তালিকা।

1. Bagdi	18. Keot
2. Bhuimali	19. Khadit
3. Bhunar	20. Kharia
4. Chamar, Muchi, Chamar-Rohidas, Chamar-Ravidas	21. Koch
5. Dandasi	22. Koir
6. Dhenuar	23. Kol
7. Dhoba, Dhobi	24. Kora
8. Dum	25. Kotal
9. Ghasi	26. Mahisyadas
10. Gour	27. Mali
11. Gur	28. Mehtor
12. Jalia Kaibarta, Jhalo- Malo	29. Musahar
13. Kahar	30. Namasudra
14. Kalindi	31. Patni
15. Kan	32. Sabar
16. Kanda	33. Dhuli, Sabdakar, Badyakar
17. Kanugh	34. Natta, Nat.

সূত্র: Government of Tripura, Department for Welfare of Scheduled Castes, Tripura, Agartala. No. F.2-206/SCW/GL/15/16,048-148, Dated-30.06.2016.

সংযোজনী: ১৫. ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা কাউন্সিল আইন, ১৯৮৮।

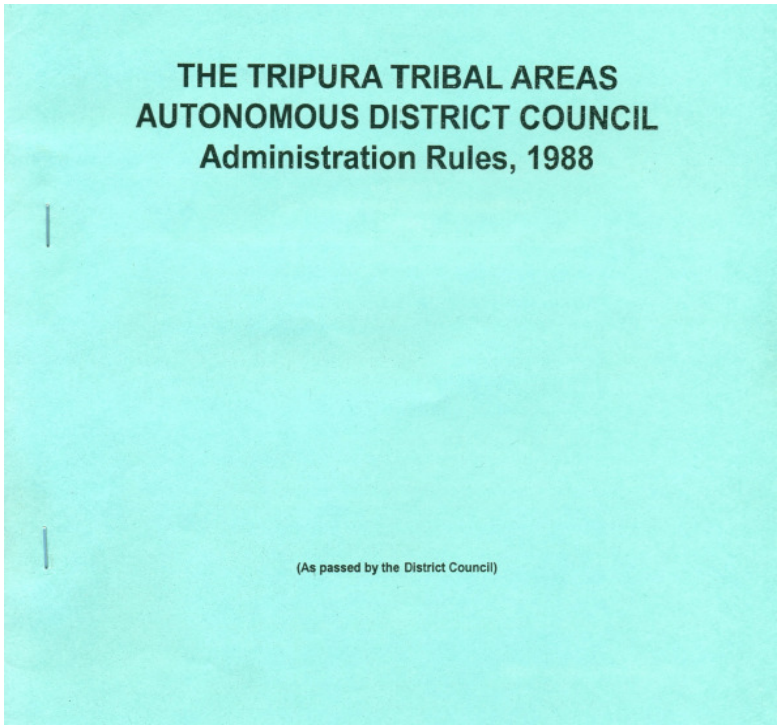

সূত্র: ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা কাউন্সিলের প্রতিলিপি, ২০২১।

সংযোজনী: ১৬. ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ (উত্তর প্রদ্রশ) ধ্বংসের সংবাদ শিরোনাম এবং ৮ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংবাদ শিরোনাম।

THE TIMES OF INDIA

KAR SEVAKS DESTROY BABRI MASJID

President's rule in U.P. ● Assembly dissolved ● Imam appeals for peace

The Republic Besmirched

The Daily Star

Babri Mosque demolition sparks off violence-marred protests

Hundreds injured, temples damaged across country

Cabinet condemns

Communal groups banned : Hindu militants build brick platform on fallen

সূত্র: The Times of India, 6th December, 1992 and The Daily Star, Dhaka, Bangladesh, 8th December, 1992.

সংযোজনী: ১৭. গণমাধ্যমে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির খবর।

বাংলাদেশে হরিচাঁদ ঠাকুরের মূর্তি ভাঙায় প্রতিবাদ মতুয়া মহাসংঘের

মোকতার হোসেন মণ্ডল, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি: বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া ডুমুরিয়াতে কিছু দুষ্কৃতী মতুয়া ধর্মের সম্মানীয় মহাপুরুষ হরিচাঁদ ঠাকুরের মূর্তির মাথা ভেঙে ফেলেছে বলে খবর। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের সম্পাদক ডা. সুকেশ চৌধুরী।

সোমবার তিনি যুগশঙ্খকে বলেন, 'আমি বাংলাদেশে ফোন করে খোঁজ নিয়েছি। এই ঘটনা সত্য।' এরপরই তিনি বলেন, 'প্রথমেই বলে রাখি, আমরা সব ধর্মপুরুষ ও ধর্মকে সম্মান করি। মুসলিমদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গুরুচাঁদের সময় থেকে ভালো ছিল। এখনও আছে। বাংলাদেশে অন্য ধর্মের মন্দির বা অন্য কিছু হলেও মুসলিমরা মতুয়াদের ওপর কোনও দিন কিছু করেনি। কিন্তু এই ঘটনার পর আমার দাবি, অবিলম্বে মন্দির বা মূর্তি গড়ার ব্যবস্থা করা হোক। না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।' কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশের হাইকমিশনে দেখা করে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাবেন মতুয়া নেতারা বলে জানান ডা. সুকেশ চৌধুরী। এরপর নয়ের পাতায়

নাগরিকত্ব-ভিক্ষা নয়, চাই বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের জন্য স্বাধীন বঙ্গভূমি রাষ্ট্র!

রক্তিম দাশ

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি: সাংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে যখন তোলপাড় দেশ, ঠিক তখনই দাবি উঠেছে নাগরিকত্বের ভিক্ষা নয়, চাই বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের জন্য 'স্বাধীন বঙ্গভূমি রাষ্ট্র'। এমন দাবি তুলে রীতিমতো বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন, প্রায় ২৮ বছর ধরে স্বাধীনতার দাবিতে লড়াই করা বঙ্গসেনার মুখপাত্র বিমল মিস্ত্রি। তাঁর

বিস্ফোরক দাবি বঙ্গসেনার

সূত্র: সংগৃহীত, NDTV, 18th October, 2021, Bangladesh. ; Bulletin South Asia, 18th October, 2021. ; যুগশঙ্খ পত্রিকা, ১০.০১.২০১৭।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

প্রথমিক উপাদান

সরকারী প্রকাশনা

ইংরেজি

Beverley, H.: Report on the Census of Bengal 1872. Culcutta, Bengal Secretariat Press, 1872.

Census of India 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011.

Gait, E.A.: A History of Assam, (Culcutta, Thakcker, Spink & Co., 1906).

Garrett, J.H.E.: Bengal District Gazatteer, Nadia, Culcutta, Bengal Secretriat Book Depot, 1910.

Hunter, William Wilson: A Statistical Account of Bengal, 20 Volume Set, London, Trubner & Co., 1875, Reprinted, New Delhi, D.K. Publishing House, 1973.

Hutton, John Henry: Caste in India: It's Nature, function and Origin, London, Oxford University Press, 1946.

Martin, Montgomery: The History, Antiquities, Topography and Statistics of eastern India, Vol. 5, (London, W.H. Allen and Co., 1838), Reprinted (New Delhi, Cosmo Publications, 1978).

Mitra, Asok Kumar: The Tribes and Castes of West Bengal, Alipore, West Bengal Government Press, 1953.

O'Malley, L.S.S.: Bengal District Gazetteers 24 Parganas, Culcutta, Bengal Secretriat Book Depot, 1914.

Pakrashi, Kanti B.: A sociological study of Refugees of West Bengal, Culcutta, Editions India, 1971.

Risley, Herbert Hope: The Tribes and Castes of Bengal, 2 volume set, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1892.

Tailor, James: A sketch of the topography & statistics of Dacca, Calcutta, GH Huttman, Military Orphan Press, 1840.

The Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950]1 C.O.19.

Wise, James: Note on the Race, Caste and Tribes of Eastern Bengal, London, Not Published, 1883.

সরকারী কার্যবিবরণী

Assam official Language Act, 1960, Assam Act No XXXIII of 1960, Receive the assentt of governor on the 17th December, 1960.

Estimates Committee (1964-65), Ministry of Rehabilitation, New Delhi, 1965.

File No. 1147 Misc/450-2ac, 8 August 1895.

Letter no. 87 J.G, Annual administration report, Presidency division 1880-81, Alipore. dated 8th July, 1881.

Census East of Pakistan, Volume-2, Karachi, Ministry of Home & Kashmir Affairs, 1961.

People's Republic of Bangladesh, Date of Elections: March 7, 1973.

People's Republic of Bangladesh, Date of Elections: 18 February 1979.

People's Republic of Bangladesh, Date of Elections: 27 February, 1991.

Population Redistribution and Development in South Asia.

Report on the Survey of Socio-Economic Conditions of The Namasudras of Karimgang and Cachar District of Assam,Assam, The Tribal Research Institute, 1987.

Statistical Report on General Election, 1951 to the Legislative Assembly of Assam, Election Commission of India, New Delhi.

Statistical Report on General Election, 1957 to the Legislative Assembly of Assam, Election Commission of India, New Delhi.

Statistical Report on General Election, 1991 to the Legislative Assembly of Assam, Election Commission of India, New Delhi.

Statistical Report on General Election, 1996 to the Legislative Assembly of Assam, Election Commission of India, New Delhi

Statistical Report on General Election, 1972 to the Legislative Assembly of Tripura, Election Commission of India, New Delhi.

Statistical Report on General Election, 1977 to the Legislative Assembly of Tripura, Election Commission of India, New Delhi.

Statistical Report on General Election, 2013 to the Legislative Assembly of Tripura, Election Commission of India, New Delhi.

Statistical Report on General Election, 1951 to the Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi.

Statistical Report on General Election, 1957 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi.

Election Commission of India- State Election, 1962 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India New Delhi.

Statistical Report on General Election, 1969 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi.

Statistical Report on General Election, 1971 to the Legislative Assembly of West Bengal Election Commission of India, New Delhi.

Statistical Report on General Election, 1972 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi.

Statistical Report on General Election, 1977 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi.

Statistical Report on General Election, 1982 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi.

Statistical Report on General Election, 1987 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi.

Statistical Report on General Election, 1991 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi.

Statistical Report on General Election, 1996 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi.

Statistical Report on General Election, 2001 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi.

Statistical Report on General Election, 2006 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi.

Statistical Report on General Election, 2011 to the Legislative Assembly of West Bengal, Election Commission of India, New Delhi.

Election Commission of India, State Election, 2016 to the Legislative Assembly of West Bengal.

Election Commission of India- State Election, 2021 to the legislative Assembly of West Bengal.

সরকারী কার্যবিবরণী

অ্যাসেম্বলির কার্যবিবরণী, ২০শে জুন, ১৯৪৭।

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২, ঢাকা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, জুলাই, ২০২২।

নিখিল ভারত বাঙালি সমন্বয় সমিতি । Reg No, IV-190200734/ 2020 NiBBSS।

পপুলেশন রিডিসস্ট্রিবিউশন এন্ড ডেভলপমেন্ট ইন সাউথ এশিয়া।

বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বাস, কুমুদরঞ্জন: দরদী গুরুচাঁদ, বাগদহ, সুচিত্রা বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০৬।

বিশ্বাস, রবিন 'মতুয়া ধর্ম' একটি স্বাধীন ধর্ম, কলকাতা, নির্ভীক সংবাদ, ২০১৪।

ঢেকিয়াল ফুক্কন, হলিরাম: আসাম বুরঞ্জি, গৌহাটি, মোক্ষদা পুস্তকালয়, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

হাওলাদার, নীরদবরন: মতুয়া ধর্মাদর্শ মতে বিবিধ ক্রিয়া কর্মের বিধান, ঠাকুর নগর, কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত, ২০১৩।

হালদার, মহানন্দ: শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, ঠাকুর নগর, মর্ডান প্রেস, ২০১৬।

মজুমদার, কে. সি.: হরিচাঁদ ঠাকুর ও দ্বাদশ আজ্ঞা, কলকাতা চপলারায় মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশ কাল আনুমানিক ২০০০ থেকে ২০১০ সাল।

রায়, ক্ষীরদারঞ্জন: শ্রীশ্রী ওড়াকান্দি ধাম মাহাত্ম্য, ওড়াকান্দি, অংশুজিৎ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত, ১৪২১ বঙ্গাব্দ।

সরকার, তারক চন্দ্র: শ্রীশ্রীহরি লীলামৃত, ফরিদপুর, হরিবর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

সংস্কৃত গ্রন্থ

প্রভুপাদ, শ্রীল(বঙ্গানুবাদ): *শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ*, প্রথম অধ্যায়, (কলকাতা, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, ২০০৪)।

ভট্টাচাজ্য, শ্রীমদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ(বঙ্গানুবাদ): *মহাভারতম,* (কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ), মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস।

মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ(সম্পাদিত): *মনুসংহিতা- মেধাতিথি ভাষ্য,* বঙ্গানুবাদ, (কলকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ)।

সহায়ক উপাদান

ইংরেজি গ্রন্থ

Azad, Salam (Ed): Atrocities on the Minorities in Bangladesh, (Dhaka, Amity for peace, 2003).

Behal, Rana P.: Indian Migrant labourer in South-east Asian and Assam Plantations under the British Imperial System, (Noida, V.V. Giri National Labour Institute, 2017).

Bandyopadhyay, Sekhar: *Caste, Culture and Hegemony: Social Domination in Colonial Bengal* (New Delhi, Sage Publications, 2004).

Bandyopadhyay, Sekhar: Cast protest and identity in in colonial India the Namo shudras of Bengal 1872-1947, (New Delhi, Oxford, 2011).

Bandyopadhyay, Sekhar; Basu Ray Chaudhury, Anasua: *In search of space The Scheduled Caste Movement in West Bengal after Partition, (Kolkata, Mahanirban Calcutta Research Group, 2014).*

Barman, Rup Kumar: Caste, Class and Culture: *The Malos, Adwaita Malla Barman and History of India and Bangladesh*, (New Delhi, Abhijeet Publicatios, 2020).

Barman, Rup Kumar: *Caste, Politics, Casteism and Dalit Discourse: The Scheduled Castes of West Bengal'* (New Delhi, Abhijit Publications, 2020).

Barman, Rup Kumar: Contested Regionalism, (New Delhi, Abhijeet publications, 2007).

*Barman, Rup Kumar: Migration, State Policies and Citizenship: A Historical study on India, Bangladesh and Bhutan' (*New Delhi, Aayu Publications, *2021).*

Barman, Rup Kumar: *Partition of India and Its Impact on Scheduled Castes of Bengal'* (Delhi: Abhijeet publications, 2012).

Barman, Rup Kumar: *Right-Left-Right' and Caste Politics: The Scheduled Castes in West Bengal Assembly Elections (from 1920 to 2016), (Kolkata,* Sage Publications, 2018).

Basu, Swaraj: *Dynamics of a Caste movement: The Rajbanshis if North Bengal 1910-1947, (New Delhi, Monohar, 2002).*

Bhattachariya, Jogendra Nath: Hindu Caste and Sects: As Exposition of the Origin of the Hindu Caste system and the Bearing of the sects towards each other and towards other religious system, (Calcutta, Thacker, Spink and Co., 1896).

Chatterji, Joya: Bengal divided Hindu communalism and partition 1932-1947, (UK, Cambridge University Press, 1994).

Chatterji, Joya: The Spoils of Partition Bengal and India, 1947-1967, ((UK, Cambridge University Press, 2007).

Chadha, Vivek: Low Intensity Conflicts in India An Analysis, (New Delhi, Sage Publications, 2004).

Chowdhury, Iftekhar Uddin: Caste-based Discrimination in South Asia: A Study of Bangladesh, (New Delhi, I.I D.S., Working Paper Series, Vol III, Number 07, 2009).

Cohen, Bernard: Notes on the history of the study of of Indian society and culture, (New Delhi Oxford University Press, 2004).

Das, Pushpita: Illegal Migration From Bangladesh Deportation, Border Fences and Work Permits, (New Delhi, Institute for Defence Studies and Analyses, 2016).

Das, Samir Kumar: Conflict and Peace in India's Northeast: The Role of Civil Society, (Washington, East west Center, 2007).

Desai, Akshayakumar Ramanlal: Rural Sociology in India, (Bombay, Vora & Co., 1961).

Dirks, N.B.: Caste of mind: Colonialism and the Making of Modern India, (UK, princeton university press, 2001).

Dumont, Louis: Homo Hierarchicus: the Caste system and its implications, (USA, University of Chicago Press, 1974).

Dutta, Nripendra Kumar: Origin and Growth of Caste in India, Two volumes, (Calcutta, Firma KLM Pvt. Ltd., 1969).

Ghurye, G.S.: Caste and Race in India, (London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., 1982).

Goswami, Namrata: Bangladeshi Illegal Migration into Assam: Issues and Concerns from the Field, (New Delhi, IDSA, 2010).

Hazarika, Bimal Kumar (Ed): Core problems of Scheduled Castes of Assam, (Guwahati, AIRTSC, 2008).

Hornsey, Matthew J.: *Social Identity Theory and Self-categorization Theory: A Historical Review*, in book, *Social and Personality Psychology Compass* 2/1, Blackwell Publishing Ltd, 2008)

Islam, Mazharul; Pervez, Altaf: Dalit Initiatives in Bangladesh, (Dhaka, Nagorik Uddyog, 2013).

Jaffrelot, Christophe: Religion, Caste and Politics in India, (New Delhi, Primus Books, 2010).

Jenkins, Richard: *Socila Identity*, (London and New York, Routledge, 2008).

Karve, Irawati: Hindu Society an Interpretation, (Poona, Decan College, 1961).

Ketkar, Shridhar Venkatesh: History of Caste in India: Evidence of Laws of Manu, (Bombay, Taylor & Carpenter Booksellers and Publishers, 1909).

Kimura, Makiko: Memories of the Massacre: Violence and Collective Identity in the Narratives on the Nellie Incident Asian Ethnicity, Volume 4, Number 2, June 2003.

Mahanta, Prafulla Kumar: The Tussle between the Citizens and Foreigners, (New Delhi, Vikas publishing house Pvt. Ltd., 1985).

Mondal, Rohidas: *Dynamics of Caste, Religion, Culture and Politics 1872- 1971'* (New Delhi, Abhijit Publications, 2021).

Rangarajan, L.N.: *The Arthashastra*, (New Delhi, Penguin Books, 1987).

Roy, Haimanti: A Partition of Contingency? Public Discourse in Bengal 1946–1947, (USA, Cambridge University Press, 2009).

Saikia, Yasmin: Assam and India: Fragmented Memories, Cultural Identity and the Tai-Ahom Struggle, (New Delhi, Permanent Black, 2004).

Sen, Dwaipayan: *The decline of the Caste question: the marginalization of Dalit politics in Bengal, (UK, Cambridge University Press, 2018).*

Sen, Sipra: Tribes and Castes of Assam, (New Delhi, Gayan Publishing House, 2009).

Sharma, Jayeeta: Empire's Garden Assam and the Making of India, (Durham and London, duke university press, 2011).

Sharma Thakur, G.C.: Socio-Economic Development of the Schedule Castes of Assam, (Guwahati, AIRTSC, 1992).

Singh, K.S.(Ed): People of India, Assam, Part-2, Anthropological survey of India, (Calcutta, seagull books, 2003).

Srinivas, Mysore Narasimhachar: Social Change in Modern India, (New Delhi, Orient Longman, 2005).

পত্রপত্রিকা

Hindustan Time, Written by Joydeep Bose, June 25: On this day in 1975, Indira Gandhi imposed the Emergency. What remains of its legacy? Jun 25, 2021 09:11 AM IST, New Delhi।

Arun Shourie, titled Assam Elections: The Avoidable Tragedy, India Today, Issue Date: May 15, 1983।

Arun Shourie Assam elections: Can democracy survive them? India Today, Issue Date: May 31, 1983 পৃ.৫৭

Arun Shourie, titled Assam Elections: The Avoidable Tragedy, India Today, Issue Date: May 15, 1983

Frontline: 1985: Assam Accord signed at the core of the Accord was the "Foreigners Issue", Published: Aug 15, 2022 06:00IST। (https://frontline.thehindu.com/politics/india-at- 75-epochalmoments-1985-assam-accord-signed/article65721984.ece) Date: 30.06.2023, Time: 9:27 a.m.।

Gupta, Saibal Kumar: Dandakaranya: A Survey of Rehabilitation, The Economic Weekly, January 16, 1965.

Mitra, Naresh: Suspected Ulfa terrorists gun down 5 in Assam's Tinsukia district, (Guwahati, Times of India, TNN, 2018), (https://timesofindia.indiatimes.com/city/guwahati/at-least-five-feared-killed-in-firing-in-assams-tinsukia-district/articleshow/66466426.cms), Date: ২৯.০৬.২০২৩, Time 20:49 IST.

বাংলা গ্রন্থ

আহমেদ, আবুল মনসুর: আমার দেখা রাজনীত পঞ্চাশ বছর, (ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১৩)।

উমর, বদরুদ্দিন: যুদ্ধত্তর বাংলাদেশ, (ঢাকা, আফসার ব্রাদার্স, ২০১৫)।

আহম্মেদ শরীফ: বাংলাদেশ নির্বাচন ও গনতান্ত্র, (ঢাকা, আনন্যা, ২০১৭)।

কর, সুবীর: বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস, (কলকাতা, পুস্তক বিপনি, ১৯৯৯)।

চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার: প্রান্তিক মানব, (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৯)।

চ্যাটার্জী, জয়া: বাংলা ভাগ হল, (কলকাতা, এল অ্যালমা পাবলিকেশনস, ১৯৯৯)

চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার: প্রান্তিক মানব, (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৯)

চট্টোপাধ্যায়, সুনীল কুমার(দ্বিতীয় খন্ড): *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস,* (কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৮)।

ঠাকুর, কপিল কৃষ্ণ(সম্পাদনা): বাংলার নমঃশূদ্র, (কলকাতা, কে. এন. টি. এ. এ. ২০২১)।

দাশ, ধনঞ্জয়: আমার জন্মভূমি স্মৃতিময় বাংলাদেশ, (কলকাতা, মুক্তধারা, ১৯৫৮)।

দাস, দেবর্ষি: আসাম নাগরিক পঞ্জির সাতকাহন, (কলকাতা, পিপলস স্টাডি সার্কেল, ২০১৯)।

দে, অমলেন্দু: প্রসঙ্গ অনুপ্রবেশ (কলকাতা, বর্ণপরিচয়, ১৯৯৩)।

দে, অমলেন্দু: বাংলাদেশের জনবিন্যাস ও অনুপ্রবেশ সমস্যা, (কলকাতা, নলেজ পাবলিশিং হাউস, ২০১২)।

দে, অমলেন্দু: স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা প্রয়াস ও পরিণতি,(কলকাতা, রত্না প্রকাশন, ১৯৭৫)।

দে, রঞ্জিত: ত্রিপুরার লোক জীবন ও লোকসংস্কৃতি, (কলকাতা, নবজাতক প্রকাশনী, ১৯৮৬)।

দেবনাথ, আর.এম.: সংখ্যালঘু সমস্যা: দেশে দেশে, (ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩)।

দেবনাথ, জয়ন্ত: সন্ত্রাস ক্লান্ত ত্রিপুরা, (আগরতলা, দৈনিক সংবাদ পাবলিশার্স, ২০০১)।

দেববর্মা, নরেশচন্দ্র, বিমান ধর, কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী (সম্পা): ত্রিপুরার আদিবাসী, (আগরতলা, ত্রিপুরা দর্পণ, ২০০৯)।

পাল, বাবুল কুমার: বরিশাল থেকে দণ্ডকারণ্য পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ইতিহাস, (গ্রন্থ মিত্র, কলকাতা, ২০১০)।

প্রামানিক, শ্যামল কুমার: পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতি ও আদিবাসী, (কলকাতা, ফার্মা.কে.এল.এম.প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়: উদ্বাস্তু, (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৮)।

বন্দোপাধ্যায়, রাখাল দাস: বাঙ্গলার ইতিহাস, প্রথম ভাগ,

বর্মণ, রূপ কুমার: *জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান,* (কলকাতা, অ্যালফাবেট বুক্স, ২০১৯)।

বর্মণ, রূপ কুমার: সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ জাত পাত, জাতি রাজনীতি ও তপশিলি সমাজ, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২)।

বর্মণ, রূপ কুমার: পরিবর্ত অনুসন্ধান: রাষ্ট্র নাগরিকত্ব বাস্তুচ্যুতি ও ইতিহাসচর্চা, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২)।

বর্মণ, রূপ কুমার: *জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির আবস্থান,* (কলকাতা, অ্যালফাবেট বুক্স, ২০১৯)।

বর্মণ, রূপ কুমার: জাতি রাজনীতি, জাত পাত ও দলিত প্রতর্ক পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান, (কলকাতা, আলফাবেট বুকস, ২০১৯)।

বর্মণ, রূপ কুমার: *সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ,* (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২) পৃ.২৪

বর্মন, প্রসূন: অসম আন্দোলন ১৯৭৯-১৯৮৫, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২০)।

বর্মন, রমেশ: তপশীলি জাতির রাজনীতি: ঔপনিবেশিক বাংলার দৃশ্যপট, International Journal of Humanities & Social Science. Volume-VIII, Issue-I, July 2019, Karimganj, Assam, India।

বর্মা, যুথিকা: জাতি রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি উপেন্দ্রনাথ বর্মন (১৮৯৮-১৯৮৮) ও তাঁর সমকালীন উত্তরবঙ্গ, (কলকাতা, সোপান, ২০২১)।

বসু, মণীন্দ্র মোহন (সম্পাদিত): চর্যাপদ, (কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩)।

বসু, জ্যোতি: যতদূর মনে পড়ে, (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০১৫)।

বসু, নির্মল কুমার: হিন্দু সমাজের গড়ন, (শান্তি নিকেতন, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, ১৯৪৯)।

বসু, অর্পিতা: উদ্বাস্তু আন্দোলন ও পুনর্বাসিত সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা, (কলকাতা, গাংচিল, ২০১৩)।

বিশ্বাস, উৎপল: পশ্চিমবঙ্গে মতুয়া রাজনীতি, সমকাল, (২৫শে এপ্রিল, ২০২২)।

বিশ্বাস, কিশোর: শেখ মুজিব বাংলাদেশ চাননি, (কলকাতা, জনমন, ২০১৮)।

বিশ্বাস, নীতিশ: *শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর স্বর্ণ সংকলন,* (কলকাতা, ঐক্যতা, ২০১৫)।

বিশ্বাস, নীতিশ(সম্পা): এন.আর.সি. ও ভাষা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সংখ্যা, (কলকাতা, ঐকতান গবেষণা পত্র, ২০১৯-২০)।

বিশ্বাস, নীতিশ; হালদার, জগদীশ(সম্পা): শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর স্বর্ণ-সংকলন, (কলকাতা, ঐকতান, ২০১৫)।

বিশ্বাস, মনোহর মৌলি: দলিত সাহিত্যের রূপরেখা, (কলকাতা, বাণীশিল্প, ২০০৭)।

বিশ্বাস, মনোশান্ত: *বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি,* (কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৬)।

বিশ্বাস, শিপ্রা: বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, (কলকাতা, একুশ শতক, ২০১৬)।

বিশ্বাস, সুভাষ: দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা: প্রসঙ্গ নদিয়া জেলা, (কলকাতা, সোম পাবলিশিং, ২০১৬)।

বিশ্বাস, সুকুমার: আসামে ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি-প্রসঙ্গ ১৯৪৭-১৯৬১ (আগরতলা, পারুল প্রকাশনী, ২০১৭)।

বিশ্বাস, সুধাংশু শেখর: নমসপুত্র, (ঢাকা, বাংলাদেশ, নালন্দা, ২০১৭)।

ভট্টাচার্য, পঙ্কজ; দে, তপন কুমার(সম্পা): বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু সঙ্কট, (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০২০)।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ: *প্রাচীন ভারতীয় সমাজ,* (কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০১)।

ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র(সম্পা): *বাল্মিকী রামায়ণ,* (কলকাতা, তুলি কলম, ১৯৯৫)।

ভট্টাচার্য, সুচিন্ত্য: ত্রিপুরার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, (আগরতলা, উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০১৭)।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র: বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ, (কলকাতা, প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রইভেট লিমিটেড, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)।

মণ্ডল, চিত্ত; রায়মণ্ডল, প্রথমা(সম্পা): বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, (কলকাতা, একুশ শতক, ২০১৬)।

মণ্ডল, জগদীশ চন্দ্র: মহাপ্রাণ যোগেন্দ্র নাথ, চতুর্থ খন্ড, (কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ২০০৪)।

মিত্র, বিনয়: ধর্ম, ধর্মতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যবাদ, (ঢাক, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৮)।

রায়, নীহাররঞ্জন: *বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব,* (কলকাতা, দে'জ প্রকাশনী, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ)।

রায়, নীহাররঞ্জন: *বাঙালি হিন্দুর বর্ণভেদ,* (কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ)।

রায়, বিপুল কুমার: *নম:শূদ্রদের ইতিহাস,* (ঢাকা, বাংলাদেশ, মুক্ত চিন্তা, ২০১৬)।

মিলন রায়: *বাংলার বাগদি জাতি: জীবনধারা সংগ্রাম ও বিবর্তন,* (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২১)।

রায়, মহিত: বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ কিছু বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ, (কলকাতা, ক্যাম্প, ২০১৩)।

শরীফ, আহম্মেদ: বাংলাদেশ নির্বাচন ও গনতান্ত্র, (ঢাকা, আনন্যা, ২০১৭)।

শিকদার, জগন্নাথ: নমঃশূদ্র উৎপত্তি ও বিকাশ।

সরকার, অশোক কুমার(অনু): ভারতে মাউন্টব্যাটেন, (কলকাতা, আনন্দ-হিন্দুস্তান প্রকাশনী, ১৯৫২)।

সরকার, উত্তম: মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের উত্তরসূরী, (উত্তর ২৪ পরগনা, মতুয়া মহাসংঘ পত্রিকা, অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ)।

সরকার, যতীন: পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যু দর্শন (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫)।

সাহা, দিনেশ চন্দ্র: ত্রিপুরায় গণআন্দোলনের বিচিত্র ধারা, (আগরতলা, রাইটার্স পাবলিকেশন। ২০১৬)।

সিদ্দিক বীরত্তম, কাদের: স্বাধীনতা ৭১, (ঢাকা, বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী, ১৯৮৫)।

সিংহ, অনিল: পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু উপনিবেশ, (কলকাতা, বুক ক্লাব, ১৯৯৫)।

হালদার, কানু: *স্বাধীনতা উত্তর পর্বে বঙ্গীয় সমাজে মতুয়াদের রাজনৈতিক জাগরন এবং উত্তরণ* (১৯৪৭ থেকে ২০১১ এর দশক), (কলকাতা, ডি.এম. লাইব্রেরী, ২০২১)।

হীরা, আশিস (সম্পা): দেশভাগে নিম্নবর্ণ, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২০)।

হীরা, সুমন্ত কুমার: কান্তি বিশ্বাস এক অতুলনীয় প্রতিভা, (কলকাতা, বইমেলা, ২০২১)।

অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র

Biswas, Avishek: Heard History, Unheard Voices: Oral Narratives of Namasudra Partition Survivors, Jadavpur University, English Department, 2020.

Biswas, Prokash: Role of Guruchand Thakur in the Educational Development of Namasudras in Bengal, Department of Education, Assam University, 2017.

Mandal Dipankar: Social mobility among Dalit in West Bengal: A Study of the District in West Bengal, TATA Institute of Social Science, Mumbai, 2010.

নাইয়া, দীপশঙ্কর: সমানাধিকার থেকে সংখ্যালঘুত্ব পূর্ববঙ্গ থেকে বর্তমান বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিকক্ষমতার বিবর্তন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ, ২০২০।

সরকার, কৃষ্ণ কুমার: জাতি আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ: বাংলার পৌন্ড্র জাতির একটি বিশ্লেষণ (১৯১১-২০১১)। যাদবপুরবিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ, ২০১৮।

পত্র পত্রিকা

মতুয়া দর্পণ, (ঢাকা, জাতীয় মতুয়া প্রতিনিধি সম্মেলন, ১৯৯২)

আধীর বিশ্বাস: ন-নাগরিক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৮)।

সন্দীপ দাসগুপ্ত: আনন্দবাজার পত্রিকা, (কলকাতা, রবিবাসরীয় সংখ্যা, ২০০২ সাল, ১৪ এপ্রিল)।

অমৃতবাজার পত্রিকা।

রূপ কুমার বর্মণ: পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় তপশিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব, (বার্তা ২৪, বুধবার, ৩০ মার্চ ২০২২, ১৬ চৈত্র ১৪২৮)।

রূপ কুমার বর্মণ: মহাপুরুষের নির্মাণ, (বার্তা ২৪, সোমবার, ১৬ ই মে, ২০২১)।

ই-দেশহিতৈষী, ১৯ মে বরাক উপত্যকার ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন স্মরণে, ৫৯ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা /১৩ মে, ২০২২/২৯ বৈশাখ, ১৪২৯ (https://www.deshhitaishee.net/deshhitaishee/ news-list/details/13_may_writeup05.php), তারিখ: ২৯.০৬.২০২৩, সময়: ৮:৪০ রাত্রি।

রূপশ্রী দেবনাথ: সম্প্রীতি ও সংকটে জনজাতি ও বাঙালি: প্রসঙ্গ ত্রিপুরার বাংলা কবিতা. ড. রূপশ্রী দেবনাথ, (https://www.thecho.in/files/ Rupashree-Debnath b0t1o4nz.pdf), তারিখ: ২৯.০৬.২০২৩, সময়: ৮:৪০ রাত্রি।

বাক্তিগত সাক্ষাৎকার

নিরাপদ বিশ্বাস (৬৪), সাক্ষাতকার: হরিনারায়ণপুর, নদীয়া, ০৮.০৩.২০১৬।

নির্মল কুমার বিশ্বাস(৫২), সাক্ষাতকার: ঠাকুর নগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৮.০২.২০১৮।

আনিল বিশ্বাস(৭০), সাক্ষাতকার: দুরগানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৪.০৪.২০১৮।

শরদেন্দু বিশ্বাস(৫১), সাক্ষাতকার: দুরগানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৪.০৪.২০১৮।

বিনয় বিশ্বাস(৪০), সাক্ষাতকার: ঠাকুরপুকুর, কলকাতা, ১১.১০.২০১৮।

শৈলেন মণ্ডল(৬৫), সাক্ষাতকার: ঠাকুরপুকুর, কলকাতা, ১১.১০.২০১৮।

বুদ্ধিমন্ত বিশ্বাস(৭২), সাক্ষাতকার: চাকদা, নদীয়া, ২১.০৩.২০২১।

মানিক বিশ্বাস(৭৫), সাক্ষাতকার: ঠাকুরপুকুর, কলকাতা, ১৫.০৮.২০২১।